ড. আইশা হামদান

সাইকোলজি

ইসলামি দৃষ্টিকোণ

অনুবাদ
সিফাত-ঈ-মুহাম্মদ

সম্পাদনা
ডা. শামসুল আরেফীন

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এমন এক সৃষ্টি যাদের দেহ, মন ও আবেগ রয়েছে। আরও রয়েছে একটি আত্মা যা এগুলোকে প্রভাবিত করে ও পরিচালিত করে। সমকালীন মনোবিজ্ঞানের অসংখ্য তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষকে কেবল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে পথভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করা হয়। মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা, জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গ এই প্রধান লক্ষ্যের বিপরীতে একেবারেই গৌণ।

জার্নালে প্রকাশিত গাদা গাদা আর্টিকেল, বই পুস্তকের অসংখ্য অধ্যায়, নানাবিধ বিশদ তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত কনফারেন্সের কার্যবিবরণী কিংবা বিশেষজ্ঞ মতামতসমূহ হাশরের দিনে তাদের কোনো কাজেই আসবে না, যদি সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নাজিলকৃত মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করা হয়। বাস্তবে তাদের গবেষণাগুলোও ইসলামের সত্যতার দিকেই ইঙ্গিত করে, কিন্তু তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

সাইকোলজি

ইসলামি দৃষ্টিকোণ

সাইকোলজি
ইসলামি দৃষ্টিকোণ

মূল
ড. আইশা হামদান

অনুবাদ
সিফাত-ঈ-মুহাম্মদ

সম্পাদনা
ডা. শামসুল আরেফীন

সীরাত পাবলিকেশন

সাইকোলজি: ইসলামি দৃষ্টিকোণ
গ্রন্থস্বত্ব ©সাজিদ ইসলাম
প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা, ২০২০
ISBN: 978-984-8041-88-8

সীরাত পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৯-১৪২৪৬১

www.facebook.com/seeratpublication
Email: seeratpublication@yahoo.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মার্জিন সলিউশন : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা: সাজিদ ইসলাম
বানান: সাজিদ ইসলাম

মুদ্রিত মূল্য: ৩৩৪ ৳

Psychology: Islami Drstikone By Dr. Aisha Hamdan, Translated By Sifat-E-Muhammad, Reviewed By Dr. Shamsul Arefin Published By Seerat Publication, Dhaka, Bangladesh.

ড. আইশা হামদান। আমার তাওফিক হয়েছে তাঁর দুটো বই বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার। অমুসলিম পরিবারে জন্মেও আল্লাহর দ্বীনকে আপন করে নিয়ে তিনি দ্বীনের পথে যে মেহনত আর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দেয়। আমি মহান রবের কাছে খুব করে চাই, আল্লাহ যেন এই মহীয়সী নারীকে কবুল করেন। তাঁর কবরে ভোরের শিশিরের মতো রহমত বর্ষণ করেন। এই বইয়ের মাধ্যমে যারাই উপকৃত হবেন, সেই ভালো কাজের একটা অংশ যেন তাঁর আমলনামায় চলে যায়। আমীন।

—সাজিদ ইসলাম

সূচি

সম্পাদকের কথা ১৩

মুখবন্ধ ১৭

||প্রথম অধ্যায়||

মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

১.১ মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা ২০

১.২ মনোবিজ্ঞান ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ২৩

১.৩ মনোবিজ্ঞানের সেক্যুলার পদ্ধতির প্রধান দুর্বলতাসমূহ.. ২৬

১.৪ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা.. ২৮

১.৫ জ্ঞানের উৎস.. ২৯

১.৬ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ২৯

১.৭ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য ৩২

||অধ্যায় দুই||

মানব প্রকৃতির স্বরূপ

২.১ আদম ও হাওয়ার ঘটনা থেকে মানব প্রকৃতি অনুধাবন ৩৫

২.২ মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ.. ৩৭

২.৩ ফিতরাত ৩৮

২.৪ ফিতরাতের প্রমাণ ৪০

২.৫ জীবনের উদ্দেশ্য : আল্লাহর ইবাদাত করা.. ৪৩

২.৬ আকিদা, ঈমান ও মনোবিজ্ঞান (পারস্পরিক সম্পর্ক).. ৫১

২.৭ আল্লাহর উপর ঈমান ও ভালোবাসা ৫৩

২.৮ আখিরাতের প্রতি ঈমান.. ৫৪

২.৯ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি.. ৫৪

২.১০ মানব আত্মার প্রকৃতি.. ৫৬

২.১১ ভালো ও মন্দ ৫৯

২.১২ নফসের প্রকারভেদ ৬০

২.১৩ অন্তর (ক্বলব).. ৬২

২.১৪ আল্লাহ্ অন্তরের গোপন খবর জানেন.. ৬৪

২.১৫ ক্বলবের প্রকারভেদ ৬৪

২.১৬ অন্তর বিষাক্তকারী বিষয়ের বর্ণনা.. ৬৮

২.১৭ অন্তর ও আত্মায় গুনাহের প্রভাব.. ৭১

২.১৮ নফসের পরিশুদ্ধি ৭৩
২.১৯ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও জবাবদিহিতা ৭৫
২.২০ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, জবাবদিহিতা ও তাকদির ৭৭
২.২১ নিয়তের গুরুত্ব ৭৯

||অধ্যায় তিন||
ব্যক্তিত্ব

৩.১ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮২
৩.২ মুমিনের ব্যক্তিত্ব ৮৪
৩.৩ ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৫
৩.৪ ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান ৯০
৩.৫ মানবিক শক্তিমত্তার তালিকা ৯১
৩.৬ নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৯১
৩.৭ মুনাফিকের ব্যক্তিত্ব ৯৪

||অধ্যায় চার||
অন্তর ও আত্মার উপর কার্যরত বিভিন্ন শক্তি

৪.১ অন্তর ও আত্মার উপর আল্লাহর প্রভাব ৯৭
৪.২ অনুপ্রেরণা ১০৩
৪.৩ ফেরেশতাদের সহযোগিতা ১০৪
৪.৪ শয়তানের পথভ্রষ্টতা ১০৭
৪.৫ নফসের কামনা-বাসনা ও দুর্বলতাসমূহ ১০৮
৪.৬ অন্তর ও আত্মার উপর কার্যকরী শক্তিসমূহের সারকথা ১১১

||অধ্যায় পাঁচ||
মোটিভেশন (প্রেষণা)

৫.১ আধ্যাত্মিক মোটিভেশন ১১৩
৫.২ শারীরবৃত্তীয় প্রেরণা ১১৪
৫.৩ মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা/অভিপ্রায় ১১৭
৫.৪ আমলনামা ও বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ১২১
৫.৫ প্রতিযোগিতামূলক তাড়না ১২২
৫.৬ বস্তুগত তাড়না ১২৩
৫.৭ আগ্রাসী তাড়না ১২৫
৫.৮ সহযোগী তাড়না ১২৯
৫.৯ তাড়না ও অভিপ্রায় (MOTIVES) পূরণে মধ্যমপন্থা ১২৯
৫.১০ সম্পদ ও সুখের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৩০

||অধ্যায় ছয়||
আবেগ

৬.১ ভালোবাসা........ ১৩৩
৬.২ ভয়........ ১৩৫
৬.৩ আশা........ ১৩৭
৬.৪ ভালোবাসা, ভয় ও আশার মধ্যে ভারসাম্য........ ১৩৮
৬.৫ ঘৃণা........ ১৩৯
৬.৬ রাগ........ ১৪১
৬.৭ আবেগের সারকথা........ ১৪৩

||অধ্যায় সাত||
বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও প্রজ্ঞা

৭.১ ইসলামে যুক্তির (আকল) অবস্থান........ ১৪৫
৭.২ জ্ঞান........ ১৪৭
৭.৩ প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা........ ১৫১
৭.৪ জ্ঞানী সম্প্রদায়........ ১৫৫

||অধ্যায় আট||
শিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন (লার্নিং এন্ড মডেলিং)

৮.১ ক্লাসিক্যাল ও অপারেন্ট কন্ডিশনিং (CLASSICAL AND OPERANT CONDITIONING):........ ১৫৮
৮.২ আধ্যাত্মিক নমুনা প্রদর্শন (মডেলিং)........ ১৫৯

||অধ্যায় নয়||
জীবনের উত্থান-পতন ও পরীক্ষা

৯.১ পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টের উদ্দেশ্য........ ১৬৫
৯.২ ধর্মীয় কোপিং (RELIGIOUS COPING) এর উপকারিতা........ ১৭০

||অধ্যায় দশ||
চেতনা, ঘুম এবং স্বপ্ন

১০.১ ঘুম........ ১৭৪
১০.২ ঘুমের আদবকেতা........ ১৭৫
১০.৩ স্বপ্ন........ ১৭৭
১০.৪ স্বপ্নের ব্যাখ্যা........ ১৭৮

||অধ্যায় এগারো||
মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

১১.১ মা ও শিশুর বন্ধন এবং বুকের দুধপান করানোর গুরুত্ব........ ১৮২
১১.২ বার্ধক্য ও বয়স বৃদ্ধি........ ১৮৩
১১.৩ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা........ ১৮৪

১১.৪ মৃত্যুযন্ত্রণা ও বিহ্বলতা ১৮৫
১১.৫ মৃত্যুর পূর্বে তাওবা ১৮৬
১১.৬ মৃত্যুকালে মুমিনের আনন্দ ও কাফিরের দুঃখ ১৮৭

||অধ্যায় বারো||

সামাজিক মনোবিজ্ঞান

১২.১ সামাজিক সমর্থনের ভূমিকা ১৮৮
১২.২ পরিবার ও প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন) ১৯০
১২.৩ বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব ১৯০
১২.৪ ইসলামে মাতৃত্ব ১৯৪
১২.৫ নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা ১৯৫
১২.৬ পরিবার কাঠামো পুনঃসংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা ১৯৬
১২.৭ মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ১৯৮
১২.৮ ভালোবাসা ও ভাতৃত্ব ১৯৯
১২.৯ মিত্রতা ও বৈরিতা (আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ) ২০১
১২.১০ তিন ধরনের মানুষ ২০৩

||অধ্যায় তেরো||

শয়তান, জিন ও মানুষ

১৩.১ শয়তানের লক্ষ্য ২০৯
১৩.২ শয়তানের ওয়াসওয়াসা ২১২
১৩.৩ জাদু ২১৩
১৩.৪ বদনজর ও হিংসা ২১৭
১৩.৫ জিনের আছর ২১৯
১৩.৬ শয়তানের কর্মপদ্ধতি ২২২
১৩.৭ শয়তান ও বদ জিন থেকে সুরক্ষা ২২৬

||অধ্যায় চৌদ্দ ||

অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান ও মানসিক অসুস্থতা

১৪.১ মানসিক অসুস্থতার সংজ্ঞায়ন ২২৮
১৪.২ আত্মহত্যা ২৩২
১৪.৩ মানসিক অসুস্থতার কারণসমূহ ২৩৩
১৪.৪ ধর্মপরায়ণতা ও মানসিক সুস্থতা ২৩৬

||অধ্যায় পনেরো||

কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি

১৫.১ সাইকোথেরাপি যেভাবে কাজ করে ২৪০
১৫.২ ধর্মীয় সাইকোথেরাপি (RELIGIOUS OR ২৪৩

THEOLOGICALPSYCHOTHERAPY ২৪৩
১৫.৩ মুসলিমদের সাথে ধর্মীয় সাইকোথেরাপি ২৪৫
১৫.৪ রুকইয়া... ২৪৭

||অধ্যায় ষোল||
শান্তিময় নির্মল জীবন

১৬.১ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ২৫০
১৬.২ আল্লাহর উপর ভরসা করা ২৬৩
১৬.৩ গভীর চিন্তা ও পর্যালোচনা... ২৬৪

||অধ্যায় সতের||
ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের উপকারিতা

১৭.১ আল্লাহর সাহায্য ২৬৭
১৭.২ আধ্যাত্মিক নূর... ২৬৮
১৭.৩ একটি সুন্দর জীবন (হায়াতে তাইয়েবা)... ২৬৯

সারাংশ ও উপসংহার... ২৭১

||সম্পাদকের কথা||

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বান্দাকে কাজে লাগান, অযোগ্য লোককে দিয়েও বড় বড় কাজ নেন। কোনো উপায়-উপকরণ-পদ্ধতি- যোগ্যতার মুখাপেক্ষী নন তিনি। আর দরূদ ও সালাম প্রাণের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফে।

বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার সুযোগ পেলে একটা কথা পাড়ার চেষ্টা করি। সব নবিকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য 'মু'জিযা' দিয়েছিলেন আল্লাহ। কোনো ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা সত্যায়িত করে দেন, যে এটা অরিজিনালটারই ফটোকপি, আমি স্বাক্ষরকারী অরিজিনালটা দেখেছি। তেমনি নবিদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য দেয়া হতো মু'জিযা, যে ইনিই আল্লাহর সত্যায়িত বার্তাবাহক। সত্যসন্ধানীরা আল্লাহর তাওফিকে বুঝে যেত যে ইনিই নবি। আর হতভাগারা তা বুঝেও হঠকারিতা করত। বলত কবি-জাদুকর-পাগল-জিনে পাওয়া। আমাদের নবিজি (সা.) মু'জিযা বা সত্যায়ন ছিল 'কুরআন', হাদিসে এসেছে। মু'জিযা শব্দের অর্থ হলো, যা হয়রান করে দেয়, হতভম্ব করে দেয়—এতটাই যেন অবশ হয়ে যায় দেহ-মন। তাহলে কুরআন হতভম্ব করে দেবে সংশয়ীকে বা অবিশ্বাসীকে, যে সত্যকে খোঁজে এমন কাউকে। এখন আসেন, হতবাক মানুষ কখন হয়? আকস্মিকতায় আর বিস্ময়ে। এখানে মূল কারণ হবে বিস্ময়। বিস্ময় তখনই আসে যখন কোনোকিছু আমার সাধ্য, অভিজ্ঞতা বা কল্পনার সীমাকে ছাপিয়ে যায়। আমার সামর্থ্যকে যা চ্যালেঞ্জ করে, তার প্রতি আমি বিস্মিত হই— বাহ! কী দারুণ। কুরআনের এই হয়রান-হতবাক করে দেয়া বৈশিষ্ট্যের মুখোমুখি যারা প্রথম হয়েছিল, তারা ছিল জাতিতে আরব। কাব্য ছিল তাদের রক্তে। কাব্য ছিল তাদের বিনোদন, তাদের গণমাধ্যম, তাদের ইতিহাস আর্কাইভ, তাদের মোটিভেশনাল স্পীচ। কাব্যই ছিল তাদের বংশগৌরবের বিষয়—'অমুক কবি আমাদের বংশের'। যুদ্ধের কবিতা, প্রেমের কবিতা, আটপৌরে জীবনের কবিতা। কুরআন এসেই তাদের কবিমানস ধরে নাড়া দিল, ছুঁড়ে দিল চ্যালেঞ্জ— সামর্থ্য থাকে তো নিয়ে এসো এর কাছাকাছি কিছু; একটা কিতাব নিয়ে আসো এমন, না পারো তো একটা সূরাহ নিয়ে এসো এমন, তাও না পারো একটা আয়াতই বানিয়ে আনো এমন।

কাবার দরজায় টাঙানো ছিল বহুদিন ধরে শ্রেষ্ঠ ৭টি আরবি কবিতা, বলা হতো 'সাবআ মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত সপ্তক'। যখন সূরাহ কাউসার অবতীর্ণ হয়, তখন এই ৭ জনের কেবল একজন বেঁচে আছে। আবু জেহেল তার কাছে নিয়ে গেল 'সূরাহ কাউসার'। সূরাহ দেখে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল: 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য, এটি

মানুষের কথা হতে পারে না'। সে তখন কাবায় গেল, নিজের কবিতা সেখান থেকে নামিয়ে দিল, সূরাহ কাউসার লেখা কাগজটা সেখানে টাঙিয়ে দিল, আর নিচে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটি লাইন লিখে দিল: 'মা হাযা কালামুল বাশার'—এটা কোনো মানুষের কথা নয়'। কাব্যে excellence অর্জনকারী ডাকসাইটে কবি হয়রান হয়ে গেল নিজের সামর্থ্যের অতীত, কল্পনাতীত ভাষার কারুকাজ দেখে। এটাই মু'জিযা।

সেই নবি তো আজও নবি, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি নবি, আরবভূমি ছাপিয়ে সারা বিশ্বের জন্য নবি। তার মু'জিযা তো কিয়ামত তক মু'জিযা। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো যুগের যেকোনো জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে, তাদের excellence-কে ছাপিয়ে তাদের হয়রান করে দেবার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে কুরআনকে।

♣ এজন্যই কখনো আপনি দেখবেন এনাটমির প্রোফেসর *Tejatat Tejasen* কে বলতে—

From my study and what I have learned from this conference, I believe that everything that has been recorded in the Quran fourteen hundred years ago must be the truth, that can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is eligible [as the] creator. This creator must be God.

♣ কখনো দেখবেন ভ্রূণতত্ত্ববিদ প্রোফেসর *Keith L. Moore*-কে বলতে— the description of embryo in quran cannot be based on the scientific knowledge available in 7th century. কুরআনে ভ্রূণবিকাশের যে বর্ণনা, তা সপ্তম শতাব্দীর জ্ঞান হতে পারে না।

♣ দেখবেন সমুদ্রতত্ত্ববিদ William Hay-কে বলতে:

I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover it, the meaning of some of the passages.Well, I would think it must be the divine being.

নেট ঘাঁটলে এমন বহু সাক্ষাতকারের ভিডিও ক্লিপ আপনি পাবেন। এঁরা সবাই নিজ নিজ ফিল্ডে excellence অর্জন করেছেন, হয়রান হয়ে তারা ঘোষণা করেছেন— 'এটা কোনো মানুষের জ্ঞান না'। ইসলাম কবুল করুক বা না করুক, বিবেকের কাছে যে পরিষ্কার, সে স্বীকার করেছে, এবং এরা সবাই সেই আরব কবির মতো নিজ বিষয়ে পারদর্শী। আল্লাহ যাকে চাইবেন, যার মনের সন্ধানী শুদ্ধতা তাঁর পছন্দ হবে, সে বুঝে মেনে নিবে। আবার কেউ কেউ বুঝে অস্বীকার করবে, ইনিয়েবিনিয়ে ব্যাখ্যা করবে— হয়তো মুহাম্মদ বাইরে থেকে জেনেছে, হয়তো তিনি অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন, হয়তো...ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন আরবেও তারা করেছিল। কেন করেছিল? পদ, নেতৃত্ব,

সামাজিক অবস্থান, লাইফস্টাইল, পরিবার, খাহেশ পূরণে বাধার ভয়ে। এমন আজও পাবেন, মুসলিমদের ভিতরেই পাবেন, এগুলোর ভয়ে ইসলাম মানছে না।

বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞান স্রেফ 'পর্যবেক্ষণ', স্রেফ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাওয়ার বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা বেড়েছে। দূরবীন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড, রেকর্ডিং, ইসিজি, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বহুকিছু। আগে মানুষ যা দেখতে পেত না, তা দেখতে পাচ্ছে। যা শুনতে পেত না, তা ভিন্নভাবে বুঝছে। যা বুঝত না, তা বুঝে নিচ্ছে। ইসিজির গ্রাফ দেখে হার্টের ভোল্টেজ বুঝে নিচ্ছে, এক্স-রে দেখে ভিতরের হাড় দেখে নিচ্ছে, সাউন্ড দিয়ে দেখছে গর্ভের সন্তান, ডপলার দিয়ে দেখছে হার্টের ছিদ্র। মানে বিজ্ঞানের কারণে মানুষের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন বহুগুণে। ফলে যা আগে বোঝা কঠিন অসম্ভব ছিল, তা আজ চোখে দেখা যায়। আসলে তো কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়, যে এখানে বিজ্ঞানের বিষয় স্পষ্ট থাকবে। এখানেই কুরআনের মু'জিযা যে, কুরআন সে যুগের কবিদের কাছেও মু'জিযা ছিল, যদিও কুরআন কোনো কবিতার বই না। এ যুগেও বিজ্ঞানীদের কাছে কুরআন মু'জিযা, যদিও এটা বিজ্ঞানের বই না। কুরআনের উদ্দেশ্য আমাদের সতর্ক করা, কিন্তু আমাদের সতর্ককারী বিষয়ের মধ্যেই এমন মু'জিযা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের excellence–কে চ্যালেঞ্জ করবে, তাদের expert-দেরকে হয়রান করবে। বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের সত্যতার সম্পর্ক নেই, এসব expert-রা সবাই যোগসাজশ করে কুরআনকে 'ভুল' বললেও কুরআন ভুল হয়ে যাবে না। কিন্তু এটাও আল্লাহই করবেন, যুগে যুগে কিছু এক্সপার্টদেরকে দিয়ে তাঁর কালামের মু'জিযা প্রকাশ করে দেবেন। কিয়ামত তক করবেন। বিজ্ঞান কুরআনকে প্রমাণ করে না, জাস্ট অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ করে। মনে রাখার বিষয় এতটুকুই—বিজ্ঞানকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, তাই এটা ঈমানের ভিত্তি নয়। আমরা বিশ্বাস করি গায়েবে, বিজ্ঞানে না। তবে কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ মুমিনকে তৃপ্তি দেয়, এই তৃপ্তি আল্লাহরই নিয়ামত, যেমনটি তিনি পিতা ইবরাহিম (আ.)-কে দিয়েছিলেন।

ড. আইশা উটজ হামদান আমেরিকান বংশোদ্ভূত নওমুসলিম। পেশায় ছিলেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন একাডেমিক টপিককে তিনি ইসলামের নজরে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সেক্যুলার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ যে মানবসত্তা ও মনের ব্যখ্যায় এবং মনোচিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়, তা একাডেমিকভাবে তুলে ধরেছেন। মানসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা, প্রশান্তিময় জীবন এবং যেকোনো মানসিক ট্রমা-য় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার যে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে, এবং সেটা সেক্যুলার বিজ্ঞানও এখন এসে মেনে নিচ্ছে, কীভাবে সাইকোথেরাপিতে ধর্মীয় আচারের উপর জোর দেয়া হচ্ছে—সে বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। তবে প্রচলিত বিজ্ঞানের সাথে তুলনা এই বইয়ের মূল উপজীব্যও নয়, মূল সার্থকতাও নয়। লেখিকার মূল সার্থকতা হলো: তিনি এখানে মনোবিজ্ঞানের ইসলামি বয়ান হাজির করতে পেরেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে।

একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের স্বতন্ত্র ভিউপয়েন্ট রয়েছে সব ব্যাপারেই। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় মানুষকে কেবল সামাজিক জীব মনে করা হয়। ইসলাম মানুষকে বলছে আধ্যাত্মিক জীব। যার আধ্যাত্ম শক্তি যত মজবুত, সে তত ভালো মানুষ। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করবে। ইসলাম মানবতা, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাখ্যা দেয়। এবং এমন একটা জীবন কাঠামোর কথা বলে, যা মানবসত্তার 'ভাল থাকা'র নিশ্চয়তা দেয়। ধর্মীয় আচার, অন্তরের চর্চা, বিশ্বাস, আন্তঃসম্পর্ক, আত্মনিয়ন্ত্রণ—সবকিছুর সমন্বয়ে ইসলাম এমন এক জীবনের কথা বলে যা অর্থপূর্ণ, স্বচ্ছন্দ, এবং মানবসত্তার মনোদৈহিক সহজাত স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্যই মানুষের মন, মনের নানান অংশ, মনের নানান মিথস্ক্রিয়া, ভাঙা মন, মন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় ইসলাম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, কেননা পরকালের কনসেপ্টটাই মনের সাথে জড়িত। ইসলাম এমন একটা ব্যবস্থা যা পরকালের সাথে সাথে ইহকালীন কল্যাণের উপরেও জোর দেয়, এবং ইহকালের সাথে পরকালের সম্পর্ক নির্দেশ করে। এভাবে মানুষের সহজাত স্বভাবের অনুকূল এক জীবনাচার ইসলাম নিরূপণ করে দেয়, যা নিশ্চিত করে মানবসত্তার 'ভালো থাকা'। মন, মনোবিজ্ঞান ও মনোচিকিৎসার ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত উঠে এসেছে একাডেমিক ধাঁচে।

তবে যারা আমরা একাডেমিক নই, আমাদের প্রত্যেকের বইটি পড়া দরকার। এই জন্য যে, নিজের মনকে চেনা আর সবকিছু চেনার চেয়ে বেশি দাবি রাখে। পুরো একটা জীবন কেটে যায় নিজেকে জানা হয় না। সবার জন্য সময় বের করা যায়, নিজের জন্য সময় বের হয় না। আমার মন কী, কী চায়, মনের কী কী জিনিস প্রশ্রয় দেব, কী কী নিয়ন্ত্রণ করব, ভাঙা মন কীভাবে সামলাব, কেন 'আমি ভালো নেই' অনুভূতি হয়, উত্থানপতনে মনকে কীভাবে সামলাতে হয়—এগুলো তো জীবনের সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা হওয়া উচিত। একেকটা পাবলিক পরীক্ষার পর আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যাচ্ছে, কী শিক্ষা দিচ্ছি আমরা আমাদের বাচ্চাদের? বাবা-মা হিসেবে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ। এজন্য প্রত্যেকের বইটা পড়া উচিত নিজের মনের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য। আমার মনের স্বভাব জানলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা আমার জন্য সহজ। মনের হাতে নিজের নাটাই তুলে না দিয়ে আমার হাতে আমার মনের নাটাই থাকবে, এটাই কাম্য।

'মানসাঙ্ক' লেখার সময় মনোবিজ্ঞানের অনার্স লেভেলের বেশকিছু বই পড়তে হয়েছিল। মেডিক্যালে এমবিবিএস কোর্সে সাইকিয়াট্রিও কিছু পড়তে হয় আমাদের। সেই বিদ্যাটুকু কাজে লেগে গেল এখানে। সকলকে পড়ার আহ্বান। চর্চা করার আহ্বান। ইহকাল ও পরকালে ভালো থাকাই হোক আমাদের জীবনদর্শন।

ডা. শামসুল আরেফীন
চিকিৎসক, লেখক

||মুখবন্ধ||

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাঁর কাছে হিদায়াত চাই। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফসের অনিষ্ট হতে এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট হতে। যাকে আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি শরিক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে মুহাম্মদ (সা.)তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশের সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি বিভাগে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পরবর্তীতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও আমি কোনো সন্তোষজনক সাইকোলজিক্যাল থিওরি খুঁজে পাইনি যা বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে মানব মনের প্রকৃতি ব্যাখা করতে পেরেছে। যদিও বিভিন্ন সেক্যুলার সাইকোলজিস্টদের প্রায় ২৫০ এর অধিক তত্ত্ব আমি অধ্যয়ন করেছি, এর একটিও আমাকে মানব মনের সঠিক ব্যাখা প্রদান করতে পারেনি। কিছু থিওরিকে অন্য থিওরির থেকে অধিক আকর্ষণীয় মনে হলেও, সব সময় মনে হতো কী যেন নেই, কী যেন নেই। খণ্ড খণ্ড টুকরোগুলো মিলে একত্রে যেন কোনো ছবি তৈরি করতে পারেনি।

ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের পর আমি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য খুঁজতে শুরু করলাম। (যদিও পিএইচডি অর্জনের বহু আগেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি)। শুরুতে এই অনুসন্ধান কিছুটা কঠিন ছিল। কেননা, বিভিন্ন ভ্রান্ত সুফিবাদী মতামত ও দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে বিশুদ্ধ ইসলামি সাইকোলজিকে পৃথক করতে হয়েছে। অবশেষে আমি আল্লাহর অনুগ্রহে ইংরেজি ভাষাতে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিশুদ্ধ উৎসের সন্ধান পাই। আমি সেগুলো পড়তে শুরু করি এবং যতই পড়েছি ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে সত্যটা। আমি অবাক হয়ে দেখেছি ইসলামি পদ্ধতি কত জটিলতামুক্ত! সবশেষে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমি যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করছিলাম তা মিলেছে ইসলামের মধ্যেই। ইসলাম সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ চিত্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সোজাসাপ্টা ব্যাখা প্রদান করে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের গুরুত্ব কিংবা জীবনে কোনো বিষয়গুলো প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইত্যাদি সবকিছু ইসলামে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিভাবে আমরা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, কিভাবে শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে পারি

ইত্যাদি ধাপগুলোর আলোচনা ইসলামে রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব। এই পথে দৃঢ়পদ থাকা সহজ না হতে পারে, তবে লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব নিশ্চিতভাবেই।

যখন আমি জানলাম যে আমরা সবকিছুতে নিছক আমাদের জেনেটিক গঠনের ভিকটিম নই কিংবা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বা বর্তমান পরিবেশ দ্বারা সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নই, তখন আমার মনে শান্তির সুবাতাস বয়ে গেল। কিছু ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। সেই স্বাধীন সিদ্ধান্তের অর্থ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং রব আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করা। এবং এই আত্মসমর্পণ হতে হবে তাঁরই দেখানো পথনির্দেশ মোতাবেক। এই পথই হলো একমাত্র পথ, যা দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের সুখ-শান্তি দিতে পারে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা যেন এক নিরাপদ অভয়ারণ্যে প্রবেশ করি। যা আমাদের নিরাপত্তা দেয় জীবনের নানাবিধ চড়াই-উতরাই, পরীক্ষা, বাধা-বিপত্তি, মানসিক চাপ এবং প্রবৃত্তির হীন কামনাবাসনা থেকে।

আমি মূলতঃ আগ্রহ পেয়েছি এতদিন নানান সেক্যুলার তত্ত্ব প্রচারকারী পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা থেকে। তাদের করা রিসার্চগুলোই এখন মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করছে। ধার্মিক ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের উপর ধর্মের যে গভীর প্রভাব রয়েছে, আধুনিক গবেষণার ইশারা এখন সেদিকেই। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যতই আগ্রহী হচ্ছেন, ততই আরো বেশি প্রমাণ মিলছে। বিভিন্ন আবেগিক, মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা নিরাময় ও প্রতিরোধে ধার্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতা অত্যন্ত উপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হচ্ছে। এসকল গবেষণা বাস্তবিকই নির্দেশ করছে ইসলামের সত্যতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> "এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১ : ৫৩)[১]

---

[১] কুরআনের আয়াতসমূহের অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত 'আলকুরআনুল করীম-' থেকে।

||প্রথম অধ্যায়||
মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

> 'আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন।' (সূরাহ যুমার, ৩৯;৪১)

একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত নমুনা (মডেল) উপস্থাপন করেছে। আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, আবেগিক, সামাজিক তথা সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের শিক্ষা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, মজ্জাগতভাবে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। ফলে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর সাথে আমাদের একটি সংযোগ বজায় রাখতে হয়, সেটার পরিচর্যা নিতে হয়। সুখ-শান্তি হচ্ছে এমন দুটি চির ছলনাময়ী উপাদান, যা অর্জনের চেষ্টা মানুষ চালায় তার সত্তার সূচনা থেকেই । আর সেই অন্তরের সুখ-শান্তি ধরা দেয় আল্লাহর সাথে আমাদের সংযুক্ত থাকার মাধ্যমেই । আমাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ, ইচ্ছা ও আচার-আচরণের উদ্দেশ্য অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মানসিক সুস্থতা ও 'ভালো থাকা'র সূত্র হলো মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর আদেশের প্রতি অনুগত থেকে সদাসর্বদা আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখা।

এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মনোবিজ্ঞান, মানসিক সুস্থতা ও 'ভালো থাকা'র উপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা। আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে নানা দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং গবেষক মানবসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়ে হয়রান হয়েছেন। অথচ মানবসত্তার সবচেয়ে নিখুঁত, বিস্তারিত এবং সার্বিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া ছিল কুরআন ও হাদিসে। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সম্পর্কে আমাদের থেকেও ভালো জানেন। যে জ্ঞান অব্দি আমরা কখনোই পৌঁছতে পারব না, তাও তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তে। কাজেই, আমাদের রব ওহীর মাধ্যমে যা কিছু তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে প্রকাশ করেছেন, তার মাধ্যমেই মানব প্রকৃতির স্বরূপ বুঝতে হবে।

ধর্মীয় ভিত্তিকে এড়িয়ে যাবার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেক্যুলার সাইকোলজিস্টদের গবেষণাগুলো ইসলামের সত্যতাকেই সমর্থন করে। এই মর্মে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করা অত্র বইয়ের **আরেকটি উদ্দেশ্য**। উল্লেখ্য, ইসলাম

বৈজ্ঞানিক সত্যায়নের মুখাপেক্ষী নয়, কেননা কুরআন নিজেই সত্যতার সবচেয়ে বড় দলিল। অথচ বর্তমান যুগে লোকেরা বিজ্ঞানকে ওহীর উপর প্রাধান্য দেয়। ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিপরীতে ইসলামে আবিষ্কৃত বিষয়াদির বাস্তবতা উপস্থাপন করাও জরুরি। একজন অহংকারী ব্যক্তিও বিনীত হতে বাধ্য হয়, যখন সে দেখে সারাজীবন যে তত্ত্ব 'প্রমাণ' করার চেষ্টায় সে ক্লান্ত, সেটি কিনা চৌদ্দশ বছর আগেই কুরআনের আয়াত ও রাসূলের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে!

নিজেকে বদলানোর (সেলফ ট্রান্সফর্মেশন) যোগ্যতা প্রত্যেকটা মানুষকে কিভাবে ইসলাম প্রদান করেছে, সেটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই বইয়ের **আরেকটি সম্পূরক উদ্দেশ্য।** দুনিয়াতে এমন কোনো 'সেলফ হেল্প' বই নেই, যা ইসলামের কালোত্তীর্ণ শিক্ষার সমান্তরালে দাঁড়াতে পারে! যে শিক্ষা আপনাকে বদলে দেবেই দেবে।

ইসলামের অসাধারণ সম্ভাবনা ও সক্ষমতা অনুধাবনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের গড়া প্রথম মুসলিম সমাজের ঘটনাবলীতে চোখ বুলানোই যথেষ্ট। ইসলামের অসাধারণ রূপান্তরী শক্তিতে জাহেলী আরব সমাজ পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল। জুলুম, প্রতারণা, লোভ-লালসা ও অহংকারে নিমজ্জিত সেই সমাজ এমন এক সমাজে পরিণত হলো যেখানে ছিল কেবলই ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিনয়। ইসলামের অনুরূপ অর্জন আর কোনো জীবনব্যবস্থা করতে পেরেছে? পুরো মানব ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় নজির পাওয়া যায় না।

মনোবিজ্ঞানের বিস্তারিত আলোচনা করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, তবে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো এখানে আলোচনায় চলে এসেছে, যেমন- *মনোবিজ্ঞানের সাধারণ পরিচিতি; মানব মনের স্বরূপ; ব্যক্তিত্ব; আত্মার উপর কার্যকরী শক্তিসমূহ; মোটিভেশন (প্রেষণা); আবেগ; বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও প্রজ্ঞা; 'লার্নিং এন্ড মডেলিং' (শিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন); জীবনের বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষাসমূহ; সচেতনতা, ঘুম ও স্বপ্ন, 'লাইফস্প্যান ডেভেলপমেন্ট' (বয়স বৃদ্ধি ও বার্ধক্য); সামাজিক মনস্তত্ত্ব; শয়তান, জিন ও মানুষ; অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব ও মানসিক অসুস্থতা; কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি; শান্তিময় নির্মল জীবন, ইবাদতের উপকারিতা* ইত্যাদি।

১.১ মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা

পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে রচিত সাইকোলজির যেকোনো পরিচিতিমূলক টেক্সট বইতে আপনি দেখতে পাবেন, মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞাটি অনেকটা এরকম :

> The scientific study of **behavior** and **mental processes;** behavior is considered to be anything that an individual does or any action that can be observed by others. mental processes are the internal, subjective, unobservable components, such as thoughts, beliefs,

feelings, Sensations, perceptions Etc., that can be inferred from Behavior.[১]

আচার-আচরণ ও মানসিক কার্যপ্রণালীর বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে মনোবিজ্ঞান বলে। আচরণ হলো কোনো ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য কাজ যা অন্যরা দেখতে পায়। আর মানসিক কার্যপ্রণালী দেখা যায়না, অপর্যবেক্ষণযোগ্য; এগুলো আভ্যন্তরীণ, আপেক্ষিক ও অদৃশ্য উপাদানসমূহের সমষ্টি। যেমন- চিন্তা, বিশ্বাস, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, উপলব্ধি ইত্যাদি। আচরণ হতে মানসিক কার্যপ্রণালী অনুমান করা যায়।

বিজ্ঞানের একটি শাস্ত্র হিসেবে মনোবিজ্ঞানে যেসব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে: আমরা কারা? আমাদের মৌলিক প্রকৃতি কিরূপ? আমাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ ও আচার-আচরণে উৎস কি? কিভাবে আমরা নিজেরাই সেসব উৎস পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইত্যাদি। নানাবিধ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয় মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে। সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, মানুষের আচরণ, মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া ও আবেগ-অনুভূতিকে বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা এবং পূর্বানুমান ও নিয়ন্ত্রণ করা।

আপাতদৃষ্টিতে তাদের এই প্রচেষ্টা মূল্যবান, সার্থক ও সমাজের জন্য উপকারী বলেই মনে হয়। কিন্তু নিবিড় নিরীক্ষণে (বিশেষত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) এর নানাবিধ ত্রুটি ও ঘাটতি চোখে পড়ে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো, মানবসত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আত্মাকে(soul) উপেক্ষা করা। এক্ষেত্রে বর্তমানে কিছুটা অগ্রগতি অর্জিত হলেও মানুষের অস্তিত্বের জৈবিক, আচরণগত ও সামাজিক দিকগুলো সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানে খুব কমই আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে মানব প্রকৃতির সার্বিক ও পরিপূর্ণ তত্ত্ব প্রদানে এখনো বেশ ঘাটতি রয়ে গেছে। এছাড়া ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও 'ভালো থাকা'র পক্ষে কার্যকরী ও টেকসই পদ্ধতি বাতলানোতেও রয়ে গেছে কমতি।

মজার ব্যাপার হলো, 'সাইকোলজি' শব্দটি বুৎপত্তিগত অর্থেই আত্মা বা রূহ (soul or spirit) সম্পর্কিত অধ্যয়নকে বুঝিয়ে থাকে। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর পৃথক হওয়ার আগে রূহ বা আত্মার আলোচনা মনোবিজ্ঞানের একটি বড় স্থান দখল করত। এমনকি আধুনিক সময়েও অনেক পেশাদার মনোবিজ্ঞানী রয়েছেন যারা সেই বিশ্বাসগুলো আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। তারা মূলত ইহুদি-খ্রিস্টান পটভূমি থেকে এসেছেন, যদিও তাদের সংখ্যা (অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের তুলনায়) খুবই অল্প। ফলে, মনোবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলো রয়ে গেছে সেক্যুলার প্রকৃতিরই।

---

[১] Myers, D.G., 2007, Psychology (8th ed.), New York: Worth Publishers, p. 2.

বাস্তবে মনোবিজ্ঞানীরা কম ধর্মপরায়ণ হন সাধারণ মানুষের চেয়ে। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে নিম্নের তথ্য উঠে এসেছে:

ক্রম	সূচক	সাধারণ মানুষ	মনোবিজ্ঞানী
১	নিজেকে কোনো ধর্মের অনুসারী দাবী করেন না।	৬%	১৬%
২	জীবনে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না	১৫%	৪৮%
৩	নাস্তিকতা অনুসরণ করেন	৫%	২৫%
৪	'আমার জীবনের গতিপথ ধর্মের উপর নির্ভরশীল'	৭২% হ্যাঁ বলেছেন	৩৫% হ্যাঁ বলেছেন
৫	আল্লাহকে (গড) বিশ্বাস করেন?	৯৫% হ্যাঁ বলেছেন	৬৬% হ্যাঁ বলেছেন

অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাধারণ মানুষ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে,
১। শতকরা প্রায় দ্বিগুণের বেশি মনোবিজ্ঞানী (যথাক্রমে ৬% বনাম ১৬%) নিজেকে কোনো ধর্মের অনুসারী দাবি করেন না।
২। জীবনে ধর্মের ভূমিকা অগুরুত্বপূর্ণ মনে করার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য তিনগুণের অধিক (১৫% বনাম ৪৮%),
৩। আর নাস্তিকতা অনুসরণের ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের তুলনায় মনোবিজ্ঞানীদের শতকরা হার পাঁচগুণ বেশি (৫% বনাম ২৫%)।
৪। নিয়মিত প্রার্থনা করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া কিংবা ধর্মীয় কাজে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষদের থেকে সাইকোলজিস্টরা পিছিয়ে।[২]
৫। 'আমার জীবনের গতিপথ ধর্মের উপর নির্ভরশীল'এই বক্তব্যের সাথে ৩৫% মনোবিজ্ঞানী একমত হয়েছেন অথচ সাধারণ মানুষদের মধ্যে ৭২% একমত হয়েছেন।
৬। আল্লাহ (তাদের ভাষ্যমতে 'গড') বিশ্বাস করেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে ৬৬% মনোবিজ্ঞানী এবং ৯৫ % সাধারণ মানুষ হ্যাঁ বলেছেন।

গবেষকরা (গবেষণাপত্রটি যারা লিখেছে) এই পরিসমাপ্তিতে পৌঁছেছেন যে, সাইকোলজিস্টরা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক কম ধর্মপরায়ণ, যদিও জরিপে অংশগ্রহণকারীরা (ধর্মের বদলে) আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এবং এক্ষেত্রে তারা আধ্যাত্মিকতাকে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় বলে ইঙ্গিত করেছেন; যার সংজ্ঞা এতই

[২] Delaney, H.D., Miller, W.R & Bisono, A.M., 2007, Religiosity and spirituality among psychologists: A survey of clinician members of the American Psychological Association, Professional Psychology: Research and Practice, 38(5), p.542.

হালকা বানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ধর্মও এর জন্য খুব একটা জরুরি না। এ কারণে কিছু মানুষ নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক বলে মানলেও ধার্মিক মানতে চান না, তারা বলেন, 'আমরা আধ্যাত্মিক তবে ধার্মিক নই।'[৩]

১.২ মনোবিজ্ঞান ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস

সেক্যুলার সংজ্ঞানুসারে ধারণা করা হয়, আমাদেরকে দুনিয়াতে নিজের খেয়াল-খুশীমত চলার স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, 'ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ' বা জবাবদিহিতার কোনো বালাই নেই। এই মতে ধরে নেয়া হয়, আমাদের জীবনে আল্লাহর কোনো প্রভাব নেই। এমনকি অনেকে এটাও অস্বীকার করেন যে, কোনো উচ্চতর সত্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে সেক্যুলার ধারণায় আমরা নিছক একটি দৈহিক সত্তার সাথে সংযুক্ত কিছু আবেগ, চিন্তা ও আচরণের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নই। মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ বলে ধরে নেয়া হয়।

অধিকাংশ আচরণবিদ (Behavioural scientists) বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদকে (সায়েন্টিফিক ন্যাচারালিজম) স্বতঃসিদ্ধ মনে করে তাদের তত্ত্ব ও গবেষণাসমূহ দাঁড় করিয়েছেন। এই দর্শন অনুসারে বলা হয়:

'মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ, এখানে কোনো অতিপ্রাকৃত প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। আর সকল সম্ভাব্যতা অনুসারে, বিজ্ঞান এই বিশ্বজগতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে সেটাই বাস্তবতার একমাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।'[৪]

এই মতে ধরে নেয়া হয়, কোনো ঐশ্বরিক প্রভাব বা আল্লাহর (God) দিকে প্রত্যর্পণ ব্যতীতই মানব সত্তা ও মহাবিশ্বকে অনুধাবন ও ব্যাখা করা যায়।[৫]

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের শেকড় প্রোথিত 'দৃষ্টবাদ' ও 'অভিজ্ঞতাবাদ' নামক দুটি মতবাদের উপর।

দৃষ্টবাদ (positivism) অনুসারে, 'দৃশ্যমান ঘটনাসমূহ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ফলে একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করা যায়।'[৬] এভাবে দলীলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টবাদ (positivism): অগাস্ট কোঁৎ তার 'Course de Positive Philosophy' গ্রন্থে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'দৃষ্টবাদ' অন্যতম। অগাস্ট কোঁৎ জ্ঞানের সমগ্র বিকাশের ধারাকে

[৩] Ibid, p 542.I(S.B.N.R = spiritual but not religious)

[৪] Honer, S.M., and Hunt, T.C., 1987, Invitation to Philosophy: Issues and Options (5th ed.) Belmont, CA: Wadsworth, p.225.

[৫] Richards, P.S., 2005, Theistic psychotherapy, Psychology of Religion Newsletter 31(1), p.1.

[৬] Honer and Hunt, 1987, p.226.

তত্ত্বসমূহকে প্রমাণ করা হয় এবং সেগুলো বাস্তবতার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে।[৭]

অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) একটি তুলনামূলক বা আপেক্ষিক ধারণা; এই মতবাদে ধরে নেওয়া হয় যে জ্ঞানের চূড়ান্ত এবং প্রকৃত উৎস হল অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা লব্ধ যুক্তি।[৮] সহজ কথায় যদি কোনো কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লব্ধ না হয় তাহলে সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না।

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে এটি সুস্পষ্ট যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যতটুকু স্বীকার করেন বাস্তবতা তার চেয়েও অনেক জটিল। গায়েব বা অদৃশ্য জগৎকে মানবিক বোধশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না; গায়েবের জগত দৃশ্যমান জগত অপেক্ষা ব্যাপক। উপরন্তু দৃশ্যমান জগতে অদৃশ্য জগতের নানা মিথস্ক্রিয়া ও প্রভাব বিদ্যমান।

তিনটি স্তরে ভাগ করেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের বিকাশের তৃতীয় বা চূড়ান্ত যুগ হচ্ছে পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদ। এ যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রকৃতির বাইরে ঈশ্বর বা অন্য কোনো চরম সত্তাকে অস্বীকার করা হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা এবং দৃশ্যমান প্রকৃতিই এখানে চরম সত্য এবং একে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। কোঁতের দৃষ্টবাদের মূলকথা হচ্ছে, এ স্তরে বিজ্ঞান শুধু বাস্তব জগতের দৃষ্ট দৃশ্যমান বিষয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করবে এবং এর বাইরে অন্য কিছু অনুসন্ধান করবে না।

অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism): সাধারণত অভিজ্ঞতাবাদ বলতে এরূপ তত্ত্বকে বোঝায় যেখানে মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস গণ্য করা হয়। (অনুবাদক)

আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে একটি আত্মা প্রদান করেছেন। তিনি আমাদের আত্মা ও দেহ, এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। এই বিষয়টি কুরআনে বারবার উল্লেখ হয়েছে। এবং এটাই আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বে (লর্ডশিপ) বিশ্বাসের ভিত্তি। আল্লাহ বলেছেন,

> 'আল্লাহ সর্বকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরাহ যুমার, ৩৯;৬২-৬৩)

• অন্যত্র বলেছেন,

---

[৭] Richards, P.S., and Bergin, A.E., 2005, A Spiritual Strategy for Counseling and Psychotherapy (2nd ed.), Washington, DC: American Psychological Association, pp. 33-34.
[৮] Honer and Hunt, 1987, p.220; Richards and Bergin, 2005, p.34.

'পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:১)

• অন্যত্র বলেছেন,

'বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না?' (সূরাহ মুমিনুন,২৩: ৮৮)

• অন্যত্র বলেছেন,

'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরাহ সাফফাত, ৩৭:৯৬)

এই আয়াতসমূহে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও রাজত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নির্দেশিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই মহাবিশ্বের একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী এবং মনিব, কর্তা ও প্রভূ (রব)। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, রিজিক প্রদান করেন, জীবন-মৃত্যু ঘটান, এবং কবর থেকে আমাদের পুনুরুত্থিত করবেন। কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তিনি প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এখানে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর এই নিয়ন্ত্রণ জেনেটিক্স (জিনতত্ত্ববিদ্যা), অভিজ্ঞতা, চিন্তা, আবেগ ও আচার-আচরণের উপরেও বিস্তৃত।

মানুষ হিসেবে আমাদের কোনো কিছু বেছে নেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। আমরাও কিছু কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু এটা আল্লাহর রাজত্বের বিপরীতে মোটেও তুলনীয় নয়। বস্তুত বিভিন্ন ঘটনার উপর মানবিক প্রভাবশক্তি খুবই সীমিত। মূলত মানুষ কেবল তার সামনে থাকা 'অপশন' থেকেই কোনো একটিকে বেছে নিতে পারে। তবে মানুষের এই ইচ্ছাশক্তি বা বাছাই থেকেও চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন তরুণ সিদ্ধান্ত নিল যে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। এরপর সে একটি বিশ্ববিদ্যালযয়ে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করল এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেক উৎসাহিত বোধ করল। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ তাআলা ছেলেটির তাকদীরে ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন নির্ধারণ করে থাকেন, কেবলমাত্র তখনই সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু যদি সেটা তাকদীরে লিপিবদ্ধ না থাকে তাহলে সে কখনো সুযোগ পাবে না। এ কারণে মুসলিমরা ভবিষ্যতের ঘটনার ব্যাপারে বলেন, 'ইনশাআল্লাহ' (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন)! সূরাহ কাহাফে আল্লাহ বলেছেন,

'আপনি কোনো কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করব। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে ...'(সূরাহ কাহাফ, ১৮:২৩-২৪)

সুতরাং, তাকদির ও আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানার মাধ্যমে আপনি যেভাবে মানবসত্তার স্বরূপ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, ঠিক তেমনিভাবে দৈনন্দিন নানাবিধ কার্যক্রমেও অনেক নির্ভার থাকবেন।

একমাত্র আল্লাহই আমাদের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে সক্ষম, এই বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন কার্যক্রমের অনেক মর্মপীড়া থেকে মুক্তি পাই। সেই 'কাঙ্খিত' চাকরি

বা জীবনসঙ্গী অথবা দৈনন্দিন জীবনের ঝঞ্ঝা ও সংগ্রাম নিয়ে আমাদের পেরেশান থাকতে হয় না, বরং আমরা বলি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', (আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি বা সাহায্য নেই)। সূরাহ যুমারে আল্লাহ বলেছেন,

> 'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৩৮)

যারা আল্লাহর শক্তি, সক্ষমতা ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ অস্বীকার করে, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নেয়। মনোবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ববিদ ঠিক এই কাজটিই করেছেন! আল্লাহ বলেছেন,

> 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, **যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?** আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?
>
> তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।' (সূরাহ জাসিয়াহ, ৪৫:২৩-২৪)

তারা নিজেদের কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি এবং খেয়াল-খুশীকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রবৃত্তি ভুল-শুদ্ধ নির্ধারণের চূড়ান্ত মানদণ্ড অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডকেই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, আর সেটি হলো আল্লাহর নাজিলকৃত ওহী। তারা যথার্থভাবে আল্লাহর কদর করতে পারেনি, ফলে তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন। তারা যত বেশি সত্যকে উপেক্ষা ও অপছন্দ করে, তত বেশি পথভ্রষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো তারা কেবল নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে থাকে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৬৭)

১.৩ মনোবিজ্ঞানের সেক্যুলার পদ্ধতির প্রধান দুর্বলতাসমূহ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা নিজেদের বাতলানো তত্ত্বসমূহের সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করতে শুরু করেছেন। অনেকেই একমত হয়ে বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ মানব প্রকৃতির একটি দুর্বল চিত্র উপস্থাপন করে। এবং জীবন ও মহাবিশ্বের

জটিলতা ও রহস্যের পর্যাপ্ত বর্ণনা প্রদান করে না।"[৯] গ্রিফিন বলেছেন, 'বস্তুবাদ ও ইন্দ্রিয়বাদ (sensationalism) যখন নাস্তিকতার সাথে সমন্বিত হয় তখন একটি নিয়ন্ত্রণবাদী (জড়), আপেক্ষিক ও শূন্যবাদী (nihilistic) দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে যেখানে জীবনের কোনো চূড়ান্ত অর্থ নেই।'[১০]

• বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয় তা 'বিহেভিয়ারাল সায়েন্টিস্ট'রাও* অপর্যাপ্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই মতবাদে মানবসত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যাখ্যান করা হয় বা খাটো করে দেখানো হয়। যেমন- মানব মন, সচেতনতা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর উপর ঈমান। বিশেষত 'হেল্পিং প্রফেশনে'* কর্মরত ব্যক্তিদের ওপর এই থিওরি প্রয়োগ করা হলে এর অপর্যাপ্ততা ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠে কেননা তাদের লক্ষ্য হলো অপরের নিরাময় ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।[১১]

*** বিহেভিয়ারাল সায়েন্স** : বিভিন্ন মানবিয় কার্যাবলী যেসব অনুষদে আলোচনা করা হয়, যেমন- সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান, সাইকোলজি, সাইকিয়াট্রি ইত্যাদি।

*** হেল্পিং প্রফেশন** : যেসব পেশায় একজন ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক কিংবা আধ্যাত্মিক সুস্থতার বিকাশ ও যত্ন নেয়া হয়; যেমন মেডিসিন, নার্সিং, সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং, সামাজিক কাজ, শিক্ষা ইত্যাদি। (অনুবাদক)

ড. জামাল জারাবযো আত্মার পরিশুদ্ধি আলোচনা প্রসঙ্গে **মনোবিজ্ঞানের সেক্যুলার পদ্ধতির কিছু প্রধান দুর্বলতা** তুলে ধরেছেন: [১২]

• ১। মানুষকে তার স্রষ্টা ও রবের উপর অনির্ভরশীল হিসেবে দেখা হয় (পূর্বে আলোচিত)।

• ২। কেবল মানবিক বোধশক্তির ভিত্তিতে এর তত্ত্বসমূহ প্রতিষ্ঠিত অথচ আল্লাহর নাজিলকৃত ওহীকে প্রত্যাখ্যান এবং উপেক্ষা করা হয়েছে। (সপ্তম অধ্যায় দ্র.)।

• ৩। সেক্যুলার জ্ঞান ও গবেষণা কেবলমাত্র দৃশ্যমান মানবিক অনুষঙ্গের উপর আলোকপাত করেছে অথচ আধ্যাত্মিক এবং অদৃশ্য বিষয়গুলো অপেক্ষা করেছে।

---

[৯] Richards and Bergin, 2005, p.37.

[১০] Griffin, D.R., 2000, Religion and Scientific Naturalism: Overcoming the Conflicts, Albany: State University of New York Press, p.14.

[১১] Richards and Bergin, 2005, p.45.

[১২] Zarabozo, J, 2002, Purification of the Soul: Process, Concept, and Means, Denver, CO: Al-Basheer Company for Publications and Translations, p.49.

• ৪। সাধারণত ধরে নেয়া হয়, মানবিক আচার-আচরণসমূহ কেবলমাত্র প্রবৃত্তির তাড়না, অভিব্যক্তি, প্রশিক্ষণ(অভিজ্ঞতা) ও সামাজিক প্রভাবের(পরিবেশ) মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

এরপর জারাবযো সেক্যুলার ও অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বসমূহের বিপদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> 'মানবরচিত তত্ত্ব বা বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য খুবই বিপদজনক। এসব তত্ত্ব কিংবা ধর্মগ্রন্থগুলো একজন ব্যক্তিকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের সরল পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। এই ক্ষতি আরো ব্যাপকতা লাভ করে যখন মিথ্যাচারিতা ও সুচতুর যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সেগুলো সমর্থন করা হয় কিংবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সেই ধর্মগ্রন্থগুলো প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে বাকি লোকেরা তাদেরকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে এবং সঠিক ও উপকারী মনে করে বিভ্রান্ত হয়। পরিশেষে লোকেরা এসব বিভ্রান্তির প্রতি অন্ধ হয়ে যায়।'[১৩]

১.৪ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মনোবিজ্ঞানের বিকল্প সংজ্ঞায়নে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে যা যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার মধ্যে রয়েছে: আত্মার আলোচনা; সম্ভাব্য আচরণ, আবেগ ও মানসিক কার্যপ্রণালী, এগুলোর ফলাফল; এবং উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রভাবকসমূহ (দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অনুষঙ্গ নির্বিশেষে)।

'আত্মা জীবনের মৌলিক উপাদান'—ইসলামি বর্ণনাগুলো উৎসারিত এই চিন্তাধারা থেকে। আত্মাই মানুষের আচরণ, আবেগ এবং মানসিক চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করে। মানুষের মনন সম্পূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুগত আলোচনার উপর নির্ভরশীল নয়; এর সারনির্যাস আধ্যাত্মিক এবং মেটাফিজিকাল (পরবাস্তব, গায়েবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি)। এবং এই প্রত্যেক মানবাত্মায় ফিতরাত ও তাওহিদের সাক্ষ্য খোদাই করে দেয়া—মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে। ফিতরাত হলো আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের সহজাত ঝোঁক ও বৈশিষ্ট্যসমূহ; এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসছে।

মানবাত্মা প্রকৃতিগতভাবে আধ্যাত্মিক (স্পিরিচুয়াল)। ফলে মূল উৎস অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সাথে আত্মার একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ বজায় রাখতে হয়, ঠিক যেভাবে দেহ বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও পানীয়ের দরকার পড়ে। এই প্রধান 'পুষ্টি উপাদান' ব্যতীত মানবাত্মা আক্রান্ত হয় উদ্বিগ্নতায় (এংজাইটি), ডিপ্রেশনে এবং হতাশায় । যারা বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আজকাল আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের অনেকেরই মূলত রোগটা মনের নয়, বরং আত্মার। তার আত্মা রুহানী খোরাকের জন্য আকুতি জানাচ্ছে। আর প্রকৃত রুহানী খোরাক রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্যের মাঝে। কিন্তু আসল খাবার না দিয়ে

---

[১৩] Ibid, p 44-45.

তাকে দেয়া হচ্ছে সাইকোথেরাপি এবং মেডিকেশনের হরেক রকম 'জাঙ্ক ফুড'। এ কারণেই আত্মার আর্তচিৎকার অসুখ হিসেবে বেড়ে চলে।

ইসলামি মনোবিজ্ঞানের ধারণা মতে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় জগতের ঘটনা দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। সমসাময়িক সাইকোলজিক্যাল তত্ত্বগুলো সাধারণত কেবল দৃশ্যমান জগতকেই আলোচনায় আনে অর্থাৎ মনের উপর পিতামাতা, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, সাথী-বন্ধু, শিক্ষক, সমাজ, মিডিয়া ইত্যাদির প্রভাব নিয়েই আলোচনা করে। অপরদিকে ইসলামি মনোবিজ্ঞানে মানব প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দেবার জন্য অদৃশ্য জগতের বিষয়গুলোও আলোচনায় আনা হয়। সেগুলো হলো; আল্লাহ, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা, ফেরেশতা ও জিনের আলোচনা। এখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ভালো মন্দ বাছাইয়ের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয় না বরং তা উপযুক্ত প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

১.৫ জ্ঞানের উৎস

মনোবিজ্ঞান বিষয়ে সমকালীন জ্ঞানচর্চার অন্যতম দুর্বলতা হলো এখানে মানবসত্তা সম্পর্কে জানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়; আর সেটা হলো আল্লাহর নাজিলকৃত বার্তা বা ওহী। এর দৃষ্টান্ত হলো ম্যানুয়াল ছাড়াই একটি দামি 'ব্র্যান্ড-নিউ' গাড়ি খরিদ করার মত—কীভাবে এর যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করে, তা জানার জন্য সে ম্যানুয়ালটাই পড়ার প্রয়োজন মনে করছে না! প্রফেসর হক (১৯৯৮) 'ইউএস ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস' (১৯৮৪,পৃ ৬) এর একটি বক্তব্যের মাধ্যমে **বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে সম্পর্কের 'আধুনিক' ধারণাটা** ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে,

> 'বিজ্ঞান ও ধর্ম মানবিক চিন্তাধারার পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র দুইটি জগৎ। একই প্রসঙ্গে দুটোকেই একত্রে উপস্থাপনের চেষ্টা করলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ধর্মীয় বিশ্বাস উভয় ক্ষেত্রেই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। 'চূড়ান্ত সত্য' (আলটিমেট ট্রুথ) আবিষ্কারের জন্য জ্ঞানকে ধর্মনিরপেক্ষীকরণ করা হয়েছে এবং 'অভিজ্ঞতাবাদ' (empiricism) ও পরীক্ষণের (এক্সপেরিমেন্টেশন) উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হলোঃ বিজ্ঞান এমন সব ঘটনা (fact) উপর প্রতিষ্ঠিত যা যাচাই করা সম্ভব। কিন্তু ধর্ম আপেক্ষিক (সাবজেক্টিভ) বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে (অবজেক্টিভ পদ্ধতিতে) প্রতিপাদন করা যায় না।'[১৪]

১.৬ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এর তত্ত্বগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গবেষকরা প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানবিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন, এরপর নানাবিধ তত্ত্ব প্রদান করেন। বিন্যাস ও পূর্বানুমান করতে পারে এমন সুবিন্যস্ত বিভিন্ন মূলনীতির সাহায্যে এসব

---

[১৪] Haque, A., 1998, Psychology and religion: Their relationship and integration from an Islamic Perspective, The American Journal of Islamic Social Sciences, 15, p.99.

থিওরিগুলোতে আচরণ (বিহেভিয়ার) ও মানসিক কার্যপদ্ধতিগুলোকে (মেন্টাল প্রসেস) ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়।[১৫] 'থিওরি' থেকে তারা যেসব অনুমান বা হাইপোথিসিস প্রদান করেন সেগুলোকে পরীক্ষা (test) করা যায়। সবশেষে, গবেষকরা সেসব হাইপোথিসিস পরীক্ষা করে সেগুলোর শুদ্ধতা যাচাই করেন, সংশোধন করেন কিংবা বাতিল হিসেবে প্রত্যাখান করেন।[১৬]

আগেই আলোচনা করেছি, 'সায়েন্টিফিক মেথড'এর অন্যতম সীমাবদ্ধতা হলো ভৌত (physical) জগতের প্রতি সীমিত ফোকাস ও মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলোকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা। বাস্তবে বিজ্ঞানীরা 'আস্ত মানুষ'-কে অধ্যয়নের বদলে মানবসত্তার কেবল কিছু অংশ স্টাডি করেন। এর অনেক উদাহরণ আছে, তবে 'বিহেভিয়ারিজম' চিন্তাধারাটা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'র এই সীমাবদ্ধতাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। বাদরি ব্যাখা করে বলেছেন,

> "আচরণবাদী চিন্তাধারা (behaviorist school) একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেছে। এখানে কিছু দিয়ে উদ্দীপিত করে (stimuli) সেটার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার (observable response) মাধ্যমে প্রাণীর শিক্ষণ (learning) প্রক্রিয়াকে স্টাডি করা যায়। রীতিমত মনোবিজ্ঞানের বুনিয়াদে পরিণত হয়েছে এই পদ্ধতিটি। অনুভূতি, মনের উপাদানসমূহ ও চিন্তাধারা ইত্যাদি সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য নয় বলে মনে করা হতো। এগুলো নিয়ে গবেষণার জন্য অনুসৃত পদ্ধতিগুলোকে (যেমন ইন্ট্রোস্পেকশন, অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাপর্যবেক্ষণ ও জানানো ইত্যাদি) অস্পষ্ট এবং অনির্ভরযোগ্য বলে সমালোচনা করা হতো। পদ্ধতিগুলোকে এক্সপেরিমেন্টের সময় নিয়ন্ত্রণও করা যায় না সেভাবে। ফলে যেসব আচরণবিদ মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মতো একটি 'এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্স' হিসেবে দেখাতে চান; তারা তাদের কাজকে ল্যাবরেটরীতে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনার মধ্যেই রাখতে চেয়েছেন। যেন সেগুলো পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন ঘটনার পরিমাপ ও 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রতিক্রিয়া' এখন এটাই তাদের সব এক্সপেরিমেন্ট ও সকল বৈজ্ঞানিক চেষ্টাপ্রচেষ্টার প্রধান ফোকাসে পরিণত হয়েছে।[১৭]

বাদরি এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা আরও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি চিহ্নিত করেছেন যে আচরণবাদ মানুষের ফিতরাতগত (সহজাত) ভালো-মন্দের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে এবং মানুষের বিশ্বাসকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটিই মানে না। আচরণবাদীরা দাবি করেন; মানবিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস পুরোপুরি পরিবেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ বা সার্বজনীন সত্যের কোনো স্থান নেই। এই তত্ত্বে ব্যক্তির

---

[১৫] Myers, 2007, p.24.

[১৬] Ibid, p 25-26.

[১৭] Badri, M.B., 2000, Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study, Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, p.2.

পছন্দের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অফ চয়েস) ও সচেতন নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ধারণা বর্জন করা হয়।[১৮]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতার কারণে ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী তথ্য ও সিদ্ধান্ত এসেছে। এগুলোর মাধ্যমে 'মানব প্রকৃতি' বুঝতে গিয়ে বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। জাফরি বলেছেন,

> "সামাজিক ও মানবিক ঘটনাসমূহ অধ্যয়নে সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতিগুলো (এম্পিরিক্যাল মেথডলজি) আরোপ করার ফলে যতটা না কার্যকর ও যুক্তিসংগত প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মানবিক বুদ্ধিমত্তা, বিবেকবোধ, আচরণ ও আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক ইত্যাদি অধ্যয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। মানুষের অভ্যাস, আধ্যাত্মিকতা, আবেগ ও মানসিকতাকে বস্তুবাদী প্রচেষ্টার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিমাপযোগ্য পদ্ধতিতে বেঁধে ফেলে খুব বেশি সুবিধা করা যায়নি। বৈজ্ঞানিক উদাহরণ ও নমুনাগুলো পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের মত বিষয় ব্যাখার জন্য পর্যাপ্ত হলেও সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নে এগুলো খুবই সীমাবদ্ধ।"[১৯]

মনোবিজ্ঞানের **আরেকটি সীমাবদ্ধতা** হলো,

এর অধিকাংশ গবেষণা এবং তত্ত্ব গড়ে উঠেছে পুরো মানবজাতির মধ্য থেকে কেবল অল্প কিছু মানুষের নমুনার (স্যাম্পল) ভিত্তিতে; যারা মূলত আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান। অবশ্য বর্তমানে এই প্রবণতায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমা মানুষদের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা ও আবেগ অনুভূতি থেকে প্রতিফলিত হয় যে, তারা আল্লাহ ও ধর্মের প্রতি কম বিশ্বাসপ্রবণ। ফলে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কাদের নমুনাকে স্বাভাবিক (নরমাল) ধরা হবে? মনোবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের *'সমষ্টিগত আচার-আচরণ'* 'স্বাভাবিক'(নরমাল) বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন; কিন্তু এই অনুমান কতটুকু সঠিক?[২০]

কার্যত যে বিষয়টিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরা হচ্ছে, সেটি আরেকটি নতুন বিষয়ের মাধ্যমে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, যার নাম 'ক্রস-কালচারাল' বা 'কালচারাল সাইকোলজি'। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই বাস্তবতা মানতে শুরু করেছেন যে, এক সমাজে যা স্বাভাবিক (নরমাল) তা অন্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এই বিষয়টি আমলে আনা খুব জরুরী, বিশেষত যখন পশ্চিমা সমাজের গবেষণালব্ধ ফল থেকে ইসলামি সমাজ সম্পর্কে পূর্বানুমানের চেষ্টা করা হয়। গবেষণালব্ধ সকল সিদ্ধান্ত খারিজ করা জরুরী নয়, তবে অবশ্যই সেগুলোকে সমালোচনা ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

---

[১৮] Ibid, p 3-4.

[১৯] Jafari, M.F., 1993, Counseling values and objectives: A comparison of Western and Islamic perspectives, The American Journal of Islamic Social Sciences, 10, p.238.

[২০] Zarabozo, 2002, pp. 37-38.

১.৭ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য

ইসলামি মানদণ্ডে জ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক ও প্রাথমিক উৎস হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহী। আল্লাহ আমাদের 'আমার আমি'কে আমাদের নিজেদের চেয়েও ভালোভাবে জানেন। কাজেই যদি ওহীর জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা হয়, বিশেষত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে; তাহলে সেটা সুস্পষ্ট ডাহা মূর্খতা। আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন,

> 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:১৪)

অন্যত্র বলেছেন,

> 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।' (সূরাহ ক্বাফ, ৫০:১৬)

অন্যত্র বলেছেন,

> 'তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:১৩)

ওহীই সেই ভিত্তি, যার উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সকল শাখাপ্রশাখা। যা নিখুঁত এবং পরিপূর্ণ। একে ভিত্তি করে আর সব বিষয়কে বোঝার দ্বারা প্রকাশ পায় কুরআনের উপর মুসলিমদের দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস। যে, আল্লাহর নাজিলকৃত চূড়ান্ত বার্তা এটাই। এ বিষয়ে সন্দেহ ব্যতীত দৃঢ়বিশ্বাস ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। কুরআনের শুরুতেই এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

> 'এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২)

হাদিসকেও ওহীর অংশ গণ্য করা হয় এবং এটি কুরআনের পর জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। হাদিস হলো রাসূলুল্লাহ (.সা)এর সে সকল কথা, কর্ম এবং অনুমোদন যা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। কেবলমাত্র ওহীর মাধ্যমে আমরা মানবাত্মার প্রকৃত ধরণ ও অদৃশ্য জগতকে বুঝতে পারি, আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি, এবং পদ্ধতিগুলোকে পূর্ণতায় বিকশিত করতে পারি। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। ফলে গায়েবের বিষয়াদি অনুধাবনের জন্য আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। এক্ষেত্রে কোনো ধারণা বা অনুমানের নির্ভরশীল হওয়ার অবকাশ নেই, বিশেষত মুসলিমদের জন্য কথাটি অধিকতর সত্য।

এ সম্পর্কে কামালি লিখেছেন,

> "শরিয়তের দলিলসমূহ পরবর্তীতে (দুইভাগে) বিভক্ত হয়েছে; ওহীর দলিল এবং যৌক্তিক দলিল। ওহীর কর্তৃত্ব সত্যায়নের প্রয়োজন নেই, এগুলো মানবিক যুক্তির

মুখাপেক্ষী নয়, যদিও অধিকাংশ ওহী যৌক্তিকভাবে সঠিক প্রমাণও করা যায়। তবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার[২১] কর্তৃত্ব ও বাধ্যবাধকতা যেকোনো ধরনের যৌক্তিক প্রমাণের অমুখাপেক্ষী। অপরদিকে, যৌক্তিক প্রমাণসমূহ মানবিক বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল এবং সেগুলোর ন্যায্যতা মানবিক বোধশক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। এগুলো কেবলমাত্র যৌক্তিকতার নিরিখেই গ্রহণ করা যায়, (তবে) যুক্তি ইসলামের কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ দলীল নয়, ফলে যৌক্তিক প্রমাণসমূহকে ওহীর দলীল থেকে পৃথক করে এককভাবে গ্রহণ করা যায় না। শরয়ি দলীলসমূহ (আদিল্লাহ শার'ইয়াহ[২২]) মোটের উপর যুক্তির সাথে সমন্বিত করাই রয়েছে।"[২৩]

এরপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইসলামি আইনগুলো তাদের উপর প্রযোজ্য যাদের বোধশক্তি রয়েছে। শরিয়াহ মানুষের উপর এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না যা বিবেক-বুদ্ধি বা যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক।[২৪]

ওহীকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা বিজ্ঞান ও যুক্তিকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে বরং পূর্বের আলোচনা হতে ইসলামি আইনে যুক্তির অবস্থান সুস্পষ্ট। স্বয়ং কুরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে মানুষকে সৃষ্টি জগত নিয়ে ভাবতে, চিন্তা করতে ও জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে **ওহী হবে সেই জ্ঞানের মানদণ্ড** যার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য বিকাশমান বিজ্ঞানকে (developing science) বিচার করব। এই দুটি প্রাথমিক উৎসের পর অন্যান্য গৌণ উৎসের মধ্যে যুক্তির স্থান রয়েছে। যখন আমরা মানবিক বোধশক্তিকে মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করি তখন বিভ্রান্তি অত্যাসন্ন। এটি সেসব দার্শনিকদের রচনা হতে সুস্পষ্ট যারা (ওহীর) প্রমাণ হতে বিচ্যুত হয়ে কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছেন।

ধর্মীয় ও সেক্যুলার—এ জাতীয় কোনো পৃথকীকরণ ইসলামে নেই, যেমনটা অন্যান্য সিস্টেমে রয়েছে। জ্ঞানকে মনে করতে হবে আমানত, এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে একে যাচাই করতে হবে। **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহও কেবলমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহ ও রহমত।** গবেষণা, আবিষ্কার ও বিকাশ ঘটানোর জন্য দরকারী চিন্তাশীল মনন, কাঁচামাল ও উপকরণ ইত্যাদি নিয়ামত তিনিই আমাদেরকে দান করেছেন। কোনো কিছু আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা ও অপার মহিমা। জ্ঞানের মাধ্যমে আরও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এই বিশ্বজগৎ সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয়। এখানে বিশৃঙ্খলা বা কাকতালীয় ঘটনা বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান সঠিক হলে আল্লাহর নাজিলকৃত জ্ঞানের সাথে মিলে যাবে। আধুনিক সাইকোলজিক্যাল গবেষণায় অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে ঘটনা এমনটাই ঘটেছে।

---

[২১] ইজমা: (ঐকমত) ফিকহের একটি পরিভাষা, ইসলামী বিধি নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি।
[২২] শরীয়তের দলীলসমূহ।
[২৩] Kamali, M.H., 1991, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge, Cambridge: Islamic Texts Society, pp.10-11.
[২৪] প্রাগুক্ত।

যদি কোথাও সংঘর্ষ দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বিশ্লেষণের মধ্যেই ত্রুটি রয়েছে।

ড. জামাল জারাবযো উল্লেখ করেছেন,

> কুরআন ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে, এর একটি মহাবিশ্বের বাহ্যিক ও ভৌত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট। অস্তিত্বশীল জগতের এই জ্ঞান অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টিগজতের বাস্তবতা সম্পর্কে সত্য ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির দিকে পরিচালিত করবে, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করাবে, তাঁর বড়ত্ব ও ক্ষমতা বুঝতে সাহায্য করবে। এর বিপরীতে আল্লাহকে মানতে অনীহা বা অক্ষমতা দেখা দিলে বুঝতে হবে, সেই জ্ঞান অর্জনকারীদের মনোজগতে ত্রুটি রয়েছে।[৯]

[৯] Zarabozo, 2002, pp. 33.

||অধ্যায় দুই||
মানব প্রকৃতির স্বরূপ

আগেই উল্লেখ করেছি, মনোবিজ্ঞানের সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের মৌলিক প্রকৃতিকে দেখা হয় কেবল একটা দেহ, কিছু জ্ঞান, কিছু আবেগ আর কিছু আচরণের সমষ্টি হিসেবে। ওদিকে, ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে মানুষের মৌলিক প্রকৃতিটা আধ্যাত্মিক ও মেটাফিজিক্যাল (পরাবাস্তব)। বাস্তবে মনোবিজ্ঞানে মানুষের 'আত্মা' নিয়ে আলোচনা করার কথা। 'psyche' শব্দটি গ্রীক ভাষায় আত্মা (soul) শব্দের প্রতিরূপ। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষের দুটি সত্তা রয়েছে— দেহ ও আত্মা। দেহ কেবলমাত্র আত্মার ধারক।[১] আমাদের আত্মিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিকভাবে যে স্তরে আমরা অবস্থান করি, তার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও আচার-আচরণ প্রভাবিত হয়।

২.১ আদম ও হাওয়ার ঘটনা থেকে মানব প্রকৃতি অনুধাবন

মানব প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য মানুষসৃষ্টির সূচনালগ্নে ফিরে যাওয়া জরুরী। কুরআনে সেই ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ আছে। সুপরিচিত এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে—যে শিক্ষা সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও হিসাব নিকাশ এর উর্ধ্বে। আল্লাহ বলেছেন,

- আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।

- আর আল্লাহ তাআলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।

- তারা বলল, আপনি পবিত্র! আমরা কোনোকিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদিগকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।

---

[১] Haque, A., 2004, Religion and mental health: The case of American Muslims, Journal of Religion and Health, 43(1), p.48.

• তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও জমিনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর!

• এবং যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

• এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।

• অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।

• অতঃপর হযরত আদম (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

• আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।

• আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে।'

(সূরাহ বাকারাহ, ২:৩০-৩৯)

লক্ষ্য করুন, এখানে মানবসত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে,[২]

১। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয় : মানুষ তার স্রষ্টা থেকে ভিন্ন। অন্যান্য সৃষ্টি থেকেও মানুষ পৃথক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুনিয়াতে মানবজাতিকে রাখার পেছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সেটা হলো আল্লাহর ইবাদাত করা।

২। মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি : দুনিয়ার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের ভূমিকাই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রমাণ হলো, আদমের সামনে নত হবার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর

---

[২] Zarabozo, 2002, pp. 50-53.

আদেশ। দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। এবং দুনিয়ার সকল উপায়-উপকরণকে করে দেওয়া হয়েছে মানুষের বশবর্তী।

৩। মানুষের যোগ্যতা: মানুষকে তার অনন্য মর্যাদার সঙ্গে মানানসই যোগ্যতাও প্রদান করা হয়েছে। যেমন: বোধশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্প, নিজেকে আল্লাহমুখী করা, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা ও ভুলক্রুটি সংঘটিত হলে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া। এসব সক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে।

৪। দুর্বলতা: মানুষের অনেক দুর্বলতাও রয়েছে, যেমন- প্রবৃত্তির নিচু কামনা-বাসনা, অলসতা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি। যেগুলো যেকোনোসময় পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে তাকে। কেননা, মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় শয়তান ও তার সঙ্গীসাথীরা সদাতৎপর ও সর্বদা উপস্থিতই রয়েছে। মানবসত্তা ও এই অশুভ শক্তির মধ্যে সংগ্রাম সব সময়ই চলমান।

৫। উন্নতি-অবনতি: মানুষ নিজেকে মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে। অথবা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত না করে এবং শয়তানকে বন্ধুত্বে বরণ করে নিয়ে নিজের মর্যাদার স্খলনও ঘটাতে পারে।

৬। মুক্তি: মানুষের মুক্তি ও প্রশান্তি রয়েছে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নির্দেশনার অনুসরণ ও বিশ্বাসের মাঝে। এই বিশ্বাস ও আনুগত্যই ঠিক করে দেবে তাদের দুনিয়ার জীবনে অর্জনের মূল্য এবং আখিরাতের মর্যাদাগত অবস্থান।

২.২ মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

মানুষকে তার সৃষ্টিগত মর্যাদার কারণে আল্লাহ যে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেছেন সেগুলো আলোচিত হয়েছে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে। আত্মশুদ্ধির সহজাত ক্ষমতা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন, যেন আমরা **এই জীবনের উদ্দেশ্য** বাস্তবায়ন করতে পারি। তিনি আমাদেরকে করুণা করেছেন অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে। এবং জগতের সবকিছুকে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়ে। যাতে করে আমাদের জীবন সহজ হয় ও **'আত্ম-উপলব্ধি'** জাগ্রত হয়। এসব ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো—বান্দা যেন আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। তিনি বলেছেন,

> 'তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তাতে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিজিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:১৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে

নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরাহ জাসিয়া,৪৫:১২-১৩)

- অন্যত্র বলেছেন

  'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (সূরাহ ইসরা, ১৭:৭০)

- অন্যত্র বলেছেন

  'তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিজিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।' (সূরাহ ইবরাহিম, ১৪:৩২-৩৪)

এসকল জীবনোপকরণ না থাকলে আমাদের দায়-দায়িত্বসমূহ পালন করা খুবই দুরূহ হতো; কঠিন হয়ে যেত নিজের, সমাজের ও উম্মাহর অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। উদাহরণস্বরুপ যেমন ধরুন, সূর্য থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তাপ, উষ্ণতা ও আলো লাভ করি; চন্দ্রসূর্যের মাধ্যমে আমরা রাখতে পারি সময়ের হিসাব, জমিন থেকে উৎপন্ন করতে পারি বৃক্ষলতা, আর সমুদ্রে করতে পারি সফর, ইত্যাদি। এগুলো আমাদের নানাভাবে উপকৃত করে। দুনিয়াতে টিকে থাকার জন্য এসব উপকরণ নিঃসন্দেহে খাদ্য ও পানীয়ের মতো জরুরী। বিশেষ করে খাদ্য-পানীয়ের মতো নিয়ামতগুলো ছাড়া তো দুনিয়াতে আমাদের অস্তিত্বই ছিল অসম্ভব।

২.৩ ফিতরাত

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই সহজাত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ফিতরাত। এটি প্রত্যেক মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে সে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা স্বীকার করে ও আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। যিনি আমাদেরকে, চারপাশের এই পৃথিবীটাকে এবং পৃথিবীর ভিতরে যা কিছু আছে সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, এমন একজন সুমহান সত্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে অটল সাক্ষ্য দেবার সহজাত প্রবণতা এই ফিতরাত। এটা একটা উপহার, যা খোদাই করা মানুষের আত্মায় আত্মায়। ফলে যারা আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের মাঝেও এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যটা রয়েই যায়। সূরাহ রুমে আল্লাহ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন,

'তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যার উপর তিনি মানব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সূরাহ রুম, ৩০:৩০)

ফিতরাতের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত না করা। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দেয় এবং ক্রমাগত তাঁর নৈকট্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং একমাত্র তাঁর ইবাদাত করে, তারা নিজেদের সহজাত মানবসত্তাটির সাথে সঙ্গতি স্থাপন করে, সহজাত বৈশিষ্ট্যের অনুকূল আচরণ করে। আর যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনেনা, অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করে, তারা নিজেদের সহজাত মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে। ইসলামকে ফিতরাতের ধর্ম বলা হয়, কারণ এই ধর্ম মানবজাতিকে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার বিশ্বাসী করে তোলে এবং মানবসত্তার বিকাশের ক্ষমতাকে সম্পন্ন করে। সমস্ত নবি-রাসূলগণ এসেছিলেন মানুষকে (ফিতরাতের) এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা স্মরণ করিয়ে দিতে এবং শরিয়াহ শিক্ষা দিতে। শরিয়াহ হলো আল্লাহর আনুগত্যে জীবন কাটানোর সবিস্তার দিকনির্দেশনা। নবি-রাসূলগণ নিজেরা এই দিকনির্দেশনা মেনে মানবজাতির সামনে নিজেদেরকে অনুকরণীয় নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই নমুনা উপস্থাপন করাটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর আরেক বড় নিয়ামত।

ফিতরাত হতে বিচ্যুতি : বিভিন্ন বাহ্যিক প্রভাবে মানুষ সহজাত ধর্ম (ফিতরাত) থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। যেমন- পিতামাতার প্রভাব, সমাজের প্রভাব ইত্যাদি।

ফিতরাতের উপর পিতামাতার প্রভাব : রাসূলুল্লাহ (.সা) বলেছেন, 'প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের উপর। এরপর তা মা-বাপ তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু যখন একটি (পূর্ণাংগ) বাচ্চা জন্ম দেয় তখন কি তোমরা তার কানকাটা দেখতে পাও? এরপর আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন- 'আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের অনুসরণ কর, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন' (সূরাহ রূম: ৩০)। (বুখারি, মুসলিম)

পরিবেশের প্রভাব : এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (.সা) হাদিসে জানিয়েছেন যে পরিবেশের প্রভাব একজন ব্যক্তিকে সরল পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করতে পারে, এমনকি পথভ্রষ্ট বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের অনুসারী বানাতে পারে।

শয়তানের প্রভাব : শয়তানও মানুষকে সহজাত বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (.সা)বলেছেন,

'সাবধান, আমার প্রতিপালক আজ আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা

সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তা হলো এই যে, (আল্লাহ বলেন), 'আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দেব তা পরিপূর্ণরূপে হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। অধিকন্তু সে তাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য নির্দেশ দিল, যে বিষয়ে আমি কোনো সনদ পাঠাইনি।' (মুসলিম)

২.৪ ফিতরাতের প্রমাণ

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ বা 'গড' এর উপর ঈমানের দাবী করে (যদিও গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত নাস্তিকতার ধারণাটি দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে)। অধিকাংশ ধর্মেই একটি 'উর্ধ্বতন সত্তা'র ধারণা রয়েছে বা 'গড' সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> 'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?' (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩:৮৭)

আল্লাহ আরও বলেন,

> 'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৩৮)

Gallup International কর্তৃক ৬০টি দেশে পরিচালিত (millennium worldwide survey) (মানে হলো, সহস্রাব্দে একবার হয় এমন যুগান্তকারী দুনিয়াজোড়া ব্যাপক কোনো জরিপকে এই নামে ডাকা হয়) এক জরিপে দেখা গেছে, দুই-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণকারী মতামত দিয়েছেন যে 'গড' তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ৮৭% অংশগ্রহণকারী নিজেদেরকে কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী বলে স্বীকার করেছেন। দারুণ ব্যাপার হলো, পশ্চিম আফ্রিকায়, যেখানে সংখ্যাগুরু মুসলিমরা নিজ ধর্মচর্চায় বেশ এগিয়ে, সেখানে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে ৯৭% বলেছেন তাদের জীবনে আল্লাহর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষনীয় বিষয় পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম এবং তারা ইসলাম অনুশীলন করেন, পশ্চিম আফ্রিকার সেখানকার ৯৯% ব্যক্তিই স্বীকার করেছেন জানিয়েছেন যে, তারা কোনো না কোনো ধর্ম অনুসরণ করেন। এই পরিসংখ্যান হতে আরও দেখা গেছে নারীরা পুরুষদের

তুলনায় অধিক ধর্মানুরাগী (৬৯% থেকে ৫৭ %)। যুবক (৬৩ % থেকে ৫৯ %) এবং মধ্য বয়স্কদের(৫৬%) তুলনায় বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অধিক ধর্মানুরাগী।[৩]

Gallup Poll (২০০৭-২০০৮) কর্তৃক পরিচালিত আরেকটি স্টাডিতে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল পৃথিবীর কোনো দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ধর্মপরায়ণ কিংবা সর্বনিম্ন ধর্মপরায়ণ। ১১টি শীর্ষ ধর্মপরায়ণ দেশের মধ্যে ৮টি দেশ ছিল মুসলিম সংখ্যাপ্রধান (মিশর, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিয়েরালিওন, সেনেগাল, জিবুতি, মরক্কো এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত)। অপরদিকে সবচেয়ে কম ধর্মপরায়ণ দেশগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটি মুসলিমপ্রধান দেশ (আজারবাইজান) স্থান পেয়েছে। (উল্লেখ্য, আজারবাইজান শিয়া সংখ্যাগুরু দেশ)।[৪]

Pew forum কর্তৃক পরিচালিত 'Religion and public life' শীর্ষক আরেকটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল ৩৬,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানের উপর। এটি ছিল একটি জাতীয় জরিপ এবং আমেরিকানদের ধর্মবিশ্বাসের উপর এ যাবত অন্যতম বৃহৎ জরিপ; সেখানে দেখা গেছে ৮৭% ব্যক্তি 'গড' বা 'ইউনিভার্সাল স্পিরিট' এ বিশ্বাস রাখেন, যাদের মধ্যে ৭১% সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন, ১৭% মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন। ৮২% বলেছেন যে ধর্ম তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে ৫৬% অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ২৬% মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। যারা নিজেদেরকে নাস্তিক হিসেবে শনাক্ত করেছেন তাদের ২১% 'গড' বা 'ইউনিভার্সাল স্পিরিট' এ বিশ্বাসের কথা স্বীকার করেছেন এবং যারা নিজেদেরকে এগনোস্টিক (সংশয়বাদী) বলেছেন তাদের মধ্যেও অর্ধেকের বেশি জানিয়েছেন অনুরুপ মতামতই।[৫]

ফিতরাতের বাস্তবতার আরেকটি প্রমাণ হলো, যখন মানুষ বিভিন্ন উত্থানপতনের কারণে দুর্দশাগ্রস্থ হয় এবং কষ্টভোগ করে, তখন সহজাতভাবেই আল্লাহর কাছে চায়। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া, প্রত্যেকে নিজের জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকেও এই বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৪৯)

---

[৩] Gallup International Association, 2000, Religion in the World at the End of the Millennium, retrieved May 6, 2009 from http://www.gallup-international.com/ContentFiles/millennium15.asp.

[৪] Crabtree, S. and Pelham, B., (2007-2008), What Alabamians and Iranians have in common, retrieved May 5, 2010 from www.gallup.com/poll/ 1 142 1 1/alabamians-iranians-common.aspx.

[৫] Pew Forum on Religion and Public Life, 2007, U. S. Religious Landscape Survey, http://religions.pewforum.org/sid=ST2008062300818, accessed 06/05/09.

- অন্যত্র বলেছেন,

  'যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে।' (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৫১)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:১২)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর ইবাদাতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

  তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায় ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও-অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:২২-২৩)

দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত হওয়ার পেছনে বিভিন্ন হিকমত রয়েছে। মানুষের জীবনে নানা পরিস্থিতির কারণে বিশুদ্ধ ফিতরাতের উপর প্রলেপ জমতে থাকে। কষ্ট-মুসিবতের দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায় এই জমে থাকা কুফর ও বিভ্রান্তির আবরণ। কখনও কখনো এসবের অনেক গভীরে তলিয়ে যায় ফিতরাত। অথচ এই মানুষটিও যখন বিপদে পড়ে, তখন এমন এক সত্তার কাছে আকুতি জানায়, যার সম্পর্কে সে মনেপ্রাণে জানে যে এই কঠিন বিপদে একমাত্র তিনিই সাহায্য প্রদান করতে সক্ষম! বিপদে পড়লে সাহায্য কামনা

মানুষের একটি স্বয়ংক্রিয় সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদি আমরা কোনো বাস্তব ভিডিওচিত্রে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পতিত মানুষের অবস্থা দেখি, তাহলে সেখানেও দেখা যায় অধিকাংশ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি (যদিও বা তারা অমুসলিম) 'গড' এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে কোনো না কোনোভাবে!

আত্মায় আত্মায় খোদিত তাওহিদের চুক্তিনামা

সৃষ্টির প্রাক্কালে, প্রত্যেক রূহ আল্লাহকে রব মেনে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং কেবল আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাত করার অঙ্গীকার করেছিল। এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো, যেন বিচার দিবসে মানুষ কোনো অজুহাত পেশ করতে না পারে। যারা দুনিয়াতে ঈমান আনতে অস্বীকার করবে এবং সত্যের পথ থেকে বিমুখ থাকবে, এই স্বীকারোক্তি তাদের বিরুদ্ধে একটি দলীল। আল্লাহ্ বলেন,

> 'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।' (সূরাহ আরাফ, ৭:১৭২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যারা সেই অঙ্গীকার রক্ষা করবে তিনি তাদেরকে জান্নাতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন,

> 'জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে খোদাভীরুদের অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো।' (সূরাহ্ ক্বাফ, ৫০:৩১-৩৩)

আল্লাহ্র সাথে আমাদের ওয়াদা ও ফিতরাতের পারস্পরিক সম্পর্ক হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন, তাঁর পরিচয় লাভ ও ইবাদাত বন্দেগী করা মানব আত্মার সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল মানুষ বিশুদ্ধ ফিতরাত সহকারে জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করা, তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, উত্তম আমল করা এবং মহাবিশ্বে আমাদের অনন্য দায়িত্বসমূহ অনুধাবন করার যোগ্যতা সকলেই সহজাতভাবে লালন করে। যদি কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে সহজাতভাবে ফিতরাতের বিকাশ ঘটানো হয়, তবে মানবাত্মা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে যাবে আল্লাহ্র দিকে এবং পালন করবে তাঁর আদেশ। ফিতরাতের উপর গড়ে ওঠা আল্লাহ্ সম্পর্কে এই জ্ঞান ও সংযোগ আমাদেরকে দেয় সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের প্রকৃত বুঝ, পুরোটা জীবন ধরে।

২.৫ জীবনের উদ্দেশ্য : আল্লাহ্র ইবাদাত করা

একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে **মানবজীবনের উদ্দেশ্য** ও অর্থ। আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছেন,

'তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?' (সূরাহ মুমিনুন,২৩:১১৫)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে হয়রান হয়েছে। অথচ ইসলামে বিষয়টির আলোকপাত একদম সুস্পষ্ট ও সরল। জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা, আর কিচ্ছু না। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু আয়াত উল্লেখ করেছেন:

'বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:১১)

- অন্যত্র বলেছেন,

'আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।' (সূরাহ যারিয়াত, ৫১:৫৬)

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তা ইবাদাত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২১)

- অন্যত্র বলেছেন,

'আর ইবাদাত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।' (সূরাহ নিসা, ৪:৩৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৩৬)

আল্লাহর ইবাদাত করাই আমাদের জীবন ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর বৈধ ইবাদাতসমূহের মধ্যে রয়েছে ঈমান, অন্তরের আমল, কথা, দৈহিক ও আর্থিক আমল ইত্যাদি। ঈমানের মাধ্যমে অন্যান্য সকল ইবাদাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, আর ঈমানকে অবশ্যই তাওহিদের উপর কেন্দ্রীভূত থাকতে হবে। তাওহিদের সহজ অর্থ এককভাবে আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করা। অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা, ভয়, আশা, ভরসা, আত্মসমর্পণ এবং তওবা। এগুলো একমাত্র আল্লাহর দিকে পরিচালিত হতে হবে। কথার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য কামনা করা, তাঁর কাছে দুআ করা, প্রশংসা ঘোষণা করা, কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি। দৈহিক আমলের মধ্যে

রয়েছে সালাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি। অর্থনৈতিক আমলের মধ্যে রয়েছে যাকাত ও অন্যান্য দান সাদাকাহ।[৬]

ইবাদাতের মাধ্যমে আমরা সম্পর্ক ও সংযোগ বজায় রাখি আমাদের স্রষ্টার সাথে, যাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে আমাদের। কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেই ইবাদাত সীমাবদ্ধ বলে ইসলাম আমাদেরকে জানায় না। বরং আন্তরিকভাবে (ইখলাসের সাথে) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শরিয়াহ অনুসারে যা কিছু করা হয় তার সবকিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিত্যাগ করা, অন্যের সাথে সদাচারণ, সৎকাজে অংশগ্রহণ, মন্দকাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি সবকিছু ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত এবং এসবগুলোর সাথেই রয়েছে পুরস্কারের ওয়াদা। আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দিয়েছেন। এই ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে আমরা তাঁর ইবাদাত করতেও পারি অথবা চাইলে বিমুখও থাকতে পারি। আমাদের সিদ্ধান্তই ঠিক করে দেবে আমাদের সম্মান কিংবা অপমান।

আন্তরিক ইবাদাতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তিনটি। যদি এর কোনো একটিও অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ইবাদাত বাতিল হয়ে যাবে। সেগুলো হলো:

১। নিয়তের বিশুদ্ধতা : যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত না থাকে তাহলে নেক আমলগুলো কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে, তাই পাবে...।' (নিয়ত সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।)

২। ইখলাস তথা আন্তরিকতা : আল্লাহর আদেশকৃত বিষয় পালন ও নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ় সংকল্পের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

৩। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নতের অনুসরণ করা : আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যা কিছু নির্দেশ করেছেন সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা।

ভক্তি-শ্রদ্ধার বিষয় অনুসন্ধান করা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদি কোনো মানুষ একমাত্র ইবাদাত পাবার অধিকার আল্লাহকে প্রদান না করে তবে সে অবশ্যই অন্য কিছুর ইবাদাত শুরু করবে; হোক সেটা কোনো মূর্তি অথবা তার মতই আরেকজন মানুষ কিংবা কোনো দার্শনিক চিন্তাধারা, অর্থ-সম্পদ, বা এরকমই কোনো বস্তু বা আইডল। এটি শিরক অর্থাৎ আল্লাহর একক অধিকারে অংশীদার সাব্যস্ত করা। তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক, যা সমস্ত গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। যে এই গুনাহ থেকে তওবা করবে না সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে।

> 'আল্লাহ বলেন, 'তারা কাফির, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বনি-ইসরাইল, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার পালন

---

[৬] al-Ashqar, U.S., 2003, Belief in Allah in the Light of the Qur'an and Sunnah, Riyadh, International Islamic Publishing House, p. 402.

কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৭২)

• অন্যত্র বলেছেন,

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।' (সূরাহ নিসা, ৪:৪৮)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি নবি (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো গুনাহ আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড়?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপন করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'" (বুখারি ও মুসলিম)

শয়তান সদা নিয়োজিত মানুষকে শিরকের পথে পরিচালিত করার কাজে । এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে বলেছেন,

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরাহ যুমার, ৩৯:৬০-৬১)

শয়তান জানে শিরক মানুষকে জাহান্নামী করে দেবে। ফলে তার প্রধান কৌশল মানুষকে প্রলুব্ধ করে শিরকের ফাঁদে আটকে ফেলা এবং অন্য কোনো বস্তু বা বিষয়কে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ ও সুপারিশকারী (ভায়া, মাধ্যম) বানিয়ে নিতে প্ররোচিত করা।

'আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও জমিনের মাঝে ? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:১৮)

দুনিয়ার জীবন আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। পরীক্ষাটা এটা নির্ণয়ের জন্য যে, কারা আল্লাহর দাসত্বে নিজেকে সঁপে দিয়ে আনুগত্য করে; আর কারা শয়তানের অনুসারী হয়ে অবাধ্যতা ও অহংকার প্রদর্শন করে। এ পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেয়া হবে বিচার দিবসে, যেদিন মুমিন ও কাফিরকে পাঠিয়ে দেয়া হবে নিজ নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানায়। আল্লাহ বলেছেন,

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:২)

অন্যত্র আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীর ঘটনাতেও এসেছে যে দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করা হবে। আল্লাহ্ বলেছেন,

'আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।

আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৩৮-৩৯)

প্রত্যেক **মানুষের জীবনের লক্ষ্যই** হবে আল্লাহর চূড়ান্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ নিজের আত্মাকে একমাত্র সত্য ইলাহ আল্লাহর অভিমুখী করা— মানে নিজেকে তার সকল চিন্তা-আবেগ-কর্ম সমেত আল্লাহর সামনে নত করা। ঠিক এই একই বার্তা প্রত্যেক রাসূল নিয়ে এসেছেন এবং পৃথিবীতে ইসলামের মাধ্যমে সেই বার্তাই আজ অব্দি চলমান। কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবিদের ঘটনাগুলো তাদের আন্তরিক আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গকেই আলোকপাত করেছে:

- 'স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দুআ করেছিলঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

- পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।

- হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

- ইবরাহিমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

- স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, অনুগত হও। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।

- এরই ওসিয়ত করেছে ইবরাহিম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।

• তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা বললে, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদাত করব। তিনি একক উপাস্য।

• আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়-যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

• তারা বলে, তোমরা ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহিমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

• তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।

• অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

• আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?আমরা তাঁরই ইবাদাত করি।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১২৭-১৩৮)

এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসূলের বার্তা ছিল আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ; তাঁরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও আমৃত্যু ইসলাম আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়েছেন। ইসলামে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানবাত্মা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করে। এবং এর মাধ্যমেই পূরণ হয় মানুষ হিসেবে তার **জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য**। এই আত্মসমর্পণের পূর্ণতা কেবলমাত্র ইসলামের ভিতর দিয়েই সম্ভব। অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনবিধানের মাধ্যমে এই লক্ষ্যটা অর্জন করা যায় না। বিচার দিবসে অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ আল্লাহ কবুল করবেন না। অন্যান্য সকল ধর্মের মৌলিক ত্রুটিই হলো শিরক, তথা আল্লাহ বাদে অন্য ইলাহের ইবাদাত করা। আর এই শিরকই সেই ধর্মের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সকল মিথ্যা মাবুদের ইবাদাত করা অযৌক্তিক ও মূর্খতাপূর্ণ কাজ। তারা না আমাদের কোনো ক্ষতি করে, আর না কোনো উপকার। কোনোকিছু দেয়া বা না দেয়ার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তিনি বলেছেন,

'তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদাত করে, যে তাদের জন্যে ভুমন্ডল ও নভোমন্ডল থেকে সামান্য রুযী দেওয়ার ও অধিকার রাখে না এবং মুক্তি ও রাখে না।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৭৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমন্ডল সৃজনে তাদের কি কোনো অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।' (সূরাহ আহকাফ, ৪৬:৪-৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৩৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।

  তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরক অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।' (সূরাহ ফাতির, ৩৫:১৩-১৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল'? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।

যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।' (সূরাহ্ ইনফিতার, ৮২:৬-৮)

• অন্যত্র বলেছেন,

'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না। অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন।' (সূরাহ্ নুহ, ৭১:১৩-১৮)

• অন্যত্র বলেছেন,

'আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (সূরাহ্ নাহল, ১৬: ৭২)

অন্যত্র বলেছেন, **'অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি?'**

• 'বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ্ না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে।

• বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়।

• বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

• বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর।

• বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

• বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য

কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' (সূরাহ নামল, ২৭:৫৯-৬৪)

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর বা অন্য কারও ইবাদাত করে তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। তারা নিজেদের উপর জুলুম করে, নিজেদের মর্যাদাহানি করে, অপমান করে নিজেকে। তাদের ব্যক্তিত্ব, অগ্রগতি তথা সামগ্রিক জীবন হয়ে যায় অপূর্ণ ও এলোমেলো। জীবনে প্রকৃত সুখ, শান্তি ও পরিতৃপ্তি যেহেতু তাদের মেলে না, যেমন করেই হোক সেই অধরা পূর্ণতা পেতে গিয়ে কেবল এদিকে সেদিকে ছোটাছুটি করাই সারা হয়।

২.৬ আকিদা, ঈমান ও মনোবিজ্ঞান (পারস্পরিক সম্পর্ক)

'আকিদাহ' শব্দটি দ্বারা বোঝায় একটি সামগ্রিক বিশ্বাস ব্যবস্থাপনা (belief system), যেখানে ঈমানের মৌলিক প্রত্যেকটি বিষয় ও আল্লাহর একত্ববাদকে দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন) এর মাধ্যমে ধারণ করা হয়। মানুষ যা কিছু বিশ্বাস করে, অন্তরে সাক্ষ্য দেয় এবং সত্য বলে মেনে নেয়, আকিদাহ হচ্ছে সেসব বিষয়ের সমষ্টি। যে বিষয়গুলোর উপর মুসলিমদের অবশ্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে, তা ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে এই আয়াতে:

'রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৮৫)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিশ্বাস তাওহিদ; যেমনটি পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।[৭] রাজত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যাবলীতে কোনো শরীকানা ছাড়া আল্লাহ একক; গুণে-নামে-বৈশিষ্ট্যে কোনো জুড়ি ছাড়া আল্লাহ একক; উপাস্য হিসেবে ইবাদতের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন আল্লাহ একক— এই বিশ্বাসের নাম তাওহিদ।

আল্লাহ সবকিছুর অধিপতি ও মালিক, তিনিই সকল প্রয়োজন পূরণকারী ও প্রতিপালক। জীবন-মৃত্যু আল্লাহই ঘটান, তিনি সৃষ্টিজগতের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং যেকোনো ধরনের ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই; হোক সে ইবাদাত দৈহিক (সালাত, সিয়াম, হজ্ব, কুরবানী) কিংবা অন্তরের (ভয়, ভালোবাসা, ভরসা ইত্যাদি)। এই বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে, কোনো সন্দেহ-সংশয় বা পরিবর্তন করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

---

[৭] Philips, A.A.B., 2005, The Fundamentals of Tawheed, Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, p. 17.

> 'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।' (সূরাহ হুজুরাত , ৪৯:১৫)

তাওহিদের ব্যাপারে অন্তরে কোনো সন্দেহ থাকার অর্থ ঈমানের অপরিপূর্ণতা।

মানব মনস্তত্ত্বের জন্য আকিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, আকিদাই আমাদের জীবন পরিচালনার নির্দেশনা দেয়। যে পথে মেলে আত্ম-উপলব্ধি ও আত্মতুষ্টি, সেই সরল পথ আকিদা-ই আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়। আকিদার ভিত্তির উপরেই আর সবকিছু দাঁড়িয়। শাইখ উমর আল আশকার **মানবজাতির জন্য আকিদার গুরুত্ব** আলোচনা করে বলেছেন,

> 'মানুষের জন্য ইসলামি আকিদার প্রয়োজনীয়তা ঠিক যেন পানি ও বাতাসের মতোই। আকিদা ব্যতীত মানুষ পথহারা ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। মানুষ যুগে যুগে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে হয়রান হয়েছে, সেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেছে একমাত্র ইসলামি আকিদা। এই প্রশ্নগুলো বর্তমান যুগেও মানুষকে হয়রান করে যাচ্ছে; যেমন- আমি কোথা থেকে এসেছি? এই বিশ্ব জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো? এর স্রষ্টা কে? তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্য কী? তাঁর নাম কী কী? কেন তিনি আমাদেরকে ও বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করলেন? এই মহাবিশ্বে আমাদের ভূমিকা কী? যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কী?'[৮]

'ঈমান' শব্দটিকে অনেক সময় 'বিশ্বাস' শব্দের মাধ্যমে অনুবাদ করা হয়; (এর সংজ্ঞা হলো) অন্তর, কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে আকিদার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ। ঈমানের গভীর প্রভাব-কে শাইখ আল আশকার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> 'ঈমান, বিশ্বাস হলো সেই জ্ঞান, যা মানুষের বিবেকের গভীরে অনুরণিত হয়। ফলে অন্তরে সেটা নিয়ে আর কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ অনুভূত হয় না বরং ইয়াকিনের প্রশান্তিতে অন্তর ভরে যায় নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়। ঈমান মানুষের অনুভূতি ও বিবেক নিয়ে কাজ করে। যে অনুভূতি গড়ে ওঠে হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত যুক্তি ও বিবেচনাবোধ থেকে। আর এই বোধটাই খাদ্য ও পানীয়ের মতো মৌলিক রসদ যোগায় আত্মাকে। ফলে এই বোধ মূলত জীবনের অন্যতম একটা মৌলিক চাহিদা। আর ঈমানের কাজ হলো মানুষের এই বোধকে একটি প্রভাবশালী চালিকা শক্তিতে পরিণত করা, যাকে কোনোকিছু রুখতে পারে না। এটাই হচ্ছে দ্বীন ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য। দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য জ্ঞানচর্চা, আর দ্বীনের উদ্দেশ্য ঈমানচর্চা। দর্শনের উদ্দেশ্য যে জ্ঞান, তা নিরস-নিষ্প্রাণ। আর দ্বীনের উদ্দেশ্য একটি প্রাণবন্ত ও কর্মোদ্দীপ্ত আত্মা।[৯]

সুতরাং ঈমান আত্মিক শক্তির উৎস। ঈমান একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করে, যার মাধ্যমে সে দৈনন্দিন জরুরি দায়-দায়িত্ব পুরা করতে পারে; এবং

---

[৮] al-Ashqar, 2003a, p. 35.

[৯] Ibid., p. 74.

সমাজ, পরিবার এবং নিজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে পারে। ঈমান না থাকলে, মানুষ জড় রোবটের মত নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে পড়ে। জীবনের নিয়মে জীবন চলতে থাকে কিন্তু সে জীবনে থাকে না কোনো আবেগ বা সংকল্প। ইসলামি মনোবিজ্ঞান অনুসারে, ঈমান ও আকিদা মানব আত্মার অপরিহার্য চালিকাশক্তি; এটি সমগ্র মানব সত্তার জন্যই অপরিহার্য। ঈমানের ভিত্তি হলো আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদে সুদৃঢ় বিশ্বাস, বিচার দিবসে জবাবদিহিতার প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের জীবনের উপর বিশ্বাস। মানব সত্তার অন্যান্য দিকগুলোর সাথেও ঈমান জড়িত, যেমন ব্যক্তির চিন্তা- চেতনা, আবেগ-অনুভূতি এবং অনুপ্রেরণা। এছাড়াও রয়েছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা ও কল্যাণ। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যে ঈমান গড়ে ওঠে, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে। ফলে এই ঈমান আত্মাকেও এনে দেয় সুসামঞ্জস্য ও প্রশান্তি।

২.৭ আল্লাহর উপর ঈমান ও ভালোবাসা

ঈমানের ভিত্তি হলো তাওহিদ, আর তাওহিদের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো—পার্থিব যেকোনো কিছু ও যেকারো চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসা। কার্যত এভাবে আল্লাহকে ভালোবাসাই ইসলামের সারনির্যাস। আল্লাহ বলেন,

> 'আর কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হতো যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৬৫)

কারো অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যখন পরিপূর্ণ হয় তখনই ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আর যখন সে ভালোবাসায় খাদ থাকে তখন আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসও হয়ে যায় ত্রুটিপূর্ণ।[১০] ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ বলেছেন,

> 'অন্তর পরিশুদ্ধ হয় দুইটি জিনিসের মাধ্যমে। প্রথমটি হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে দুনিয়ার সকল ভালোবাসা থেকে প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং অন্য কিছুর প্রতি ভালোবাসা যদি কারো সামনে একসাথে চলে আসে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেবে এবং তার আমলও সেই ক্রমানুযায়ীই হবে।[১১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়।

---

[১০] al-Fozan, S., 1997, Concise Commentary on 'The Book of Tawheed', Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam Publishers and Distributors, p. 249.
[১১] al-Jawzlyyah, I.Q., 2000, The Invocation of God (Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib), Cambridge, UK: Islamic Texts Society, pp. 5-6.

১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর থেকে প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে খালিস আল্লাহ্র জন্যই মুহব্বত করা; ৩। কুফরিতেতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা। (বুখারি ও মুসলিম)।

এই হাদিস অনুসারে, যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্যান্য সকল প্রিয়বস্তু ও প্রিয় মানুষ থেকে প্রিয়তর হবে, সে ঈমানের মিষ্ট স্বাদ অনুভব করবে ও ইবাদাতে আনন্দ অনুভব করবে।

২.৮ আখিরাতের প্রতি ঈমান

আখিরাত গায়েব বা অদৃশ্য জগতের বিষয়। এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। পরকালীন জগতের আনন্দ ও শাস্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে আখিরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেগুলো পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু আমরা যেন কিছুটা হলেও মেলাতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে সদৃশ বিভিন্ন উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান তার বর্ণনা কখনো শুনেনি। আর কোনো মানুষ কোনো দিন তার ধারণা বা কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। এ কথার সমর্থনে তোমরা এ আয়াত পাঠ করতে পার, "কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।" (সূরাহ আস সাজদাহ ৩২:১৭)' (বুখারি ও মুসলিম)

সমগ্র কুরআনে বারবার জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনার উদ্দেশ্য অনিবার্য গন্তব্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া। সেই দুই গন্তব্যের একটিতে অবশ্যই আমাদেরকে পৌঁছানো হবে। উভয় বিষয়ের আলোচনা কুরআনে এসেছে সমসংখ্যক বার। এর দ্বারা, দুটোর যেকোনো একটা স্থানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা যে সমান সমান, সেই সতর্কবাণীই যেন ফুটে উঠেছে। এসব স্মরণিকার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর ও আচরণে প্রভাব পড়ে। তাকে উত্তম আমল ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, কেননা প্রত্যেকেই পুরস্কারের আশা রাখে ও শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়।[১২]

২.৯ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

ঈমানের ধারণায় যদিও কিছুটা মতভিন্নতা আছে; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমদের মতে: ঈমান ধ্রুবক নয়, বরং এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আল্লাহর আনুগত্যে ঈমান বাড়ে, অবাধ্যতার মাধ্যমে ঈমান কমে। নিজ নিজ ঈমানের অবস্থার দিকে মনোযোগ প্রদান করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। কখন ঈমানের বৃদ্ধি হচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী। এবং যথাসম্ভব ঈমানকে উচ্চ পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

---

[১২] al-Fozan, 1997, p. 253.

কুরআনের অনেক আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে মুমিনের ঈমান ওঠা-নামা করে, এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ার দেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।' (সূরাহ আনফাল, ৮:২)

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরাহ ফাতাহ, ৪৮:৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৭৩)

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'আর যখন কোন সূরাহ অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরাহ তোমাদের মধ্যেকার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।' (সূরাহ তাওবা, ৯:১২৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক অন্তরের উপর মেঘের মতো আবরণ রয়েছে; মেঘ উজ্জ্বল চাঁদকেও ঢেকে দিতে সক্ষম। যখন মেঘ ঢেকে দেয় তখন তা সহসা অন্ধকার হয়ে যায়, আর মেঘ কেটে গেলে এর ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে।' (তাবারানি বর্ণিত, আলবানি সনদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন)।[১৩]

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি উপমা পেশ করে বলেছেন যে, আমাদের অন্তরের দৃষ্টান্ত চাঁদের মতো, আর চাঁদ যেভাবে মেঘের আচ্ছাদনের কারণে আলো হারিয়ে ফেলে, সেভাবে গুনাহের কারণে অন্তরে আচ্ছাদন পড়ে। ফলে সে অন্ধকার হয়ে যায়। মেঘ যেভাবে সরে যায়, সেভাবে অন্তরে আলো ফিরে আসে। যখন আমরা ঈমান বৃদ্ধিকারী আমলে ব্যস্ত থাকি তখন অন্তরে আলো বৃদ্ধি পায়।[১৪]

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'কাপড় যেভাবে পুরনো হয়ে যায় সেভাবে তোমাদের অন্তরে ঈমান পুরনো হয়ে যায়। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে

---

[১৩] al-Munajjid, M. S., 2009, Weakness of Faith, Riyadh: International Islamic Publishing House, p. 47.
[১৪] al-Munajjid, 2009, p. 48.

ঈমান নবায়ন করার প্রার্থনা করো।'[১৫] (হাদিস সহিহ; আল হাকিম, আত-তাবারানি ও আল-হাইসামি)।[১৬]

ঈমান বৃদ্ধি ও নবায়নের অনেক উপায় রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এই বইয়ের সামনের দিকে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। ঈমান বৃদ্ধির প্রধান উপায়সমূহের মধ্যে রয়েছে ইলম অর্জন করা, নেক আমল বাড়িয়ে দেওয়া, আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁকে স্মরণ করা, কুরআনের আয়াতসমূহের উপর চিন্তা ও মনোযোগ দেয়া, আল্লাহর উত্তম নাম ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা, মৃত্যু ও পরকালের জীবনের স্মরণ করা ইত্যাদি।[১৭]

২.১০ মানব আত্মার প্রকৃতি

মানবাত্মার প্রকৃতি ও মূলনীতির আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে চলুন কয়েকটি পরিভাষা জেনে নেওয়া যাক। এখন আমরা রূহ, নফস ও ক্বলব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

রূহ : এই পরিভাষাটি কুরআনে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (রূহ শব্দটি আত্মা, প্রাণ অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি নামেও ব্যবহৃত হয়)। এটি গায়েবের বিভিন্ন বিষয়কেও নির্দেশ করে, যেমন- ফেরেশতা, ওহী, আসমানি অনুপ্রেরণা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানব সত্তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি আর আত্মাও বোঝানো হয়।[১৮] এটি দেহ ও মনে প্রাণদানকারী মূল উপাদান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালক। রূহ মানুষের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তাড়িত করে। সত্তাগতভাবে এটি দেহ থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যখন রূহ চলে যায়, তখন দেহের সকল কার্যক্রম থেমে যায়।

নফস : আত্মা বা 'মন' (psyche) বোঝাতে কুরআনের আরেকটি বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা হচ্ছে নফস (বহুবচন আনফুস, নুফুস)। প্রসঙ্গভেদে এই শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে; মানব আত্মা ও নিজের আপন সত্তা।[১৯] কখনো কখনো এই শব্দের মাধ্যমে আত্মা বা রূহকে বোঝানো হয় আবার কখনো দৈহিক সত্তার সাথে জড়িত মানুষের নিজের সত্তাকে বোঝানো হয়। শব্দটির উভমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মা ও মানুষের আপন সত্তার মাঝে সূক্ষ্ম সংযোগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ফুটে উঠে।

নফসের সংজ্ঞায় ড. জামাল জারাবযো, কারযুন (karzoon) এর প্রদত্ত সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন;

---

[১৫] al-Munajjid, 2009, p. 47.
[১৬] As quoted in al-Munajjid, 2009, p. 47.
[১৭] Yasin, M.N., 1997, Book of Emaan According to the Classical Works of Shaikul-Islam Ibn Taymiyyah, London: Al-Firdous Ltd., pp. 184-186; al-Munajjid, 2009, pp. 19-43.
[১৮] Ahmad, 1992, Qur'anic Concepts of Human Psyche. In Z. A. Ansari (Ed.) Quranic Concepts of Human Psyche. Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute Press, p. 25.
[১৯] Ahmad, 1992, p. 30.

'এটি মানব সত্তার আভ্যন্তরীণ বিষয় যার প্রকৃত ধরণ উপলব্ধির বাইরে। নফস ভালো বা মন্দের নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন মানবিক স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য-এর সমন্বয়ে নফস আমাদের আচরণকে স্পষ্টতঃ প্রভাবিত করে।[২০]

অধিকাংশ মুসলিম আলিম 'নফস' ও 'রূহ' পরিভাষা দুটিকে পস্পরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন। সাধারণত উভয়ের প্রধান পার্থক্য হলো আত্মা যখন দেহাভ্যন্তরে থাকে তখন তাকে 'নফস' বলে অভিহিত করা হয়, আর দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়ে গেলে তাকে 'রূহ' বলা হয়। তবে সর্বত্র এটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যেমনটা বিভিন্ন হাদিস হতে স্পষ্ট।[২১] যেমন- নিম্নের দুটি হাদিসে মৃত্যুকালে দেহ হতে আত্মা বের হওয়া প্রসঙ্গে রূহ/নফস (উভয়) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে।' (মুসলিম)। আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কি মানুষের দিকে লক্ষ্য কর না? যখন সে মারা যায় তখন তার চোখ উপরের দিকে উল্টে থাকে।' সাহাবিগণ বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'এ হলো সে মুহুর্ত যখন চোখ নফসের দিকে চেয়ে থাকে। (মুসলিম)। সুতরাং, এই এখানে সুস্পষ্টভাবে 'রূহ' ও 'নফস' পরিভাষাদ্বয়কে মানব আত্মা বর্ণনা প্রসঙ্গে আন্তঃপরিবর্তনীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম।

ইবনুল কাইয়িম এর কাজের উপর ভিত্তি করে আল-কানাদি মানব আত্মা সম্পর্কে বলেছেন:

'আত্মা এমন এক সত্তা যা বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়সত্তা হতে ভিন্ন। এটি এক উচ্চতর আলোকময় সত্তা, যা জীবন্ত ও গতিশীল। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আত্মা এমনভাবে সঞ্চালিত হয়, যেভাবে পানি সঞ্চালিত হয় গোলাপের পাঁপড়িতে, তেল সঞ্চালিত হয় যায়তুনে, আগুন সঞ্চালিত হয় জ্বলন্ত কয়লাতে। প্রত্যেকেই যৌক্তিকভাবে নিজের দেহে আত্মার অস্তিত্ব ও প্রভাব অনুভব করতে পারে, এটি অ-শারীরিক হলেও শারীরিক ছাঁচেই তার আকৃতি।'[২২]

রূহের রহস্য

কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, আমরা রূহের রহস্য সম্পর্কে খুব অল্প জ্ঞান রাখি। এ সংক্রান্ত অধিকাংশ জ্ঞান আল্লাহ যথাযোগ্য হিকমত অনুসারে গোপন রেখেছেন। তিনি বলেছেন,

---

[২০] Zarabozo, 2002, p. 60.

[২১] al-Kanadi, M., 1996, Mysteries of the Soul Expounded, Jeddah, Saudi Arabia: Inheritors of Abu Bilal Mustafa al Kanadi, p. 10.

[২২] al-Kanadi, 1996, p. 3, translating a passage from Ibn al-Qayyim, Kitab ar-Ruh, pp 249-250.

'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিনঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।' (সূরাহ ইসরা, ১৭:৮৫)

অত্র আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে যে রূহের প্রকৃতি ও ধরণ পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য মানুষের যথেষ্ট ক্ষমতা নেই। আমরা কখনোই রূহ, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ও এর পেছনের কারণগুলো আবিষ্কার করতে পারব না। বিজ্ঞানের মাধ্যমেও এগুলো জয় করা সম্ভব নয়, কেননা গায়েবের জগৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির আওতা বহির্ভূত।

রূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং এটি মানবদেহে ফুঁকে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেছেন,

'অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।' (সূরাহ হিজর, ১৫:২৯)

• অন্যত্র বলেছেন,

'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:৯)

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করা জরুরি, রূহ হলো প্রাণ ও আত্মার একটি উপাদান যা আল্লাহ দেহের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি তার নিজের সত্তা (স্পিরিট) বা সত্তার অংশ নয়। রূহ সত্তাগতভাবে দৈহিক সত্তার মতোও নয়। কেননা, রূহ এমন কিছু থেকে তৈরি যার সমতুল্য কোনো বস্তু নেই। রূহের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা অসম্ভব।[২৩] ওহীর জ্ঞান থেকে আমরা কেবল এতটুকু জানি যে রূহের অবতরণ-আরোহণ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দেখা, শোনা ও বলার ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে এগুলো আমাদের পরিচিত ও বোধগম্য বস্তুগত বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন।[২৪]

দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে রূহ বিস্তৃত। দৈহিক সঞ্চালন, অনুভূতি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রূহ তাড়িত করতে পারে। রূহ চলে গেলে মানুষের জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) লিখেছেন,

'যেভাবে প্রাণের সঞ্চালন পুরো দেহের বৈশিষ্ট্য, সেভাবে রূহ দেহের কোনো নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সম্পূর্ণ অংশে বিস্তৃত থাকে। জীবন রূহের উপর নির্ভরশীল, যখন দেহে রূহ থাকে তখন তা জীবিত, আর রূহ চলে গেলে তা মৃত।[২৫]

---

[২৩] al-Ashqar, U.S., 2002, The Minor Resurrection (What Happens after Death) in the Light of the Qur'an and Sunnah, Riyadh, Saudia Arabia: International Islamic Publishing House, p. 119.

[২৪] Ibid., p. 119.

[২৫] Ibid., p. 119.

আরবিতে 'মানুষ' বোঝাতে ইনসান শব্দ ব্যবহৃত হয়, এর মাধ্যমে মানুষের দেহ ও রূহ উভয়কে বোঝানো হয়। কুরআনে সূরাহ ইনসানের সূচনা ঘটেছে এভাবে,

> 'মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।' (সূরাহ ইনসান, ৭৬:১)

ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

> 'ইনসান' (মানুষ) শব্দের মাধ্যমে দেহ ও রূহ উভয়টি বোঝায়; তবে অবশ্যই দেহ অপেক্ষা রূহ বোঝাতে এটি অধিক প্রযোজ্য। রূহের জন্য দেহ কেবল একটি ধারক।[২৬]

২.১১ ভালো ও মন্দ

ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে মানুষ ভালো-মন্দ উভয় ধরনের কাজ করতে সক্ষম। মানুষের আত্মা সৃষ্টিগতভাবে অশুভ নয়, তবে অশুভ কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে, তেমনিভাবে ভালো কাজের যোগ্যতাও রয়েছে। বস্তুতঃ ফিতরাতের (সহজাত বৈশিষ্ট্য) কারণে ভালো কাজের প্রতিই অধিক ঝোঁক থাকে। অশুভ বিষয়গুলোকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে, সেগুলোর কুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। এ বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

ভালো কাজের প্রতি মানুষের সহজাত আগ্রহের বিষয়টি এটা থেকে সুস্পষ্ট যে, যারা অমুসলিম, আল্লাহর হিদায়াত হতে পথভ্রষ্ট, সরল পথ হতে বিচ্যুত; তারাও তাদের জীবনে কিছু না কিছু ভালো কাজ করে। যদি এমনটি না হতো তাহলে এই দুনিয়া বর্তমান সময়ের থেকেও অধিক ফিতনা ফাসাদ, বিশৃংখল ও ধ্বংসাত্মক কাজে পরিপূর্ণ হয়ে যেত (যা কল্পনা করাও কষ্টকর)। সাধারণত (এর ভিত্তিতেই) মানুষ বিভিন্ন নীতি-নৈতিকতা, জীবনবোধ ও আইন-কানুনের কাঠামো তৈরি করে এবং ঠিক করে যে, কোনো আচরণগুলো গ্রহণযোগ্য ও কোনোগুলো অগ্রহণযোগ্য। যদিও এসকল নীতি-নৈতিকতাগুলো সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ); তবে সেখানে ধর্মের কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অমুসলিমরা তাদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে পারে, তবে সেই পুরস্কার দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আখিরাতে তাদের কোনো পুরস্কার প্রদান করা হবে না। কেননা, তারা এককভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে ও তাঁর ইবাদাত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অথচ তিনিই এর যোগ্য ও একমাত্র দাবিদার।

মন্দ ও অশুভ কাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা। যদি আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র ভালো কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করতেন, যদি দুনিয়াতে কেবল 'ভালো' থাকত তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য হতাম। সেক্ষেত্রে মানুষের জবাবদিহিতা গ্রহণ ও বিচার করার কোনো প্রয়োজন থাকত না। বরং সকলেই সক্ষম হতো জান্নাতের লক্ষ্য অর্জনে। যেহেতু আল্লাহ

---

[২৬] Ibn Taymiyah, Sharh at-Tahawiyah, p. 442, as quoted in al-Ashqar, 2002a, p. 126.

তাআলার উদ্দেশ্য মানুষকে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা করা এবং কাফিরদের থেকে সত্যিকার ঈমানদারদের পৃথক করা; ফলে মন্দকাজের প্রতি প্রলোভন সেই মহাপরিকল্পনার অংশ। আমাদের চারপাশে নানারকম মন্দকাজের প্রলোভন রয়েছে, এমনকি আমাদের নফসের মধ্যেও রয়েছে।

২.১২ নফসের প্রকারভেদ

সাধারণত আমলের ভিত্তিতে মানুষের নফস তিন ধরণের হয়, যথা:

১. নফসে আম্মারাহ (نفس أمارة) বা মন্দকাজের আদেশদানকারী আত্মা

২. নফসে লাওয়ামাহ (نفس لوامة) বা আত্ম-তিরস্কারকারী আত্মা

৩. নফসে মুত্বমাইন্নাহ (نفس مطمئنة) বা প্রশান্ত আত্মা

এর অর্থ এমন নয় যে, একই ব্যক্তির মধ্যে তিন ধরনের নফস বিদ্যমান বরং এর অর্থ হলো বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে একই নফস বিভিন্নরূপে আচরণ করে। সামনে এর ব্যাখা প্রদান করা হলো,

নফসে আম্মারাহ; এই নফস মানুষকে মন্দকাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন,

> 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (সূরাহ ইউসুফ, ১২:৫৩)

এটি নফসের সবচেয়ে নীচু পর্যায়। এটি দুনিয়ার বস্তুগত আসক্তি ও দৈহিক পরিতৃপ্তি, ফূর্তি ইত্যাদি তালাশ করে। পরিচালিত হয় নিজের খেয়াল খুশি অনুসারে এবং সহজেই নানা রকমের গুনাহ ও অবাধ্যতা সম্পাদন করে। যদি কেউ নিজের নফসকে এ ধরনের নিচু কামনা-বাসনার প্রতি অবাধ ছেড়ে দেয় তাহলে সে গুনাহের প্রতি ঘৃণা হারিয়ে ফেলে।[৩৭] ধীরে ধীরে যত গুনাহের পথে নামতে থাকে তত সত্যকে অনুধাবনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। মন্দ বিষয়াদি তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ও অন্তর কঠিন হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

> 'কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' (সূরাহ মুতাফফিফিন, ৮৩:১৪)

এ ধরনের নফসের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং আল্লাহকে নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে না। তখন তাদের জন্য আল্লাহ একজন সাথী নিযুক্ত করে দেন, আর সে হলো শয়তান। আল্লাহ বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে

---

[৩৭] Zarabozo, 2002, pp. 62-63.

সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।' (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩:৩৬-৩৭)

শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা প্রদান করে ও সহজেই মন্দ কাজে অনুপ্রাণিত করে। যেহেতু এই নফস ইতোমধ্যেই মন্দকাজের প্রতি আসক্ত, সেহেতু সে স্বেচ্ছায় শয়তানের আনুগত্য করে।[২৮]

নফসে লাওয়ামাহ (نفس لوامة) বা আত্ম-তিরস্কারকারী নফস:

এই নফস মন্দকে মন্দ হিসেবে শনাক্ত করে, নিজের বদ আমলের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয় ও অনুতপ্ত হয়। এই নফস বেশি বেশি ভালো কাজ না করার জন্যেও নিজেকে দোষারোপ করে।[২৯] আল্লাহ্ বলেছেন,

'আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়-' (সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫:২)

নিজের নফসের মন্দ প্রকৃতি আবিষ্কার ও জুলুম শনাক্ত করার পর নফসে লাওয়ামাহ'র অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করে এবং নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ বলেন,

'তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৩৫)

এই নফস সর্বদা ভালো-মন্দের মাঝে সংগ্রামরত থাকে।[৩০]

নফসে মুত্বমাইন্নাহ (نفس مطمئنة) বা প্রশান্ত আত্মা:

যখন ব্যক্তির অন্তরে আন্তরিকতাপূর্ণ ঈমান শক্তিশালী হয়, তখন মন্দ কাজের প্রতি ঝোঁক কমে আসে। নফসে পরিপূর্ণ পরহেজগারী ও নেক আমল প্রাধান্য লাভ করে। ভালো কাজকে পছন্দ করে এবং মন্দ কাজকে ঘৃণা করে, ফলে এই নফসের অধিকারী ব্যক্তির দ্বারা মন্দ কাজের আহবানে সাড়া দেয়া বিরল ঘটনা হয়ে যায়।[৩১] এটি হলো নফসের প্রশান্তিময় পর্যায়। আল্লাহ বলেন,

'হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (সূরাহ ফাজর, ৮৯:২৭-৩০)

---

[২৮] Zarabozo, 2002, p. 63.
[২৯] Ibid., pp. 66-67.
[৩০] al-Ashqar, 2002a, p. 133.
[৩১] Zarabozo, 2002, pp. 67.

ভালো কাজের প্রাধান্যের ফলে নফস প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। এই নফস আল্লাহর অনুগত ও তাকদীরের সকল অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করে।[৩২] আল্লাহর সাথে মজবুত সংযুক্তির মাধ্যমে সে নিজের নফসের তাড়না ও কামনা বাসনাকে শান্ত রাখে, এই অবস্থায় মন্দ কাজের প্রতি ঝোঁক অল্পতেই দমন করা যায়। এই নফসের অধিকারী ব্যক্তিরা প্রকৃত অর্থে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন, আর সেটা হলো আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য। নফসের এই স্তর অর্জন করা খুবই সম্ভব, এর মাধ্যমে মুমিন তার জন্য অপেক্ষমাণ আখিরাতের আনন্দের কিছু কিছু স্বাদ দুনিয়াতেই লাভ করে।

২.১৩ অন্তর (ক্বলব)

অন্তর বা হৃদয়ের আরবি প্রতিশব্দ 'ক্বলব', এটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হয়েছে। এর মাধ্যমে কখনো সরাসরি অন্তরকে বোঝানো হয়েছে, আবার কখনো অন্তরকে ধারণকারী বক্ষদেশ বোঝানো হয়েছে। 'ক্বলব' শব্দের ধাতুমূল দ্বারা এমন বিষয়সমূহ বোঝানো হয় যা সর্বদা দ্রুত পরিবর্তনশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ক্বলব (অন্তর) এসেছে 'তাকাল্লুব' থেকে যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। অন্তর গাছের গোড়ায় পড়ে থাকা পালকের মতো সদাসর্বদা বাতাসে উলট পালট হতে থাকে।' (হাদিস সহিহ, আহমাদ)। অন্তরের এই পরিবর্তনশীল অবস্থা ঈমানের স্তরের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামি মানদণ্ডে, অন্তর নিছক ভালোলাগা ও আবেগের স্থান নয়, এটি একইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত (cognitive) বিষয়াদি, অনুধাবনশক্তি, ভালো-মন্দ বাছাই ও নিয়ত বা সংকল্পের কেন্দ্র।[৩৩] এটি একটি 'সুপার-সেন্সরি অর্গান' বা 'অতিন্দ্রিয় অঙ্গ' যার পরাবাস্তবতা ও সত্যতা সম্পর্কে আমরা অবগত। 'ক্বলব' রূহের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, যদিও এই সংযোগের প্রকৃত ধরণ আমাদের অজানা।

যেমনটা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, ক্বলব আবেগ ও যুক্তি উভয় ধরনের কাজে সক্ষম। ক্বলব কোনো কিছু বিশ্লেষণ করা ও বোঝার ক্ষমতা রাখে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এমনটি উল্লেখ হয়েছে,

> 'তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয়(ক্বলব) ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই(ক্বলব) অন্ধ হয়।' (সূরাহ হাজ্জ, ২২:৪৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর(ক্বলব) রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর

---

[৩২] Ibid., 2002, p. 68.
[৩৩] Haque, 2004, p. 48.

তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।' (সূরাহ আরাফ, ৭:১৭৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জেনে রাখ, মানুষের শরীরে এক টুকরা গোশত রয়েছে। সেটি সুস্থ ও দোষমুক্ত থাকলে সমগ্র শরীরও সুস্থ ও দোষমুক্ত থাকে এবং সেটি দূষিত ও অসুস্থ হলে সমগ্র শরীরই দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হচ্ছে 'ক্বলব' বা অন্তঃকরণ।'(বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিসের বর্ণনা হতে দেখা যায়, মানব মনস্তত্ত্বে ক্বলবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি নিছক একটি রক্ত সঞ্চালনকারী অঙ্গ (হার্ট) নয়। সম্পূর্ণ দেহে এর ব্যাপক আধ্যাত্মিক ভূমিকা রয়েছে। যদি অন্তর সুস্থ থাকে তাহলে সমস্ত দেহ সুস্থ থাকবে, দেহের মাধ্যমে সংঘটিত আমলগুলো বিশুদ্ধ হবে। আর অসুস্থ অন্তর চালিত করে অসুস্থ দেহ ও অসুস্থ কার্যক্রমের দিকে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান সময়ে মুসলিমরা ক্বলবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝতে উদাসীন। সাধারণত তারা আমল বা ঈমানের প্রতি মনোযোগী হলেও আবেগের প্রতি অল্প মনোযোগী থাকেন। অথচ আমলের কবুলিয়াত নির্ভর করে ক্বলবের অবস্থার উপর। আমরা সালাত আদায় করতে পারি, সিয়াম ও অন্যান্য ফরযিয়াত পালন করতে পারি কিন্তু যদি অন্তরে আল্লাহর জন্য করার নিয়ত না থাকে অথবা উদাসীনতার সাথে আমল করা হয় তবে আমাদের আমলগুলো মোটেও কবুল হবে না। এমনকি সেই আমল আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ধরা হবে যদি ইবাদাতে ভিন্ন কোনো কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে থাকে, যেমন- মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা বা স্বীকৃতি লাভ। হয়তো এ কারণেই সুফিবাদ সাধারণ মানুষের কাছে এত জনপ্রিয়। কেননা, সেখানে মানুষের আবেগের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় (যদিও সাধারণত ঈমান ও আমলের ক্ষতিকারক পদ্ধতি বেশি দেখা যায়)।

ক্বলব বা অন্তরের অবস্থা আলোচনা করে ড. জামাল জারাবযো বলেছেন,

'দেহের বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ক্বলবের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে। ক্বলব কমান্ডার, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সৈনিক। যদি ক্বলবের অবস্থা উত্তম হয় তাহলে সৈনিকদের কার্যক্রম উত্তম হবে, আর যদি ক্বলব মন্দ হয় তাহলে সৈনিকদের কার্যক্রমও মন্দ হবে। যদি ক্বলব পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হয় তাহলে সেখানে একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে। আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেগুলোকে ভালবাসবে। আল্লাহর ভয় থাকবে ও যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তাতে লিপ্ত হবার ভয় থাকবে। এ ধরনের ক্বলব সকল প্রকার নিষিদ্ধ ও সংশয়জনক কাজ থেকে দূরে থাকবে। আর যদি অন্তর ব্যাপকভাবে দূষিত

হয় তাহলে নফসের কামনা-বাসনা অনুসরণ করবে এবং আল্লাহর পরোয়া না করে নিজের ইচ্ছামত আমল করতে থাকবে।[৩৪]

২.১৪ আল্লাহ্ অন্তরের গোপন খবর জানেন

মানুষ অন্তরের খবর প্রকাশ করুক বা গোপন রাখুক, আল্লাহ্ প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়েও বিস্তারিত অবগত। মানুষকে বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্মরণিকা অনুসারে নিজেদের নিয়ত ও আচরণ সংশোধন করা উচিত। আল্লাহ্ বলেছেন,

> 'বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসব ও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।' (সূরাহ্ আলে ইমরান, ৩:২৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'আল্লাহ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত।' (সূরাহ্ ফাতির, ৩৫:৩৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।' (সূরাহ্ মুলক, ৬৭:১৩-১৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার **গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী**।' (সূরাহ্ ক্বাফ, ৫০:১৬)

শেষোক্ত আয়াতে যে 'নৈকট্য' বোঝানো হয়েছে তা জ্ঞানের মাধ্যমে নৈকট্য অর্থাৎ মানুষের সকল অবস্থা সম্পর্কে সর্বাবস্থায় সম্যক অবগত হওয়ার মাধ্যমে তিনি নিকটবর্তী।

২.১৫ ক্বলবের প্রকারভেদ

যেহেতু ক্বলব(অন্তর) নফসের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এরও তিনটি ধরণ রয়েছে যা নফসের অনুরূপ। এগুলো হলো সুস্থ অন্তর, মৃত অন্তর ও অসুস্থ বা ত্রুটিপূর্ণ অন্তর। যদি অন্তর উত্তম হয় তবে ব্যক্তির আমল উত্তম হবে, আর অন্তর দূষিত হলে আমল মন্দ হবে।

সুস্থ ক্বলব (অন্তর) : সুস্থ অন্তর এমন সব শাহওয়াত ও শুবুহাত (কামনা বাসনা ও সন্দেহ) হতে মুক্ত থাকে যাতে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা ও ওহীর সাথে সংঘাত

[৩৪] Zarabozo, J., 1999, Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi, Denver, CO: Al Basheer Company for Publications and Translations, Vol. 1, pp. 469-470.

রয়েছে। এটি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, নির্ভর করে। এই ধরনের অন্তর সজীব, বিনীত ও প্রশান্ত।[৩৫] বিশুদ্ধ অন্তর একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে পরিপূর্ণ থাকে। আল্লাহ যা ভালবাসেন সেটি তার কাছে প্রিয় এবং তিনি যা অপছন্দ করেন সেটি সেই অন্তরে অপছন্দনীয়। বিচার দিবসে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ও অনুগত ক্বলব নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে একমাত্র সেই ক্বলবই উপকারে আসবে। আল্লাহ বলেন,

> 'যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।' (সূরাহ শুয়ারা, ২৬:৮৮-৮৯)

রাসূলুল্লাহ (.সা)বিশুদ্ধ অন্তরের জন্য দুআ করতেন। তিনি বলতেন,

> 'হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমন পরিষ্কার করে দিন, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে বরফ, পানি ও মেঘের শিলাখণ্ড দ্বারা ধৌত করে দিন।'(বুখারি)

সুস্থ অন্তর আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। আল্লাহ বলছেন,

> 'হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:৫৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।' (সূরাহ রাদ, ১৩:২৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাজিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:২৩)

মৃত অন্তর : মৃত অন্তর তার রবের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। সে তার রবকে চিনে না, ইবাদাত করে না। কেবল নিজের খেয়ালখুশি অনুসরণ করে ও দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। নিজের কামনা বাসনা অনুসরণ করে এবং মন যা চায় সে সকল কাজে ব্যস্ত থাকে। ওদিকে আল্লাহর কাছে সেসব কাজ অপছন্দনীয় কি না তা পরোয়া করে না। এটি

---

[৩৫] Ibn Taymiyyah, 1998, Diseases of the Hearts and their Cures, Birmingham, U.K: Al Hidaayah Publishing and Distribution, p. 11.

কঠিন ও রুক্ষ অন্তর।[৩৬] যখন এই ধরনের অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর কালাম কুরআনের আয়াত শুনে তখন বিপরীত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ বলেন,

> 'যখন খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৪৫)

যারা আল্লাহর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে তাদের অন্তরগুলো অন্ধ ও বধির। তাদের বোধশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা মৃত। যখন কোনো গুনাহের কাজ করা হয় তখন অন্তরে একটি দাগ বা আবরণ পড়ে যায়। তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সেই আবরণ অপসারণ করা যায়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি তাওবা না করে, তবে গুনাহের আবরণ গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, এক পর্যায়ে সমস্ত অন্তরে তালাবদ্ধ হয়ে যায় এবং ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ বলেন,

> 'কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' (সূরাহ মুতাফফিফিন, ৮৩:১৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৭)

এধরনের অন্তরের ব্যাপারে কুরআনের একটি চমৎকার উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে,

> 'অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসেপড়তে থাকে! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৭৪)

এই আয়াতটি বনি ইসরাইলিদের সাথে সম্পর্কিত, তারা আল্লাহর বিরোধিতা করেছে ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে তাদের অন্তরগুলো পাথরের থেকেও কঠিন হয়ে গেছে ও সকল প্রকারের হিদায়াত লাভের পথ যুগপৎভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

অসুস্থ অন্তর : অন্তরের তৃতীয় ধরণ হচ্ছে অসুস্থ অন্তর। এটি পূর্বোক্ত উভয় প্রকার অন্তরের মধ্যবর্তী ধরণ। এতে প্রাণের কিছু ছোঁয়া রয়েছে কিন্তু তা ত্রুটিপূর্ণ। এতে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ঈমান এবং তাওয়াক্কুল রয়েছে কিন্তু একইসাথে অর্থহীন

কামনা-বাসনা ও বস্তুগত দুনিয়ার প্রতি মোহ লালায়িত আছে। এই অন্তর সবসময় নিরাপত্তা ও ধ্বংসের মাঝে দুলতে থাকে।[৩৭]

যদি কোনো ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয় তবে তার অন্তর দুর্বল হতে থাকে এবং পরবর্তী আক্রমণ ও ব্যাধির প্রতি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। যদি তাকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা না করা হয় তবে সেটি একটি মৃত অন্তরে পরিণত হয়।

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ অন্তরের তিনটি অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

'**অন্তর তিন ধরনের।** প্রথম ধরন ঈমান ও সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে শয়তান ওয়াসওয়াসা প্রদান করে ও নিজের বিশ্রামাগার বানিয়ে ফেলে। আর যখন শয়তান সেখানে বসতি স্থাপন করে তখন নিজের রাজত্ব স্থাপন করে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত হলেও রয়েছে কিছু অন্ধকার। সেখানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে কিন্তু প্রদীপের নিচে থাকা অন্ধকারের মতো রয়েছে আবেগ ও তাড়না। এই অন্তরে কখনো শয়তান অভ্যর্থনা লাভ করে আবার কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় কিন্তু শয়তান আশা হারায় না, বরং দখলের আকুতি অনুভব করে। দুই পক্ষেই যুদ্ধ চলতে থাকে। এই ধরনের লোকদের অবস্থা ব্যাপক পরিবর্তনশীল। কারো ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় শয়তান বিজয় লাভ করে আবার কারো ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় শয়তান পরাজিত হয়; আবার কারো ক্ষেত্রে দুই পক্ষে জয়-পরাজয় চলতে থাকে।

তৃতীয় প্রকারের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ, আলোয় আলোকিত এবং সেখান থেকে কামনা-বাসনার আবরণ উন্মোচিত ও অন্ধকারের ছায়া দূরীভূত! ফলে তার বক্ষদেশ আলোয় ঝলমল করতে থাকে। নূরের ছটায় ভ্রান্ত পথের হাতছানি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই অন্তর উল্কাপিণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত নভোমন্ডলের অনুরূপ। যদি শয়তান সেদিকে যেতে চায় তখন উল্কাপিণ্ড তাকে ধাওয়া করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই মুমিনের অন্তর অপেক্ষা অলঙ্ঘনীয় কোনো নভোমন্ডল নেই। আল্লাহ তাকে এমনভাবে রক্ষা করেন যেভাবে তিনি ঊর্ধ্বজগতে শয়তানের প্রবেশকে আটকে রাখেন কেননা ঊর্ধ্বজগৎ ফেরেশতাদের ইবাদাতখানা, সেখান থেকেই ওহী নাজিল হয়, সেটি এমন স্থান যেখান থেকে আনুগত্যের আলোকধারা বিচ্ছুরিত হয়। আর মুমিনের অন্তর হলো তাওহিদ, আল্লাহর ভালোবাসা ও মারেফাতের কেন্দ্র। এখানে ঈমানের আলো ঝলমল করে। কাজেই, এটি শত্রুর চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভের দাবীদার। শত্রু এই অন্তর থেকে কিছুই লাভ করেনা—যদি না অন্তর নিজেই উদাসীন হয়ে শত্রুর ধোঁকাকে আমন্ত্রণ জানায়।[৩৮]

---

[৩৭] Ibid., p. 11.
[৩৮] al-Jawziyah, 2000, p. 31.

সুস্থ অন্তরের নিদর্শন : অন্তর সুস্থ ও বিশুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে কিনা তা কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে বোঝা যায়। সেই পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো সুস্থ অন্তর দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে থাকে না বরং সে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি সংযুক্ত থাকে। সুস্থ অন্তরের নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে,[৩৯]

১। নিজেকে আখিরাতের বাসিন্দা মনে করা; পরকালীন জীবনে পৌঁছাতে আগ্রহী হওয়া।

২। গুনাহের পর তাওবা না করা পর্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে থাকা।

৩। প্রাত্যহিক যিকির-আযকার, হামদ, দুআ ও তিলাওয়াত ছুটে গেলে অখুশি ও অতৃপ্ত বোধ করা।

৪। সব রকম আনন্দ অপেক্ষা আল্লাহর ইবাদাতে অধিক আনন্দ লাভ করা।

৫। সালাতরত অবস্থায় দুনিয়ার দুঃখ দুশ্চিন্তার অনুপস্থিতি অনুভব করা।

৬। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করা হলো কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন ও পেরেশান থাকা।

৭। আমলের গুণগত মান ও শুদ্ধতা নিয়ে অধিক উদ্বিগ্ন হওয়া।

৮। সময় অপচয়ের বদলে প্রতি মুহূর্ত সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া।

অসুস্থ অন্তরের নিদর্শন : যে ব্যক্তির অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত বা দূষিত তা বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে বোঝা যায়।[৪০] যেমন,

১। গুনাহ করার সময় কোনো ব্যথা বেদনা অনুভব না করা।

২। আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে আনন্দ অনুভব করা।

৩। কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে অধিক মনোযোগী অথচ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে উদাসীন।

৪। সত্য মানতে, পছন্দ করতে ও আত্মসমর্পণ করতে অপছন্দ করা।

৫। নেক ব্যক্তিদের সাহচর্যে অস্বস্তি অনুভব করা কিন্তু পথভ্রষ্ট, গুনাহগার ব্যক্তিদের সাহচর্যে আনন্দ অনুভব করা।

৬। সন্দেহ-সংশয় ও ভুল ধারণার পেছনে লেগে থাকা, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য উপকারি আমলের বদলে নানা রকম ভুল ধারণা নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের প্রতি আকৃষ্ট থাকা।

৭। ওয়াজ-নসীহতে ভাবান্তর না হওয়া।

২.১৬ অন্তর বিষাক্তকারী বিষয়ের বর্ণনা

সকল অবাধ্যতার কাজের মাধ্যমে অন্তর বিষাক্ত হয়ে উঠে ও অসুস্থ হয়। তবে চারটি **সুনির্দিষ্ট অবাধ্যতা** বেশি বিস্তৃত দেখা যায় এবং এগুলো অন্তরের সুস্থতার ওপর সবচেয়ে **ক্ষতিকর** ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেগুলো হলো—অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর

---

[৩৯] Zarabozo, 1999, pp. 471-2.
[৪০] Zarabozo, 1999, pp. 472-3.

কথাবার্তা, অনিয়ন্ত্রিত চাহনি, অতিরিক্ত পানাহার ও অসৎ সঙ্গ।[৪১] প্রথম তিনটি নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে আর চতুর্থটি সামাজিক সম্পর্ক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

২.১৬.১ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কথা : অনেক মানুষই এই বিষয়টি ভুলে যায় যে কাজকর্মের পাশাপাশি কথার জন্যেও তাদেরকে হিসাব দিতে হবে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বান্দাহ এমন একটি কথা বলে, যে ব্যাপারে সে কিছু চিন্তা করেনা। (অথচ) এর কারণে সে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশি দূরত্বে জাহান্নামে চলে যায়।' (মুসলিম)

আরেক হাদিসে এসেছে, 'নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তার মর্যাদা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন নয়, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।' (বুখারি)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর হিফাজত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।' (বুখারি)

মুখ ও জিহ্বা হিফাজতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এই দুটি দ্বারা সম্পাদিত অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকা, যেমন মিথ্যাচারিতা, পরচর্চা, পরনিন্দা, অভিশাপ, ঝগড়া ইত্যাদি। মুখ ও জিহ্বার মাধ্যমে হারাম খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকাও এর হিফাজতের অন্তর্ভুক্ত। জিহ্বা সহজেই দ্রুততার সাথে নড়াচড়া করানো যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে এর ক্ষতি থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যেকোনো কথা একবার মুখ থেকে বের হয়ে গেলে তার মাধ্যমে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হতে পারে। সেটাকে আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় থাকেনা, তার কোনো প্রতিকার করা যায় না। এর পরিবর্তে যদি শুরুতেই জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা হতো সেটিই ছিল তুলনামূলক সহজ এবং উত্তম, তাহলে আর পরবর্তী ফলাফলের দায়দায়িত্ব ঘাড়ে চাপত না।

২.১৬.২ অনিয়ন্ত্রিত চাহনি : আল্লাহ তাআলা শালীনতা ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষার্থে দৃষ্টি নত রাখতে ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নজর হিফাজত করতে নির্দেশনা প্রদান করে বলেছেন,

> 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। ...' (সূরাহ নূর, ২৪:৩০-৩১)

[৪১] Farid, A., (Ed.), 1993, The Purification of the Soul (Works of al-Hanbali, al Jawziyya, al-Ghazali), London, U.K: Al Firdous Ltd, p. 23.

একজন মুমিন কেবল বৈধ দৃশ্য দেখতে পারে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে মুমিন নারী কিংবা পুরুষকে দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিজেকে রাস্তার ওপর বসা থেকে বাঁচাও। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, আমাদের জন্যে (রাস্তায়) বসা তো জরুরী। আমরা রাস্তায় বসে কথা বলি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের যদি বসেতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, (১) দৃষ্টিকে নিম্নমূখী রাখা, (২) কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, (৩)(পথিকের) সালামের জবাব দেয়া, (৪) সৎকাজের হুকুম দেয়া, (৫) মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেছেন, 'আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করো আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করব। যখন তোমাদের কেউ কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে না, আমানত প্রদান করা হলে খেয়ানত করবে না, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে না, দৃষ্টি নত রাখবে, নিজের হাতকে সংবরণ করবে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে।' (আহমাদ ও ইবনু হিব্বান সংরক্ষিত নির্ভরযোগ্য হাদিস)। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত হয় এবং আকর্ষণ ও কামনা-বাসনার উদ্রেক ঘটে। ফলে একজন ব্যক্তি হারাম কাজ করার মাধ্যমে সে তাড়না নিবারণ করে।

• আত্মার পরিশুদ্ধি বিষয়ে রচিত গ্রন্থে ফরিদ উল্লেখ করেছেন,

> 'শয়তান প্রবেশ করে দৃষ্টির মাধ্যমে, এর সাহায্যে সে শূন্যস্থানে বায়ুর থেকেও দ্রুত গতিতে সফর করে। সাধারণ বিষয়কেও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং অন্তরে পূজনীয় মূর্তিতে রূপান্তরিত করে। এরপর সে মিথ্যা পুরস্কারের ওয়াদা প্রদান করে অন্তরে কামনার আগুন প্রজ্বলিত করে, এরপর সেই আগুনে লাকড়ি স্বরূপ গুনাহের কাজ সম্পাদন করে। অথচ কিছুই ঘটত না যদি শুরুতেই সে নিষিদ্ধ দৃষ্টি প্রদান হতে বিরত থাকত।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) অনিয়ন্ত্রিত চাহনি ও লজ্জাস্থানের পারস্পরিক সংযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, 'মানুষের জন্যে তার ব্যভিচারের অংশ লেখা হয়েছে, যা সে নিশ্চিতভাবেই পেয়ে যাবে। (সুতরাং) দুই চোখের জিনা হলো পরস্ত্রীর প্রতি নজর করা, দুই কানের জিনা হলো যৌন উত্তেজক কথা-বর্তা শ্রবণ করা, মুখের জিনা হলো পরস্ত্রীর সাথে রসালো কণ্ঠে কথা বলা। হাতের জিনা হলো পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা হাত দিয়ে ধরা এবং পায়ের জিনা হয়ে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্ত্রীর কাছে গমন। অন্তরের ব্যাভিচার হলো হারাম বস্তু কামনা করা, আর (পরিশেযে) লজ্জাস্থান এসবের সত্যতা প্রমাণ করে কিংবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (বুখারি ও মুসলিম)।

এধরনের ফাঁদে ধরা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের প্রধান কাজগুলোর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে, অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ভুলে যায়। যেমন- আল্লাহর স্মরণ ও

[৪২] Ibid., p. 27.

আনুগত্য হতে গাফেল হয়ে যায়। এভাবে অবাধ্যতার কারণে অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে মিথ্যা হতে সত্য পৃথক করতে পারে না।

২.১৬.৩ অতিরিক্ত পানাহার : কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মুমিনদেরকে অতিরিক্ত পানাহার পরিহার করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন,

> 'হে বনি-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরাহ আরাফ, ৭:৩১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো মানুষ পেটের চাইতে খারাপ কোনো পাত্র ভর্তি করে না। মানুষের মেরুদণ্ড সোজা রাখার মতো কয়েক গ্রাস খাদ্যই তার জন্য যথেষ্ট। এর চাইতেও যদি বেশি প্রয়োজন হয়, তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে এক-তৃতীয়াংশ তার খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ তার পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ভাগ করে নেবে।' (তিরমিযি ও ইবনু মাজাহ, সনদ বিশুদ্ধ)

অতিরিক্ত পানাহারের মাধ্যমে ফরজ আমল পালনে অলসতা সৃষ্টি হয়। যেমন- সালাত ও অন্যান্য আমল। অতিরিক্ত পানাহারের ফলে কামনাবাসনা উদ্দীপ্ত হয়, নাফরমান কাজে শক্তি ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমে আসে। উদাহরণস্বরূপ; ভরপেট আহার করার পর মানুষের মধ্যে রাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে ভরপেট আহার করার পর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। পাকস্থলী পরিপূর্ণ হয়ে গেলে খাদ্য হজমের জন্য সেখানে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হয়, ফলে মস্তিষ্কে তুলনামূলক কম রক্ত সঞ্চালন ঘটে।

২.১৭ অন্তর ও আত্মায় গুনাহের প্রভাব

কলব(অন্তর) ও নফসের(আত্মা) উপর গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে, ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে গুনাহের তীব্রতার উপর। কুরআন ও হাদিসে পাপী ব্যক্তির অন্তর সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। তিরমিযি সংরক্ষিত নির্ভরযোগ্য সনদের হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ্ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তাওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ্ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন: 'কক্ষনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে' (সূরাহ আল-মুতাফফিফীন: ১৪)।

গুনাহের ফলে একদিকে অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের সংকল্প দুর্বল হয়ে আসে, আরেকদিকে ভবিষ্যতে আরও গুনাহ্ করার সংকল্প শক্তিশালী হয়। ধীরে ধীরে তাওবার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে একসময় অন্তর থেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়।[৪৩] এভাবে গুনাহ

[৪৩] al-Jawziyyah, I. Q., 2006, Spiritual Disease and Its Cure, London, UK: Al- Firdous Ltd., p. 74.

অন্তরকে ব্যধিগ্রস্ত করে অথবা সম্পূর্ণভাবে মেরে ফেলে। যখন কোনো ব্যক্তি ক্রমাগত গুনাহ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। মরিচা বৃদ্ধি করে পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সম্পূর্ণরূপে অন্তরকে ঢেকে ফেলে, তখন আল্লাহর সাথে অন্তরের সংযোগ বিছিন্ন হয়ে যায়। এই অন্তরকে পরিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন —যেভাবে একটি ধাতব বস্তু থেকে মরিচা দূর করা কঠিন।

বুখারি ও আবু দাউদ এর বিশুদ্ধ হাদিস অনুসারে অন্তরের বিভিন্ন ব্যাধি থেকে আল্লাহর রাসূল (সা.) আশ্রয়প্রার্থনা করতেন, যেমন: দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকজনের আধিপত্য থেকে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিষয় নিয়ে আশঙ্কা করলে অন্তরে উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হয়। আর অতীতের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অন্তরে দুঃখবোধ ও বিষণ্ণতা সৃষ্টি হয়। যখন ব্যক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থাকা বিষয়কে উপেক্ষা করে তখন এটা তার অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, আর অক্ষমতা হতে অপারগতার সৃষ্টি। অপারগতা যদি ইচ্ছাশক্তির অভাবে ঘটে তাহলে সেটা অলসতা। দৈহিক (ক্ষতির) কারণে অনাগ্রহী হলে সেটা কাপুরুষতা, আর সম্পদের কারণে (অনাগ্রহী) হলে কৃপণতা। ঋণী ব্যক্তির উপর পাওনাদার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে, আর যারা বিনা অজুহাতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে তারা অন্যকে পদাবনত বা জুলুম করতে চায়।[৪৪]

গুনাহের আরেকটি ক্ষতি হলো ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া। পাপ ইলমের প্রদীপ নিভিয়ে দেয়, মনকে দূষিত করে, অন্তর্দৃষ্টি হরণ করে। এমনকি সামনে সত্য উপস্থাপন করলেও সর্বগ্রাসী অন্ধকারের কারণে তারা সেটা চিনতে পারে না। তারা কুফর, বিদআত ও পথভ্রষ্টতার সংশয়ে নিমজ্জিত থাকে। গুনাহগারের অন্তর সর্বদা উদ্বিগ্ন ও পেরেশান থাকে। সে আল্লাহ ও অন্যান্য মানুষদের থেকে **নিজেকে একাকী অনুভব** করে। বিশেষত নেক ব্যক্তিদের থেকে তার নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধি পেতে থাকে যতক্ষণ না সে পুরোপুরি শয়তানের অনুচরদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যায়। তখন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান থেকে সে আর কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা যত ক্ষতিকর ও মন্দ অভিজ্ঞতা অর্জন করি, এগুলো ঘটে আমাদের নিজেদের গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে।[৪৫] আল্লাহ বলেছেন,

> 'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।' (সূরাহ শুরা, ৪২:৩০)

আখিরাতে কাফিরদের শাস্তি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

> 'এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুতঃ এটি এ জন্য যে, আল্লাহ বান্দার উপর যুলুম করেন না।' (সূরাহ আনফাল, ৮:৫১)

---

[৪৪] Ibid., pp. 100-101.
[৪৫] Ibid., pp. 57-58.

গুনাহের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো জীবন থেকে আল্লাহর সুরক্ষা ও নিয়ামত উঠে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি দুআ ছিল এরকম, (তিনি বলতেন), 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, তোমার নিয়ামত সরে যাওয়া, তোমার ক্ষমা ওলটপালট হয়ে যাওয়া, তোমার আকস্মিক শাস্তি এবং তোমার সব রকমের অসন্তুষ্টি থেকে।' (মুসলিম)

২.১৮ নফসের পরিশুদ্ধি

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে ভালো-মন্দ উভয় কাজের সক্ষমতা প্রদান করেছেন। এরপর বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় যে তারা কোনো ধরনের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। কোনো কাজকে সমর্থন করে এবং কোনো কাজে বাধা প্রদান করে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই সফল যারা নিজেদের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে এবং ভালো কাজের প্রবণতাকে অনুসরণ করেছে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।' (সূরাহ শামস, ৯১:৭-১০)

বস্তুত মানুষের জীবনে দুটি রাস্তা থাকে; একটি হলো আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করা ও উন্নত মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো। এটি আত্মশুদ্ধির পথ এবং ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা। অন্য পথটি নিজেকে দূষিত করার পথ। ঐ পথে গমন করলে মানুষ আল্লাহর নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রবৃত্তির নিচু কামনা-বাসনা অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে দূষিত করে ফেলে। যদি মানুষ উত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে জীবনকে কাজে লাগায় তবে তারা সঠিক পথ অনুসরণ করল। তখন সে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অন্তর্ভুক্ত হবে। ভালোকাজের প্রতি এই সহজাত ঝোঁক পূরণের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বে কোনো সংঘাত বা হতাশা থাকবে না। তারা উত্তম মানসিক ও আবেগিক স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারবে, নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, যেমন- হিংসা, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি।

অপরদিকে যদি আল্লাহর নির্দেশনাকে অস্বীকার করে এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, তবে মানুষ ধ্বংসের পথে পরিচালিত হবে। তারা মানুষরূপী শয়তানে পরিণত হবে। নিজের ব্যক্তিত্বে নানারকম আন্তঃসংঘাত ও মানসিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এ বিষয়ে আলোচনা করে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে তারা কেবল নিজেদের ক্ষতি করে,

> '... যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। ...' (সূরাহ তালাক, ৬৫:১)

- অন্যত্র বলেছেন,

  ‘যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।’ (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৪৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

  ‘আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ...’ (সূরাহ হুদ, ১১:১০১)

জাহান্নামের রাস্তা সহজ। কেননা, সেটি প্রবৃত্তির নিচু কামনা-বাসনা দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। নফসের সেসব তাড়না সহজেই উদ্দীপ্ত করা যায় এবং মানুষের কাছে আনন্দদায়ক বলে ভ্রম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে রাখা হয়েছে দুঃখ কষ্টের আড়ালে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

তুলনামূলকভাবে জান্নাতের রাস্তা বেশ চ্যালেঞ্জিং। কেননা, এই পথে চলতে হলে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও অন্যান্য সদগুণের প্রয়োজন হয়। নফসের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা ও মুক্তি অর্জিত হয়। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে উত্তম বিষয়াদি অর্জিত হয় এবং মন্দ বিষয়াদি অবদমিত বা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। মানুষ নিজের নফসকে শিরক, কুফর, নিফাক, গুনাহ ও মন্দ কাজ দূর করতে চেষ্টা করে এবং বিশুদ্ধ ঈমান, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আমলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করে।[৪৬] এভাবে (হাদিসে বর্ণিত) ‘ইহসান’ এর পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি চলতে থাকে। ‘ইহসান’ অর্থ এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি। আর তাকে দেখতে না পেলেও এই বিষয়ে অবগত থাকা যে তিনি অবশ্যই আমাদের দেখছেন। কেননা, তিনি সর্বদ্রষ্টা। এটি দুনিয়াতে অর্জিত আত্মশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তর। ইবাদাতের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হতে পারে, যেমন- সালাত, সিয়াম ও দান সাদাকাহ। আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা, সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করা অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

কলবের পরিশুদ্ধি: নফসের পরিশুদ্ধির সাথে কলবের পরিশুদ্ধির বিষয়টিও জড়িত। এটি অর্জন করা যায় আল্লাহর প্রতি ভয়, ভালোবাসা, তার আদেশের আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। ড. জামাল জারাবযো বলেছেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারবে, তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করবে, ভালোবাসবে, ভয় করবে, তাঁর উপর আশা-ভরসা স্থাপন করবে এবং এসকল গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিপূর্ণ করবে; ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর পরিশুদ্ধ হতে পারে না। এটাই

---

[৪৬] Zarabozo, 2002, p. 79.

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এর প্রকৃত বাস্তবতা। যতক্ষণ পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসা, মহিমা ঘোষণা ও আত্মসমর্পণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর পরিশুদ্ধ হবে না। এবং... অন্তর পরিশুদ্ধ হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের অনুসারী হবে ও ব্যক্তির আমলগুলোও পরিশুদ্ধ হবে।[৪৭]

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

পাঁচটি বিষয়ে থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জন করা যায়,

(১) শিরক; কেননা এটি আল্লাহর একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক,

(২) বিদআত; এটি রাসূলের সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক,

(৩) কামনা বাসনা; এটি আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সাথে সাংঘর্ষিক,

(৪) গাফলতি; আল্লাহর স্মরণের সাথে সাংঘর্ষিক এবং

(৫) আসক্তি; ইখলাস (আন্তরিকতা) এর সাথে সাংঘর্ষিক।[৪৮]

২.১৯ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও জবাবদিহিতা

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে যে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষকে দেয়া একটি সম্মান। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ ফেরেশতাদের থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে। তবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিরঙ্কুশ নয়, এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'বলুন; সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।' (সূরাহ কাহাফ, ১৮:২৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।' (সূরাহ ইনসান, ৭৬:৩)

দ্বীনে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। কাউকে জোরপূর্বক আল্লাহর আদেশ-নিষেধের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা যায় না। এটা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেন। যদি অন্তর আত্মসমর্পণ না করে তাহলে বাহ্যিক আত্মসমর্পণের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ বলেন,

> 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৫৬)

---

[৪৭] Zarabozo, 1999, p. 470.
[৪৮] al-Jawziyyah, 2006, p. 148.

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, কিছু মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও বাছাই ক্ষমতার মাধ্যমে ঈমান আনবে এবং উত্তম আমল করবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। বিপরীতে কিছু মানুষ কুফরি করবে ও বদ আমল করবে। এটাও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও বাছাইয়ের ক্ষমতার মাধ্যমে করবে। এরপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তিনি বলেছেন,

> 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরাহ যিলযাল, ৯৯:৬-৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবেঃ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।' (সূরাহ আরাফ, ৭:৪৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আজাব ভোগ কর।' (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:১৪)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা ও বোধশক্তি প্রদান করেছেন। কারো জবাবদিহিতা নেয়ার পূর্বে তার মধ্যে এই যোগ্যতা থাকা জরুরি, কেননা যদি কারো বোধশক্তি না থাকে কিংবা ভালো-মন্দ পৃথক করার ক্ষমতা না থাকে তবে তাদেরকে কোনো কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। সেক্ষেত্রে তাদেরকে জবাবদিহিতা করা অন্যায়, আর আল্লাহ কখনো অন্যায় করেন না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো **জ্ঞান-বুদ্ধি।** ইসলামে জ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এটি আমাদেরকে ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি পৃথক করতে সাহায্য করে। জ্ঞান ব্যতীত আমরা গোলকধাঁধায় হতবুদ্ধি হয়ে যাব। সঠিক পথ খুঁজে হয়রান হবো। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নাজিল করে আমাদের উপর রহমত করেছেন যেন আমরা সহজে ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের পথ খুঁজে নিতে পারি। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহের মধ্যে জ্ঞান অন্যতম। জ্ঞান ও বোধশক্তি কাজে লাগানোর মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কোনো পথ অনুসরণ করতে হবে।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে কার্যকর হয়। ব্যক্তির একক ইচ্ছায় কিছুই সংঘটিত হয় না। আল্লাহ তাকদীরে যা নির্ধারণ করেছেন তাই ঘটে। তিনি বলেছেন,

> 'এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।
>
> আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোনো অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের জন্যে তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।' (সূরাহ ইনসান, ৭৬:২৯-৩১)

২.২০ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, জবাবদিহিতা ও তাকদির

যে বিষয়ে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেটা তাকদীরে নির্ধারিত হলেও তার জন্য আমাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু আমরা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি ও যা আমল করি সেগুলোর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে। তাকদীরে নির্ধারিত বিষয়ের জন্য আমাদের প্রশ্ন করা হবে না, বরং আমাদেরকে যেসব আদেশ-নিষেধ প্রদান করা হয়েছে সেজন্যে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ (ইচ্ছা) করেছেন আর যা হুকুম(আদেশ) করেছেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি যা নির্ধারণ(ইচ্ছা) করেছেন সেটা গোপন রেখেছেন আর যা হুকুম করেছেন সেগুলো বিস্তারিত বিধি-নিষেধ প্রকাশ করেছেন।

আমৃত্যু আমরা কি করব সেটা আল্লাহ জানেন এবং সেগুলো কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে; এটি আমাদের অর্পিত দায়িত্ব এড়ানোর পক্ষে কোনো গ্রহনযোগ্য অজুহাত নয়। আল্লাহ তার সর্বব্যাপী জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন তাঁর সৃষ্টি কী কাজ করবে; এখানে জোর-জবরদস্তির কোনো প্রয়োগ নেই।

কদর অনুসারে (তাকদির বা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য) আমাদের জীবনে নানা বিপদাপদ, বালা-মুসিবত আসে, যেমন- দারিদ্র, রোগব্যাধি, প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি। এরপর যদি মুমিনরা ধৈর্যশীলতার সাথে এসব বিপদাপদ কবুল করে এবং ভাবে যে এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুসারে এসেছে, তখন প্রকৃত ঈমান ফুটে উঠে। উল্লেখ্য, ব্যক্তির ভুলত্রুটি বা গুনাহকে তাকদীরের দোহাই দিয়ে বেঁচে যাওয়ার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে গুনাহগারকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রর্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।' (সূরাহ মুমিন, ৪০:৫৫)

এ আয়াতে আল্লাহর রাসূলের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে, তবে এটি সকল মুমিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সকল ঈমানদারকে আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। নবিরা সকল গুনাহ থেকে আল্লাহর মাধ্যমে সুরক্ষাপ্রাপ্ত ও মাসুম; তাদের সাধারণ মানবিক ভুল ধর্তব্য নয়। সুতরাং, সাধারণ ফর্মুলা হলো মানুষ নিজেদের কাজ

ও সিদ্ধান্তে কদরের দোহাই দিতে পারে না। কেবলমাত্র মানবিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরের বিষয়গুলো কদরের উপর আরোপ করা যায়। কাফিররাও নিজেদের অপরাধের অজুহাতে তাকদীরের দোহাই দিতে পারবে না- এই মর্মে কুরআন থেকে দেখতে পাই, কাফিররা আখিরাতে তাদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং কোনো অজুহাত দেখাতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেছেন,

> 'যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবেঃ হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ তাআলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।' (সূরাহ্ মুলক, ৬৭:৬-১১)

গুনাহ্ করে বা ফরজ আমল পালনে ব্যর্থ হয়ে তাকদীরের (কদর) দোহাই দেয়া মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যথায় এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর বিধি-বিধান অর্থহীন এবং কোনো বিচার, পুরস্কার বা শাস্তি ঘটবে না অথবা ঘটলেও অন্যায়ভাবে ঘটবে! আর এটি আল্লাহর রহমত ও ন্যায় বিচারের সাথে মোটেও মানানসই নয়।

মুশরিকরা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করার পক্ষে কদরের দোহাই দিতে চায়। তারা যুক্তি পেশ করে বলে যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা তাঁর আনুগত্য করত। 'যদি তিনি চাইতেন' বলার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা বোঝাতে চায়, যেন তিনি তাদেরকে অবাধ্যতা করার হুকুম করেছেন! তাদের এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন না। আল্লাহ্ বলেন,

> 'এখন মুশরেকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুনঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যা আমাদেরকে দেখাতে পার। তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।' (সূরাহ্ আনয়াম, ৬:১৪৮-১৪৯)

যদি গুনাহ্, অবাধ্যতা ও অনৈতিকতার পক্ষে তাকদিরের অজুহাত প্রদান করা বৈধ হত তবে জাহান্নামী ব্যক্তিরা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সামনে দেখার পর অবশ্যই তাকদীরের দোহাই দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতো। কিন্তু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তারাও তাকদীরের অজুহাত প্রদর্শন করবে না বরং বলবে,

'... হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি...' (সূরাহ ইবরাহিম, ১৪:৪৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

'এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারন করবে। তোমাদের সামনে কি আমার আয়াত সমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দূর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব।' (সূরাহ মুমিনুন, ২৩:১০৩-১০৭)

নবি-রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল মানুষদের সতর্ক করা ও উপদেশ প্রদান করা এবং যারা হিদায়াত গ্রহণে অস্বীকার করত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা। তাদের মিশন ছিল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদেরকে কঠোর শাস্তির সতর্কবার্তা প্রদান করা। **সুতরাং আল্লাহর অবাধ্যতা করার পক্ষে কাফিরদের জন্য বিচার দিবসে কোনো অজুহাত অবশিষ্ট থাকবে না।** যদি গুনাহের পক্ষে তাকদীদের অজুহাত দেয়া বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হতো তবে রাসূলগণ তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতেন না। বরং সেক্ষেত্রে নবি-রাসূল পাঠানোর কোনো অর্থই হয় না। আল্লাহ বলেছেন,

'সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।' (সূরাহ নিসা, ৪:১৬৫)

• অন্যত্র বলেছেন,

'বলুনঃ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া।' (সূরাহ নূর, ২৪:৫৪)

২.২১ নিয়তের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে, তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্য অথবা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।' (বুখারি ও মুসলিম)

এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক হাদিসসমূহের অন্যতম। এটি মানুষের প্রত্যেকটি যৌক্তিক আমলের সাথে প্রযোজ্য যেমন- প্রত্যেক কথা, কর্ম, ফরজ কিংবা নফল কাজ এই হাদিসের উপর নির্ভরশীল।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) নিয়তকে সংজ্ঞায়ন করেছেন মানুষের কাজের পেছনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা সম্পর্কে। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শুরুতেই অভিপ্রায় ঠিক না করে কোনো কাজ করেন না।[৪৯] লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ, দৃঢ় সংকল্প পোষণ করা ইত্যাদি নিয়তের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যা করার নিয়ত করে তা সম্পাদন করে, যদি না সেই ইচ্ছা প্রতিহত করার মতো বাধা থাকে কিংবা নিয়তের পরিবর্তন হয়।[৫০] মনে রাখবেন, নিয়তের স্থান অন্তরে(ক্বলব) জিহবায় নয়।

তিন প্রকার নিয়ত রয়েছে; (১) উত্তম দ্বীনি নিয়ত, (২) দ্বীনি বিবেচনায় নিরপেক্ষ নিয়ত এবং (৩) মন্দ নিয়ত। হাদিস থেকে আমরা জানি, মানুষ নিয়ত অনুসারে পুরস্কার লাভ করবে। যদি ভালো নিয়ত করে তবে ফলাফল ভালো হবে আর মন্দ নিয়ত করলে মন্দ ফলাফল লাভ করবে।[৫১] নিয়তের ভিত্তিতে কাফির থেকে মুমিন এবং গুনাহগার থেকে নেক ব্যক্তি পৃথক হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই ব্যক্তির কাজ হুবহু একই রকম হলেও যদি দুজনের নিয়ত দুই রকম হয়, তবে ফলাফলে ভিন্নতা আসবে। একই আমল করলেও অন্তরে লুকানো নিয়তের ভিত্তিতে কাউকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন অথবা কাউকে শাস্তি প্রদান করবেন।

আল্লাহ তাআলা কেবল সেসব আমল কবুল করেন ও পুরস্কৃত করেন যা ইখলাসের সাথে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যেই করা হয়। বস্তুত ইসলামি শরিয়াহ অনুসারে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো আমল সম্পাদন করা হয়, সেটা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটি সাধারণ বৈধ (মুবাহ) আমলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদি আমলকারী ব্যক্তি কোনো বৈধ কাজকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে পালন করে।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) উল্লেখ করেছেন, যারা নিজেদের বৈধ (মুবাহ) আমলগুলোকে ইবাদাতে পরিণত করে তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত সবচেয়ে বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে চিনতে পেরেছেন, তারা নিজেদের দৈনন্দিন সাধারণ রুটিনমাফিক কাজগুলোকেও ইবাদাতে রূপান্তরিত করেন; আর ওদিকে, আম জনতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা ইবাদাতের কাজগুলোকেও রুটিন বানিয়ে ফেলেছে![৫২]

নিয়ত এমন এক আমল যা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি পালনে সক্ষম। নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জনে, ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসব কাজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম তা অনুসরণ

[৪৯] Sadlan, al-Niyyah (pp. 98-99) as quoted in Zarabozo, 1999, p. 123.
[৫০] Zarabozo, 1999, p. 123.
[৫১] Ibid., p. 136.
[৫২] Ibid., p. 147.

করত হবে, যেমন- ইবাদাতের মাধ্যমে, সৃষ্টিজগতের উপর আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা, তাঁর গুণবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করা ইত্যাদি। এভাবে আমরা আরও অনুগত ও মুখলিস বান্দা হতে পারব। তখন আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করা সহজ হবে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সন্তোষজনক কাজগুলোর দিকে নফস স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত করবে।[৫৩]

নিয়তের শুদ্ধতা অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন,

> 'আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।' (সূরাহ যারিয়াত, ৫১:৫৬)

সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা ও না করার মধ্যে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো নিয়তের বিশুদ্ধতা। এর মাধ্যমেই অংশীদার সাব্যস্ত করে আল্লাহর ইবাদাত করা (শিরক) থেকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত (তাওহীদ) পৃথক হয়।[৫৪]

মানব প্রকৃতির সারকথা

সারমর্মে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন একক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অন্য সব সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে,

১। জন্মগতভাবে বিশুদ্ধ নফসের অধিকারী হওয়া, যা ভালো-মন্দ উভয় কাজের সক্ষমতা রাখে।

২। একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন ও ইবাদাতের সহজাত বৈশিষ্ট্য (ফিতরাত)

৩। চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তি, মন ও বিবেক ব্যবহারের ক্ষমতা।

৪। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে মন্দ থেকে উত্তম পথ বাছাইয়ের ক্ষমতা। আরও রয়েছে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি।

৫। গৃহীত সিদ্ধান্ত ও আমলের দায়দায়িত্ব গ্রহণ, এটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও সক্ষমতার সাথে সংযুক্ত।[৫৫]

---

[৫৩] Ibid., p. 152.
[৫৪] Ibid., p. 156.
[৫৫] Zarabozo, 2002, p. 110.

||অধ্যায় তিন||

ব্যক্তিত্ব

যে স্থায়ী প্যাটার্ণ বা পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি নিজেকে এবং নিজের চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতাকে চারপাশের পরিবেশের সাথে সংযুক্ত করে সেটাই ব্যক্তিত্ব। এভাবেই ব্যক্তিত্বের সহজ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। সাধারণত আমরা একটি ধারাবাহিক ও নিজস্ব (ইউনিক) পদ্ধতিতে চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের সাথে প্রতিক্রিয়া করি। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মতো ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও আমরা সবাই স্বতন্ত্র।

৩.১ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণীয় অনুষঙ্গ। বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এগুলো ব্যাপকভাবে ফুটে উঠে। কোনো ব্যক্তি যেভাবে চারপাশের পৃথিবীর সাথে লেনদেন করে সেগুলোই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে।

মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় এমন কিছু তথ্য উঠে এসেছে যেগুলো বহু শতাব্দী আগেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে নাজিল করেছেন। নানান প্রমাণের মাধ্যমে জানা যায় যে আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও অনন্য 'মেজাজ' নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। এটি আমাদের বিকাশমান ব্যক্তিত্বের নানা বিষয়-আশয়কে প্রভাবিত করে। মেজাজ (টেম্পারমেন্ট) এর সংজ্ঞায় বলা হয়: 'ব্যক্তির চরিত্রে অন্তর্নিহিত সেসব ধারাবাহিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা তার কাজকর্মের প্রকাশভঙ্গি, প্রতিক্রিয়া, আবেগ, সামাজিকতা ইত্যাদি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে।'[১] আমাদের ব্যক্তিত্বের উৎস আমাদের জেনেটিক কোড, যার নকশায় বিকশিত হয় মস্তিষ্ক। জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই শিশুর মেজাজগত স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হতে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, পারস্পরিক লেনদেন, পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া ইত্যাদি প্রভাবিত হয়। পরিবেশের প্রভাবেও ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হতে পারে। মানুষের এই সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

---

[১] Eder, R. A. & Mangelsdorf, S. C, 1997, Basis of Early Personality Development: Implications for the Emergent Self-Concept, in Hogan, R., Johnson, J. A., & Briggs, S. R. (Eds.), Handbook of Personality Psychology, San Diego, CA: Academic Press, p. 210.

'মূসা বললেন, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে যোগ্য 'আকৃতি দান' করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।' (সূরাহ ত্বহা,২০:৫০)

যদিও 'আকৃতি দান'-এর শব্দ দ্বারা সবার মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ (কমন) বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝানো হয়েছে। তবে এটি প্রত্যেকের ইউনিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেগুলোর ফলে আমাদের একেকজনের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়, মানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনকে দেখি ও বুঝি। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর মহান পরিকল্পনার অংশ। যেমন, আমরা দেখি কিছু মানুষ এক্সট্রোভার্ট বা বহির্মুখী স্বভাবের হন যারা সামাজিক মেলামেশায় আগ্রহবোধ করেন। আবার কিছু মানুষ রয়েছেন যারা ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী স্বভাবের।

ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু দিক জিনগত হলেও, তার সাথে অতীত অভিজ্ঞতা ও গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও আমাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আগেই বলেছি, আল্লাহ মানুষকে ভাল-মন্দ উভয় কাজের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এখানেই মানুষের পরীক্ষা যে সে কোনো ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করবে ও বিকাশ ঘটাবে, আর কোনো ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে ও নির্মূল করবে।[২] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।' (সূরাহ শামস, ৯১:৭-১০)

আমরা যে সিদ্ধান্তগুলো নিই, সেগুলোই ফুটে ওঠে আমাদের আচরণ (কাজ), চিন্তা ও আবেগের ভিতর দিয়ে।

উপরের আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিত্ব (পারসনালিটি) পরিবর্তিত বা অভিযোজিত হতে পারে, বিশেষত কল্যাণময় পথের দিকে। মানুষ নিছক জেনেটিক গঠন বা পরিবেশের 'ভিকটিম' নয়। বরং একটি স্বাধীন কার্যক্ষম সত্তা যারা নিজের পূর্ণ সামর্থ্যের বিকাশ ঘটাতে পারে। জেনেটিক গঠন বা পরিবেশের দোহাই দিয়ে আমরা আমাদের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা এড়াতে পারিনা। উদাহরণস্বরূপ; যদি কেউ বলে সে জেনেটিক গঠনের কারণে তার পিতার মতো আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, এতে তার দুর্ব্যবহারের দোষ মাফ হয় না, নৈতিক স্খলনের অপরাধ কিংবা দায় থেকে সে বেঁচে যায় না। এটি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা এবং তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় রসদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ দয়ালু এবং তিনি আমাদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো ভালোভাবেই জানেন ও বোঝেন। তিনি বিচার করার সময় এগুলো আমলে নিয়েই বিচার করবেন।

[২] Zarabozo, 2002, p. 60.

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের বিভিন্ন ঘটনাতে এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি উঠে এসেছে। সাহাবিরা এক সময় অমুসলিম ছিলেন, নিজেদের খেয়ালখুশি, কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছেন, গুনাহে লিপ্ত থেকেছেন কিন্তু (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে) নিজেদের ব্যক্তিত্বে ঠিকই পরিবর্তন এনেছেন। এরপর নিজেদেরকে শুধরে নিয়ে নেক আমলওয়ালা, উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন নারী-পুরুষে পরিণত হয়েছেন। তারা দুনিয়ার বদলে আল্লাহর ইবাদাতকে প্রধান ফোকাসে নিয়ে এলেন। ব্যক্তিত্বের এই পরিবর্তন তাদের আচরণ ও স্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন- উমর ইবনুল খাত্তাব একসময় কট্টর ইসলাম বিরোধী ও রাসূলের দুশমন ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজেকে এমনভাবে বদলে নিয়েছিলেন যে তিনি সর্বাপেক্ষা নেককার ও ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিত্বের অন্যতম হয়ে গেলেন, রাসূলের ব্যাপক ভালবাসাপ্রাপ্ত হলেন।

৩.২ মুমিনের ব্যক্তিত্ব

সত্যিকার মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (পার্সোনালিটি) অন্যান্য মানুষদের থেকে পৃথক। তাদের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা বাকিদের মতো নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণের সাথে তারা আল্লাহর হিদায়াত অনুসরণ করেন। উন্নত ও মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নে মুজাহাদা (সংগ্রাম) করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে—যার চরিত্র সর্বোত্তম।' (আবু দাউদ)। আরেক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার আমলনামায় সচ্চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোনো আমলই হবে না।' (বুখারি)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি বলব তোমাদের মধ্যে কাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি এবং কে বিচার দিবসে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে?' সাহাবিরা চুপ থাকলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রশ্ন দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর তারা বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে বলুন!' তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সর্বোত্তম।' (বুখারি)

এ সকল হাদিস অনুসারে একজন মুসলিম উত্তম আমল সম্পাদন ও নেক গুণাবলী অর্জনে খুবই মনোযোগী থাকেন। তারা নিজেদের অবস্থা উন্নয়নে কখনো ক্লান্ত হন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হলো নিজেরা দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ও অপরকে শেখানো। কেননা, ইলমের মাধ্যমেই মানুষ ভালো-মন্দ পৃথক করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও আত্ম-উপলব্ধির জন্য তিনি আমাদের 'রোল মডেল'। আল্লাহ তাআলা তাঁর চরিত্র আলোচনা করে বলেছেন,

> 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরাহ ক্বালাম, ৬৮:৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।' (বুখারি)

রাসূলুল্লাহ (সা.) নফসের পরিশুদ্ধির জন্য ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা বাতলে দিয়েছেন। যেহেতু এই পথ আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের সহজাত প্রবণতার দিকে পরিচালিত করে, ফলে আমাদের ব্যক্তিত্বে কোনো হতাশা বা সংঘাত সৃষ্টি হয় না। হিংসা, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ দমনের মাধ্যমে আমরা উন্নত মানসিক ও আবেগিক সুস্থতা অর্জন করতে পারি।

৩.৩ ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

মুমিনরা নিজেদের নফসকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে ও নিজেরা সরল পথে চলে। এ কারণে তারা উত্তম আচরণ নিজেদের ভিতর লালন করে। সময়ের সাথে সাথে পথ পরিক্রমায় এসব উন্নত আচরণ তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, এরপর এগুলো তাদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। আল-জাযায়েরি বলেছেন,

> 'যখন এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরে কারণে সদগুণ ও সত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে, উত্তম আমলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, দান সাদাকাহ ও কল্যাণমূলক কাজ করার বাসনা মনে জাগে, ভালো কাজে আনন্দ ও মন্দ কাজে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়, আর এগুলো স্বভাবের অংশ হয়ে অনুপ্রেরণা প্রদান করতে থাকে, তখন এটাই 'উত্তম চরিত্রের' সংজ্ঞা।[৩]

এসব ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।[৪] মুমিনরা যেসব বৈশিষ্ট্য উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তার মধ্যে রয়েছে দয়া, নম্রতা, সত্যবাদিতা, বিনয়, সবর, ন্যায় বিচার ইত্যাদি।

৩.৩.১ দয়া, নম্রতা ও করুণা : দয়া এবং নম্রতা এমন দুটি মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যার অনুপস্থিতিতে একজন ব্যক্তি নানা ধরনের মন্দ বিষয়ের দিকে পরিচালিত হয়। একজন ব্যক্তি যাদের সাথে লেনদেন করে তাদের প্রত্যেকের সাথে দয়ার সদগুণ বিকশিত করা উচিত, যেমন- স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, পশুপাখি, সামগ্রিক পরিবেশ এবং সমাজ। বেশ কয়েকটি হাদিসে দয়া ও নম্রতার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নম্রতা যে কোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোনো বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।' (মুসলিম)।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে আইশা, আল্লাহ তাআলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার মাধ্যমে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার মাধ্যমে দান করেন না; আর অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমেও তা দান করেন না।'(মুসলিম)

---

[৩] al-Jaza'iry, A. B. J., 2001, Minhaj al-Muslim, Riyadh: Darussalam, Vol. 1, p. 287.

[৪] See for example al-Hashimi, The Ideal Muslim and The Ideal Muslimah (Riyadh: International Islamic Publishing House).

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।' (মুসলিম)

৩.৩.২ সততা ও সত্যবাদিতা : ইসলাম সত্যের ধর্ম। ইসলামের অনুসারী মুসলিমদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো সততা ও সত্যবাদিতা। আল্লাহ বলেছেন,

> 'যারা সত্য নিয়ে আগমন করছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো খোদাভীরু।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সত্য আঁকড়িয়ে ধর। সত্যবাদিতা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা, সততা নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করলে ও সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থাক! কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ নিশ্চিত (জ্যহান্নামের) অগ্নির দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হলে তার নাম আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।' (মুসলিম)

সত্যবাদিতা নানাভাবে প্রকাশ পায়, যেমন-[৫]

১। কথায় সত্যবাদিতা: মুমিন কোনো কথা বলার আগে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে সে সত্য বলছে।

২। লেনদেন ও পারস্পরিক মেলামেশায় সত্যবাদিতা: মুমিন ব্যক্তি লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা, জালিয়াতি পরিহার করে চলে।

৩। ওয়াদা পূরণে সত্যবাদিতা: সত্যবাদিতার আরেক নিদর্শন হলো প্রতিশ্রুতি পূরণে সত্যবাদিতা।

৪। ভান-ভণিতা পরিহার করা: যা ভেতরে নেই তা বাইরে প্রদর্শন করা পরিহার করা।

৩.৩.৩ বিনয় : বিনয় উত্তম গুণসমূহের অন্যতম। তবে এর বিকাশ ঘটানো বেশ চ্যালেঞ্জিং। আল্লাহ বিনয়ী বান্দাদের প্রশংসা করেছন,

> **'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।' (সূরাহ মায়িদা, ৫: ৫৪)**

---

[৫] al-Jaza'iry, 2001, pp. 330-331.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ কর, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবে না এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না।' (মুসলিম)। আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দানে সম্পদ কমে না। আল্লাহ যাকে ক্ষমার গুণে সমৃদ্ধ করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, মহামহিম আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করেন।' (মুসলিম)

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বিনয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন যা তাঁর জীবনের নানা ঘটনায় ফুটে উঠেছে। হাসান আল-বাসরি এক ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, 'এক গরমের দিনে উমর বাইরে বের হলেন। (রোদ থেকে বাঁচার জন্য) তিনি নিজের চাদর মাথার উপরে ধরেছিলেন। তখন এক যুবক গাধায় চড়ে তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'হে যুবক! আমাকে তোমার বাহনের পিছনে উঠিয়ে নাও।' যুবকটি গাধা থেকে নেমে বলল, 'আপনি উঠুন, হে আমিরুল মুমিনীন!' উমর বললেন, 'না তুমিও উঠ। আমি তোমার পেছনে বসছি। তুমি কি আমাকে অধিক আরামদায়ক স্থানে (সামনে) বসতে দিতে চাও, আর নিজে কম আরামদায়ক স্থানে (পেছনে) বসবে?' তিনি যুবকের পেছনে বসলেন। এভাবে মদিনার ভেতর প্রবেশ করলেন। আর লোকেরা এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল।'[৬]

উরওয়া ইবনু যুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে একটি পানির কলস ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে দেখেছি।' আমি বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনার তো এ কাজ করার দরকার নেই!' তিনি বললেন, 'যখন প্রতিনিধি দল এসে আমার কথা শুনছিল ও আনুগত্য করছিল, তখন আমি কিছুটা গর্ব অনুভব করলাম। তাই আমি সেটা দমন করার ইচ্ছা করলাম।'[৭]

৩.৩.৪ সবর : সবর তথা ধৈর্য্য একজন মুসলিমের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এর বিকাশ ঘটানো জীবনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। কুরআনে নব্বইটির অধিক স্থানে সবরের আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

> 'ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাজের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৪৫-৪৬)

---

[৬] Sallabi, A. M., 2007, 'Umar ibn al-Khattab: His Life and Times, Riyadh: International Islamic Publishing House, p. 241.

[৭] Ibid., p. 242.

• অন্যত্র বলেছেন,

> ‘আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।’ (সূরাহ নাহল, ১৬: ১২৭)

সবরের একটি অর্থ নিজেকে ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকা, ‘কবুলিয়ত’ ও আত্মসমর্পণের সাথে অপছন্দনীয় বিষয় সহ্য করে যাওয়া।[৮] নিজেকে ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত রাখার অর্থ আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা, দুঃখকষ্টে পতিত হলে ধৈর্যশীলতার সাথে সহ্য করা, উত্তম বিষয়ের মাধ্যমে মন্দের মোকাবেলা করা, আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কারের আশায় ক্ষতিকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা ও মার্জনা করা। আল্লাহ বলেছেন,

> ‘বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।’ (সূরাহ যুমার, ৩৯:১০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবরের সাথে ক্ষমার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শত্রুদের দেয়া কষ্ট, কঠিন পরিস্থিতি ও বিদ্রুপের মুখে তিনি বিনয় অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘দানে সম্পদ কমে না। আল্লাহ যাকে ক্ষমার গুণে সমৃদ্ধ করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, মহামহিম আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করেন।’ (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘জেনে রেখো যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্রই রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন। ধৈর্যের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি।’ (বুখারি ও মুসলিম)

সমস্ত জীবনব্যাপী মুমিন ক্রমাগত দুটি অবস্থা অতিক্রম করতে থাকে; হয়তো সে শোকর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করে, নয়তো সবর করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘একজন মুমিনের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। (কেননা) তার সকল কাজই কল্যাণপ্রদ। মুমিন ছাড়া অন্যের অবস্থা এমন নয়। একজন মুমিনের যদি আনন্দদায়ক কিছু ঘটে তবে সে আল্লাহর শোকর আদায় করে; এতে তার মঙ্গল সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে সবর করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।’ (মুসলিম)

৩.৩.৫ ন্যায়বিচার : ন্যায়বিচারের একটি অর্থ সাম্য, ন্যায্যতা অনুসরণ এবং বৈষম্য, অসমতা ও জুলুম পরিহার করা। ব্যক্তি কিংবা সমাজ উভয়ের জন্যেই ন্যায়বিচার

---

[৮] al-Jaza'iry, 2001, p. 292.

অপরিহার্য। এটি ব্যক্তিকে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি প্রদান করে এবং সমাজকে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্ষম রাখে। আল্লাহ্ বলেন,

> 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৯০)

ন্যায়বিচার হারিয়ে গেলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং অনেক সময় নিজেদের অধিকার বুঝে পেতে সহিংসতা অবলম্বন করে।

ন্যায় বিচারের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে।[১] যেমন-

১। আল্লাহর সাথে ন্যায়বিচার: এককভাবে শরিকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর আদেশের আনুগত্য করা।

২। মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা: প্রত্যেক প্রাপকের অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা মুমিন নারী-পুরুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।' (সূরাহ হুজুরাত ৪৯;৯)।

৩। পরিবারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা: স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে কাউকে অন্যায়ভাবে প্রাধান্ না দেওয়া।

৪। কথায় ন্যায়বিচার: মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না করা।

৫। ঈমানে ন্যায়বিচার: সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বিশ্বাস না করা।

সমাজে ন্যায়বিচারের প্রভাব কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে; বর্ণিত হয়েছে যে একবার রোমের বাদশা উমর ইবনুল খাত্তাবের অবস্থা ও কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য একজন দূত প্রেরণ করল। তার প্রতিনিধিরা মদিনায় আগমন করল, এরপর তারা উমরকে খুঁজতে শুরু করল। প্রশ্ন করল, 'তোমাদের রাজা কোথায়?' তারা বললেন, 'না! আমাদের কোনো রাজা নেই কিন্তু একজন সম্মানিত আমির আছেন। তিনি মদিনার বাইরে গিয়েছেন।' ফলে রোমের বাদশার সেই প্রতিনিধি তাকে খুঁজতে বের হলো এবং উমরকে খুঁজে পেল। সে দেখল উমর মাটির উপর নিজের লাঠিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে আছেন। সেটা ছিল একটি ছোট ছড়ি যা তিনি সবসময় সাথে রাখতেন। এর মাধ্যমে তিনি কাউকে কোনো মন্দ কাজ করতে দেখলে বিরত করতেন। দূত তাকে গাছের নিচে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে অন্তরে বিনয় অনুভব করল এবং নিজেকে বলল, 'এই ব্যক্তির ভয়ে দুনিয়ার তাবৎ রাজা-বাদশাহরা ভীত! অথচ তাঁর অবস্থা কত সাধারণ! হে উমর, তুমি এত নিশ্চিন্তে ঘুমাতে

---

[১] Ibid., 2001, pp. 311-312

পারছ কারণ তুমি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছ। আর আমাদের রাজা-বাদশাহরা একেকজন জালিম। ফলে তারা সারারাত আতঙ্কিত অবস্থায় জেগে থাকে।'[১০]

৩.৪ ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান

সমসাময়িক সেক্যুলার মনোবিজ্ঞানে 'ইতিবাচক মনোবিজ্ঞান'(positive psychology) নামে একটি নতুন পরিভাষা ও ক্ষেত্র চালু হয়েছে। এটি বেশ লক্ষণীয়। এর সংজ্ঞায়ন করে বলা হয়েছে; এটি সর্বোচ্চ মানবিক কার্যক্ষমতার (optimal human functioning) বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, যার প্রাথমিক লক্ষ্য সেসব গুণ ও ক্ষমতা আবিষ্কার করা এবং প্রসার ঘটানো যা ব্যক্তি ও সমাজকে বিকশিত করে।[১১]

ইতিবাচক মনস্তত্ত্বের আবিষ্কারকগণ এর ভূমিকায় বলেন:

> '(এখানে) ইতিবাচক মানসিক অভিজ্ঞতাগুলোকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা হয়। যখন জীবন ব্যর্থ ও অর্থহীন লাগতে থাকে, তখন (ব্যক্তির) ইতিবাচক স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নিয়মনীতির মাধ্যমে জীবনমান উন্নত করার একটি সম্ভাবনা দেখা যায়।
>
> আমাদের এই বিষয়ে (মনোবিজ্ঞানে) আলোচনা-গবেষণায় আমরা প্যাথলজির (মনোরোগ) দিকটাতে অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করে এসেছি। ফলে মানবসত্তাকে আমরা যেভাবে চিনেছি, তাতে সেইসব ইতিবাচক (মনস্তাত্ত্বিক) উপাদানের ঘাটতি রয়ে গেছে, যেগুলো জীবনকে অর্থপূর্ণ ও উপভোগ্য করে তোলে। আশা, প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা, দূরদর্শীতা, সাহস, আধ্যাত্মিকতা, দায়বদ্ধতা ও অধ্যবসায় ইত্যাদি মানসিক ব্যাপারগুলোকে হয়তো এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। নয়তো অন্য নেতিবাচক প্রবণতাকে মূল ধরে নিয়ে এগুলোকে তা থেকে উৎসারিত মনে করা হচ্ছে। লেখকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, পরবর্তী শতাব্দীতে মানুষ এমন একটি বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র ও পেশা দেখতে পাবে যা সেইসব ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে কাজ করবে যেগুলো ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সমাজকে বিকশিত করে।[১২]

সামনের ছকে মানসিক শক্তিমত্তার একটি তালিকা দেয়া হলো, যা তত্ত্ববিদগণ মূলত মানব উন্নয়ন ও মেডিকেল চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করার নিমিত্তে তৈরি করেছেন।

---

[১০] Ibid., 2001, p. 313.

[১১] Myers, 2007, p. 628.

[১২] Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M., 2000, Positive psychology: An introduction. American Psychologist 55(1).

৩.৫ মানবিক শক্তিমত্তার তালিকা[১৩]

জ্ঞানীয় শক্তি

(Strengths of cognition):

১. আগ্রহ/কৌতূহল

২. জ্ঞান ও কোনো কিছু শেখার প্রতি ভালোবাসা

৩. বোধশক্তি/ বিচারক্ষমতা

৪. মৌলিকতা/ স্বাতন্ত্র

৫. ব্যক্তিগত, আবেগিক ও সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক ও নাগরিক শক্তি

(Relational and civic strengths):

১১. দয়া/উদারতা/যত্ন/পরিচর্যা

১২. দায়িত্ববোধ/ন্যায্যতা/সহনশীলতা

১৩. রসবোধ/কৌতুক

১৪. ভালোবাসা গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষমতা

১৫. নাগরিকত্ব/দায়িত্ব/আনুগত্য/জোটবদ্ধ কাজ

১৬. নেতৃত্ব

আবেগিক শক্তি

(Strengths of emotion):

৬. সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষতা মূল্যায়ন/ভক্তি/বিস্ময়/কৃতজ্ঞতা

৭. আশা/দূরদৃষ্টি/পরিকল্পনা

৮. জীবনকে ভালোবাসা/আনন্দ

ইচ্ছাশক্তি (Strengths of will):

৯. সাহস/সততা

১০. পরিশ্রম/অধ্যবসায়

যৌক্তিক শক্তি

(Strengths of coherence):

১৭. সততা/শুদ্ধতা

১৮.ভারসাম্য/পরিমিতিবোধ

১৯. আত্ম-নিয়ন্ত্রণ/আত্ম-পরিচালনা

২০. বিজ্ঞতা/প্রজ্ঞা

২১. আধ্যাত্মিকতা/জীবনের উদ্দেশ্য/বিশ্বাস/ধর্ম

৩.৬ নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

নানা ধরনের নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলো ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পুরোপুরি বিপরীত। যেমন: জোর-জবরদস্তি, হিংসা, লোভ, গর্ব, বড়াই, কোনো কিছু লুকানো, নিফাক ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে এখানে শুধুমাত্র অহংকার এবং রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৬.১ অহংকার : বিনয়ের বিপরীত হলো অংকার। আল্লাহ তাআলা অহংকারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাবধান করে বলেছেন,

---

[১৩] Seligman, M.E.P., 2000, 'Positive Clinical Psychology', in L.G., Aspinwall & U.M., Staudinger (Eds.), A Psychology of Human Strengths: Perspectives on an Emerging Field, Washington, DC: American Psychological Association.

> 'পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।' (সূরাহ ইসরা, ১৭:৩৭)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে আমাদের বড়াই, গর্ব ও অহংকার করার কোনো অধিকার নেই। কেননা, আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির বিপরীতে আমাদেরকে খুবই ক্ষুদ্র, দুর্বল এবং তুচ্ছ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অহংকার ছিল শয়তানের পতনের কারণ। সে নিজেকে আদম (আ.) থেকে উত্তম মনে করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদেরকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এরা হলো) জিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো ধরনের লোক জাহান্নামে যাবে আমি কি তোমাদের বলব না? (জেনে রাখো)! প্রতিটি নাদান, অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ইযযত-সম্মান আল্লাহর ভূষণ এবং অহংকার তাঁর চাদর। (আল্লাহ বলেন) যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে আমার সংগে বিবাদে অবতীর্ণ হবে আমি তাকে অবশ্যই শস্তি দিব।' (মুসলিম)

৩.৬.২ দেখনদারি (রিয়া): রিয়ার অর্থ দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা যেন অপরের মনোযোগ ও স্বীকৃতি লাভ করা যায়। এই কাজগুলো মৌলিকভাবে গুনাহের কাজ নয়, আল্লাহর আনুগত্যের জন্যেই সেসব কাজ করা হয় কিন্তু ভুল নিয়তের কারণে সেগুলো আল্লাহ কবুল করেন না। রিয়া মূলত মুনাফেকীর একটি পর্যায় এবং এটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেছেন,

> 'অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না।' (সূরাহ মা'উন, ১০৭:৪-৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষদেরকে ছোট শিরক হতে সতর্ক করে বলেছেন, 'তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি যা আশঙ্কা করি তা ছোট শিরক। তারা (সাহাবীরা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শিরক কি?' তিনি বললেন, 'রিয়া। বিচার দিবসে যখন আমল অনুসারে মানুষকে পুরস্কৃত করা হবে তখন মহামহিম আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের বলবেন, তোমরা তাদের কাছে যাও যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করেছিলে, আর দেখো তারা তোমাদেরকে কোনো পুরস্কার প্রদান করে কিনা।' (বিশুদ্ধ হাদিস, আহমদ)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি লোক শোনানোর ইবাদাত করে আল্লাহ তাকে বিনিময়ে 'লোক শোনানো' দেবেন। আর যে ব্যাক্তি লোক দেখানো ইবাদাত করে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে 'লোক-দেখানো' দেবেন'। (মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সব লোকের আগে যার ফয়সালা হবে সে একজন শহীদ। তাকে ডাকা হবে, আল্লাহ তাকে আপন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে নিয়ামতগুলোকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি নিয়ামতগুলোর ব্যবহার কিভাবে করেছ? সে জবাব দেবে, আমি আপনার পথে লড়াই করেছি এবং শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এই জন্য লড়াই করেছ যেন লোকেরা তোমায় বীর বলে। সেমতে তোমাকে বীর বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তাকে তার সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর একটি লোককে নিয়ে আসা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকেও তা শিখিয়েছে। সে কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তাকে উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্মরণ করতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার এসব নিয়ামতের ওপর কিরূপ আমল করেছ? সে বলবে, আমি জ্ঞান-অর্জন করেছি এবং অন্যকে তা শিখিয়েছি। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্যে জ্ঞান অর্জন করেছ যেন লোকেরা তোমায় আলিম বলে। তুমি এ জন্যে কুরআন শিখেছ যেন লোকেরা তোমায় ক্বারী বলে। সুতরাং তোমায় ক্বারী বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে এ মর্মে আদেশ করা হবে যে, তার মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ধরে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

এরপর এক ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হবে, যার প্রতি আল্লাহ প্রচুর উদারতা প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে সবরকমের মালামাল প্রদান করেছেন। তাকে নিয়ে আসার পর আল্লাহ তাকে আপন নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সে এগুলো চিনতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এ সবের মধ্যে কোনো আমলটি করেছ? সে বলবে, আমি কোনো আমলই হাতছাড়া করিনি। তুমি যেখানেই চেয়েছ, সেখানেই খরচ করেছি। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যেই এসব ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, আসলে তুমি এজন্যে ব্যয় করেছ যেন লোকেরা তোমায় দানশীল বলে। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে তার সম্মুখ ভাগের চুল ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোক। অবশেষে তাই করা হবে। (মুসলিম)

রিয়ার দুটি নিদর্শন,

১। যখন অপরের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাওয়া যায় তখন আনুগত্যের কাজ বাড়িয়ে দেওয়া আর নিন্দা-সমালোচনার মুখোমুখি হলে সেগুলো কমিয়ে দেওয়া বা বর্জন করা।

২। মানুষের উপস্থিতিতে ইবাদতের কাজে উৎসাহিত থাকা কিন্তু একাকী নির্জনে অলসতা ও উদাসীন হয়ে যাওয়া।[১৪]

---

[১৪] al-Jaza'iry, 2001, p. 354.

৩.৭ মুনাফিকের ব্যক্তিত্ব

মুনাফিকরা এক বিশেষ ক্যাটাগরীর মানুষ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। সূরাহ বাকারার শুরুতে প্রথমে মুমিনদের সম্পর্কে, এরপর কাফিরদের সম্পর্কে, এরপর মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করে আল্লাহ বলেছেন,

• 'আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।

• তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।

• তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।

• আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।

• মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

• আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।

• আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।

• বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।

• তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হিদায়াতও লাভ করতে পারেনি।'

(সূরাহ বাকারাহ, ২:৮-১৬)

সূরাহ মুনাফিকুন-এ তাদের সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে,

'মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।

এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।

আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?'

(সূরাহ মুনাফিকুন, ৬৩:১-৪)

এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের কিছু সুনির্দিষ্ট ও সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে তারা ঈমান প্রদর্শন করে অথচ ভেতরে কুফর লুকিয়ে রাখে। 'নিফাক' আরবি শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়, কোনো বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ও অশুভ ইচ্ছা লুকিয়ে রেখে বাহ্যিকভাবে একাত্মতা ও সত্যায়ন করা।[১৫] যখন তারা মুমিনদের সাথে একত্রিত হয়, তখন দাবি করে আল্লাহ ও বিচার দিবসে ঈমান রাখে। কিন্তু এগুলো তাদের মিথ্যাচার। বাস্তবে তারা এসব বিষয়ে ঈমান রাখে না।[১৬] শুধুমাত্র জিহ্বার মাধ্যমে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তর ও আমলের মাধ্যমে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে। তাদের অন্তরগুলো সন্দেহ সংশয়ে ব্যাধিগ্রস্ত।

মুনাফিকরা জমিনে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তারে ব্যস্ত থাকে। যেমন- আল্লাহর অবাধ্যতা করা ও নিষেধকৃত বিষয় পালন করা। তারা আল্লাহর আওলিয়াদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য-সমর্থন ও ভালোবাসা প্রদান করে। মুনাফিকদের প্রধান অপকর্ম হলো তারা তাদের বাহ্যিক আচরণ ও বেশভূষা দিয়ে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করে রাখে। এভাবে বাকি মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করে ও ধোঁকা দেয়। এ কারণে তারা কাফিরদের থেকেও মারাত্মক কেননা কাফিররা ভান না করে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে।[১৭]

মুনাফিকদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যাচারিতা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি, (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা খেয়ানত করে। (বুখারি, মুসলিম)

যাদের অন্তরে ঈমান রয়েছে তারাও কিছু মাত্রায় নিফাকে আক্রান্ত হতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক; উক্ত চারটির একটিও যদি কারো মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব রয়ে যায় ; (১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) চুক্তি করলে তা ভঙ্গ

---

[১৫] Ibn Kathir, 2000, Tafsir Ibn Kathir (Abridged), Riyadh: Darussalam, Vol. 1, p. 126.

[১৬] Ibid., p. 126.

[১৭] Ibid., pp. 132-133.

করে, (৩) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং (৪) ঝগড়া করলে কটূক্তি করে।' (বুখারি, মুসলিম)

মুমিনরা সবসময় নিজের ব্যক্তিত্বকে সকল ধরনের নিফাক থেকে মুক্ত রাখতে ব্যস্ত থাকে।

||অধ্যায় চার||
অন্তর ও আত্মার উপর কার্যরত বিভিন্ন শক্তি

ক্বলব(অন্তর) ও নফসের(আত্মা) উপর সবসময় বিভিন্ন শক্তি কাজ কর। কার্যকরী নানা প্রভাবক রয়েছে। এগুলো প্রধানত চার ধরনের:

১। অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়,

২। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা; যা নির্দেশিত সরল পথে অটল থাকতে সহায়তা করে,

৩। শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা; যা অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে, এবং

৪। নফসের খেয়াল-খুশি বা কামনা বাসনার অনুসরণ।

৪.১ অন্তর ও আত্মার উপর আল্লাহর প্রভাব

> আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।' (সূরাহ আনফাল, ৮:২৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসির বলেছেন, আস-সুদ্দী (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন,

'এর অর্থ হলো আল্লাহ মানুষকে তার নিজ-অন্তরের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখেন। ফলে সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনতে বা কুফরি করতে পারে না।[১]

সকল মানুষের অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলির মাঝে অবস্থান করে এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে অন্তরগুলো পরিবর্তন করতে থাকেন। পূর্বের আলোচনাতে এসেছে, 'অন্তর' এর আরবি প্রতিশব্দ 'ক্বলব' এর শব্দমূল হলো 'কা-লা-বা', এর অর্থ পরিবর্তন করা, বদলানো, রূপান্তর ইত্যাদি। মানুষের অন্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। সবচেয়ে

---

[১] Ibid., Vol. 4, p. 287.

আতঙ্কের ব্যাপার হলো যদি ঈমান থেকে কুফরে পরিবর্তন ঘটে। এমনকি আল্লাহর রাসূল (সা.) অবাধ্য অন্তরের ক্ষতি থেকে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। তিনি বলতেন, 'আদম সন্তানের ক্বলবগুলো পরম দয়াময় আল্লাহর দুই আংগুলের মাঝে থাকা একটি ক্বলবের মতো। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন।' এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! হে ক্বলবসমূহ পরিবর্তনকারী! আমাদের ক্বলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।' (মুসলিম)

আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভের মাধ্যমে বান্দা নিজের অন্তর ও আমলে ইখলাস (আন্তরিকতা) অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে সে বিপর্যয়ের মুখে দৃঢ়পদ থাকতে পারে, করতে পারে সবর এবং শুকরিয়া আদায় করতে পারে প্রাচুর্য, সচ্ছলতার সময়ে।

শাহর ইবনু হাওশাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন বেশির ভাগ সময় কি দুআ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, বেশির ভাগ সময় তিনি এই বলে দুআ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, তোমার দ্বীনের আমার অন্তরকে অটল রেখো।"

এরপর তিনি (উম্মে সালামাহ) বলেন, আমি জানতে চাইলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কেন প্রায়শই এই দুআ করেন, 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, তোমার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে অটল রেখো?' তিনি বললেন, 'হে উম্মে সালামা! এমন কোনো মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দৃঢ় রাখেন আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন।' হাদিসের বর্ণনাকারী (মুয়াজ) এরপর তিলাওয়াত করলেন, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা...(সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ৮)।'

(সহিহ হাদিস, তিরমিযি)।

এই হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহর আংগুলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত করেন আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন। আল্লাহ তাঁর ন্যায়বিচার ও করুণা অনুসারে কখনোই হিদায়াতযোগ্য ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতায় চালিত করেন না আর যে হিদায়াতের যোগ্যতা রাখে না তাকে হিদায়াত দেন না। আল্লাহ বলেন,

> 'যার জন্যে শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (সূরাহ যুমার, ৩৯:১৯)
>
> 'আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।' (সূরাহ তাগাবুন, ৬৪:১১)

প্রত্যেক সালাতে যখন আমরা সূরাহ ফাতিহা পাঠ করি আমরা আল্লাহর হিদায়াত প্রার্থনা করি,

> 'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (সূরাহ ফাতিহা, ১:৬-৭)

যদি আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত না দিতেন তাহলে এই দুআ করার কোনো প্রয়োজন হতো না। সূরাহ বাকারায় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন হিদায়াত তাঁর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি বলেছেন,

> 'এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,
>
> যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে
>
> এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।
>
> তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।'
>
> (সূরাহ বাকারাহ, ২:২-৫)

এই আয়াতে হিদায়াতপ্রাপ্তদের সেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যার কারণে তারা সঠিক পথের উপরে রয়েছে। আরও জানানো হয়েছে, হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ বলেন,

> '... অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।'
>
> (সূরাহ বাকারাহ, ২:২১৩)
>
> 'আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:২৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

> '...আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।' (সূরাহ শুরা, ৪২:১৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।
>
> আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন।...' (সূরাহ ইনসান, ৭৬:২৯-৩১)

'...তারা (জান্নাতীরা) বলবে, 'আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন।...' (সূরাহ আরাফ, ৭:৪৩)

পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার অনুসারে আল্লাহ কেবল তাদেরকেই হিদায়াত করেন যারা এর যোগ্য। বিভিন্ন আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা আল্লাহর কাছে হিদায়াত কামনা করে এবং দ্বীনের পথে টিকে থাকার চেষ্টা করে, দ্বীনকে বোঝার চেষ্টা করে, ইলম অর্জন করে, আনুগত্য করে ও ঈমান আনে তারাই হিদায়য়াতের যোগ্য। শুরুতেই কেউ পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারে না তবে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন,

- 'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।' (সূরাহ আনকাবুত, ২৯:৬৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন।' (সূরাহ নিসা, ৪:১৭৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।' (সূরাহ মায়িদা, ৫: ১৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'কাফিররা বলেঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে দিন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে, মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।' (সূরাহ রাদ, ১৩:২৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:১২৫)

আল্লাহ মুমিনদের অন্তরকে প্রভাবিত করেন, এটি বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, যেন তারা দ্বীনের উপরে দৃঢ় থাকতে পারেন। এমন একটি উদাহরণ হলো যখন রাসূল (সা.) ও আবু বকর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। সেই যাত্রার এক পর্যায়ে তারা সাওর গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে গিয়ে লুকালেন। যখন

কাফিররা গুহার মুখের কাছে চলে এলো, তখন আবু বকর উদ্বিগ্ন হলেন কারণ তিনি আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। রাসূল তাকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সাকিনা (প্রশান্তি) ও নিরাপত্তা নাজিল করলেন।

- 'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্তনা নাজিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরাহ তাওবা, ৯:৪০)

সূরাহ ফাতাহ'তে আল্লাহ্ দুইবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি আল্লাহর হিদায়াত ও রাসূলের অনুসরণকারী ঈমানদারদের অন্তরে সাকিনা নাজিল করেন,

> 'তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরাহ ফাতাহ, ৪৮:৪)

এই আয়াতে সেই সাহাবিদের কথা বলা হয়েছে যারা হুদাইবিয়া চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর আহ্বান ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। সাহাবিরা সেই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে আল্লাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের উপর সাকিনা নাজিল করেছেন।[২] আল্লাহ্ বলেছেন,

> 'কেননা, কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরাহ ফাতাহ, ৪৮:২৬)

পূর্বের তিনটি আয়াতে প্রশান্তি বোঝাতে 'সাকিনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও প্রশান্ত মন, শান্তি, প্রশান্তি, নিরাপত্তা।[৩] এটি অর্জিত হয় আল্লাহর অনুপ্রেরণার মাধ্যমে। কোনো ব্যক্তি নিজে নিজে সাকিনা সৃষ্টি করতে পারে না; কোনো চিন্তা বা আচরণের মাধ্যমে নয় বরং এটি আল্লাহর অনুগ্রহ যার মাধ্যমে তিনি ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করেন।

সূরাহ কাহাফে বর্ণিত সেই গুহাবাসী যুবকদের ঘটনাতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে তিনি যুবকদের **অন্তরে দৃঢ়তা** প্রদান করেছেন, যেন তারা বিরোধিতা, জুলুম-নির্যাতন

---

[২] Ibid., Vol. 9, p. 128

[৩] Wehr, H., 1974, A Dictionary of Modern Written Arabic, Beirut: Librairie du Liban, p. 418.

সহ্য করে টিকে থাকতে পারে। এই অনুগ্রহ তারা পেয়েছিল আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান ও তাদের আন্তরিক ইবাদাতের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা আসমান ও জমিনের পালনকর্তা আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।' (সূরাহ কাহাফ, ১৮:১৪)

এই আয়াতগুলোতে নির্দেশিত হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগত তিনি তাদেরকে দৃঢ়তা প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করবেন, যেন তারা জীবনের সকল বাধাবিপত্তি ও বিপর্যয় সহনশীলতার সাথে অতিক্রম করতে পারে। শুধু তাই নয় তিনি তাদের অন্তরে সাকিনা (প্রশান্তি) প্রদান করবেন যেন তাদের অন্তর শান্ত থাকে এবং উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, পেরেশানী দূর হয়। ফলে এটি তাদের ঈমান ও দৃঢ়তা অধিকতর শক্তিশালী করে।

যারা পথভ্রষ্টতার যোগ্য সেসব কাফিরদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন। তাদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতা চাপিয়ে দেন ও মোহর মেরে দেন। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

- 'অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:১২৫)

বনি ইসরাইলিদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

- '... অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।' (সূরাহ ছফ, ৬১:৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।' (সূরাহ আরাফ, ৭:৩০)

আল্লাহ চাইলে সকলকে হিদায়াত দিতে পারতেন কিন্তু এটা তাঁর সুমহান পরিকল্পনার অংশ নয়। আখিরাতে মানুষের জবাবদিহিতা, বিচার ও আল্লাহর ন্যায্যতার মধ্যে এর হিকমত রয়েছে। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারের মুখোমুখি হবো। এক্ষেত্রে যে হিদায়াতের দাবিদার নয় তাকে হিদায়াত দেয়া অন্যায়। আল্লাহ বলেন,

- 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৯৩)

• অন্যত্র বলেছেন,

'সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।' (সূরাহ্ নাহ্ল, ১৬: ৯)

৪.২ অনুপ্রেরণা

অনেক সময় আল্লাহ্ অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে মুমিনদেরকে গাইড করেন। সাধারণত রাসূলদের প্রতি ওহী নাযিলের মাধ্যমে এটা ঘটে। যেমন সামনের আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন,

• 'কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ্ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।' (সূরাহ্ শুরা, ৪২:৫১)

অনেক সময় অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে গোপনে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া হতে পারে। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ.) এর মায়ের উদাহরণ পেশ করেছেন। শিশু মূসা জন্মের পর তিনি খুবই আতঙ্কিত ছিলেন। ফিরআউন বনি ইসরাইলের সকল পুত্রসন্তানকে হত্যা করছিল। তিনি অনেক ভীত ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বুঝে উঠতে পারছিলেন না কিভাবে শিশুকে রক্ষা করবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন ও উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন,

• 'আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব।' (সূরাহ্ ক্বাসাস, ২৮:৭)

এখানে সরাসরি মূসার মায়ের অন্তরে অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছিল। চলুন, সেই ঘটনাটি পড়ে দেখি,

'অতঃপর ফেরাউন পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান, ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ববাসীগণের মধ্যে। তিনি মূসার ভগিণীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা

বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।' (সূরাহ ক্বাসাস, ২৮:৮-১৩)

আল্লাহ মুমিনদের অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন এই কথার পক্ষে উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে দলিল পাওয়া যায়। মূসার মা যেন সত্য প্রকাশ করে না দেন সেজন্য আল্লাহ তার অন্তরকে 'বেঁধে' রেখেছিলেন। শুধু তাই নয় তার অন্তরে পুঞ্জীভূত দুঃখ, যাতনা ও উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য আল্লাহ শিশু মুসাকে আবার তার কোলে ফিরিয়ে এনেছেন এবং অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহর সাহায্য সবসময়ই নিকটে।

এই অনুপ্রেরণা অনেক সময় স্বপ্নের মাধ্যমেও আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে সামনে 'ঘুম ও স্বপ্ন' অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এটি মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহারস্বরূপ। এর মাধ্যমে হিদায়াত ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়। তবে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল অন্তরের অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করা উচিত নয় বরং সেক্ষেত্রে সাধারণ বোধশক্তি ও ইসলামের দিকনির্দেশনার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। কেননা, শয়তান আমাদের অন্তরে মন্দ কাজের অনুপ্রেরণা প্রদান করতে সক্ষম। শয়তান মন্দ বিষয়কে সুশোভিত করে আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে অথচ বাস্তবে সেই 'সুশোভিত' কাজগুলো মোটেও আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক নয়।

৪.৩ ফেরেশতাদের সহযোগিতা

আল্লাহ তাঁর সুমহান পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন, সেই ফেরেশতা আমাদের সাথে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নিযুক্ত একজন সাথী রয়েছে। জিনের মধ্য থেকে একজন, আরেকজন রয়েছে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে। (মুসলিম)।

সাথী ফেরেশতা মানুষকে ভালো কাজের দিকে উৎসাহিত করে। এভবে আল্লাহর ইবাদাত ও আত্মসমর্পণ, সত্যের পথ অনুসরণ, মন্দপথ পরিহার এবং গুনাহ বর্জন করতে উৎসাহিত করে। জিন ও ফেরেশতার উভয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কেউ শয্যা গ্রহণ করে একজন ফেরেশতা ও একজন জিন দ্রুত তার দিকে ছুটে যায়। ফেরেশতা বলে, 'তোমার দিনের সমাপ্তি শুভ হোক। ভালো কাজের মাধ্যমে তোমার দিন সমাপ্ত কর।' আর শয়তান (জিন) বলে, 'তোমার দিনের সমাপ্তি হোক মন্দ কাজের মাধ্যমে!' তখন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে স্মরণ করে তখন ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা সেই জিনকে বহিষ্কার করে দেয় এবং সারারাত তাকে পাহারায় রাখে। যখন ঘুম থেকে উঠে তখন আবার একজন ফেরেশতা ও জিন দ্রুত তার দিকে ছুটে আসে। ফেরেশতা বলে, 'তোমার দিন শুরু করো ভালো কাজের মাধ্যমে।'

আর জিন বলে, 'তোমার দিন শুরু করো মন্দ কাজের মাধ্যমে।' তখন যদি সে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার দেহে প্রাণ দিয়েছেন মৃত্যুর পর এবং ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটাননি। প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি সেসব রূহকে আটকে রেখেছেন যাদের উপর তাকদীরে মৃত্যু লিপিবদ্ধ হয়েছিল আর সেগুলো ফেরত পাঠিয়েছেন যাদের ওপর নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করা বাকি রয়েছে। প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আসমান ও জমিনকে ধারণ করে আছেন যেন সেগুলো নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়ে। আর যদি সেগুলো নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ বাদে এমন কেউ নেই যে সেগুলো ধারণ করতে পারে। প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আসমান কে ধারণ করে আছেন যেন সেটা জমিনের উপর পতিত না হয় তার অনুমতি ব্যতিরেকে। এরপর সেই ফেরেশতা শয়তানকে (জিন) বহিষ্কার করে দেয় এবং সারাদিন সেই ব্যক্তির পাহারায় কাটিয়ে দেয়।'[৪]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে ও নিয়মিত দুআ পাঠ করে তাদেরকে জিন শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখা হয় এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য ও হিদায়াত প্রদান করা হয়। এই সাহায্যের মাধ্যমে সে আরো বেশি ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। ফলে ফেরেশতাদের কাছ থেকে আরো ভালোবাসা ও সাহায্য পেতে থাকে। যেহেতু ফেরেশতারা আল্লাহর একান্ত নিবেদিত গোলাম, কাজেই তারা কেবল সেই ব্যক্তির জন্য ভালো বিষয় নিয়েই আগমন করেন।

মানুষদের মধ্যে ফেরেশতারা বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য ভালোবাসা পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরিল (আ.) কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাস। তারপর জিবরিল তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন; কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসে। অতঃপর দুনিয়ায় তা গৃহীত হয়ে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

ফেরেশতারা মুমিনদের উপর রহমতের দুআ করেন। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন-অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।' (সূরাহ আহযাব, ৩৩:৪৩)

এখানে রহমত এর অর্থ ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন ও তাদের মাগফিরাত কামনা করেন। কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে ফেরেশতাদের দুআর বরকতে আল্লাহ মুমিনদের কুফরের অন্ধকার, শিরক এবং গুনাহ

---

[৪] A sound hadith recorded by Ibn Hibban and al-Hakim, as quoted in al-Ashqar, U.S., 2005, The World of the Noble Angels in the Light of the Qur'an and Sunnah, Riyadh: International Islamic Publishing House, pp. 67-68.

থেকে রক্ষা করেন ও সত্যের আলোকময় পথ অর্থাৎ ইসলামের দিকে পরিচালিত করেন। এই আলোর মাধ্যমে মুমিন উত্তম কথা ও নেক কাজের হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় ও নেক সঙ্গীসাথীদের সাহচর্য লাভ করে।[৫]

কিছু সুনির্দিষ্ট আমল রয়েছে যা করলে ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায়, এর একটি হলো মানুষদেরকে ইলম শিক্ষা দেওয়া, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শেখায় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া, এমনকি মাছেরাও তাদের জন্য দুআ করে।' (তিরমিযি)

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেও ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এমন কোনো মুসলিম নেই, যে সকাল বেলা কোনো মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ না করে, আর সন্ধ্যে বেলা কোনো রোগীকে দেখতে যায় এবং সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা দু'আ না করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত করে দেয়া হয়।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)

নবিজির উপর দরুদ পেশ করার মাধ্যমেও ফেরেশতাদের দুআ লাভ হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকেন। অতএব বান্দা চাইলে তার পরিমাণ (দরূদ পাঠ) কমাতেও পারে বা বাড়াতেও পারে।' (ইবনু মাজাহ)

আরো বেশ কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায়। যেমন ফরজ সালাতের জামাতের জন্য অপেক্ষা করা, প্রথম রাকাতে সালাত আদায় করা, কাতারে শূন্যস্থান পূরণ করা, রামাদান মাসে রোজা রাখার জন্য সেহরি খাওয়া ইত্যাদি।[৬]

আরেকটি খুশির খবর হলো প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রহরী ফেরেশতা মোতায়ন করা রয়েছে যারা তাকদির অনুসারে সকল বিপদাপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে থাকেন। এই ফেরেশতারা রয়েছেন আমাদের সামনে, পেছনে; দিনরাত সর্বদা তারা আমাদের সুরক্ষা প্রদান করতে থাকেন। আর যখন তাকদীরে নির্ধারিত বিপদ সেই ব্যক্তির সামনে চলে আসে, তখন তারা নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেন। আল্লাহ বলেছেন

- 'তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হিফাজত করে।...' (সূরাহ রাদ, ১৩:১১)

---

[৫] al-Ashqar, 2005, p. 83.
[৬] Ibid., pp. 81-82.

মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রহরী ফেরেশতারা আমাদের উপর নিযুক্ত থাকেন। মৃত্যুর ফেরেশতা জান কবজ করতে আসা পর্যন্ত তারা থাকেন। আল্লাহ বলেন,

- '...যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং তারা নিজেদের কাজে ব্যর্থ হয় না।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:৬১)

৪.৪ শয়তানের পথভ্রষ্টতা

মানুষকে মন্দকাজের দিকে অনুপ্রাণিত করে এমন শক্তির অস্তিত্বও রয়েছে। শয়তান ও তার অনুসারীরা এই ধরনের শক্তি। 'শয়তান' একটি পরিভাষা যার মাধ্যমে জিন ও মানুষের মধ্যে বিদ্রোহী, আল্লাহর হিদায়াত অস্বীকারকারী, দুরাচার ও অনাচার সৃষ্টিকারীদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। এরা মানুষের দুশমন। মানুষকে সরলপথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টায় তারা সদাব্যস্ত। জিন আল্লাহর এমন একটি সৃষ্টি যাদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা আমাদেরকে দেখতে পারে কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখি না, এবং সাধারণত তাদের উপস্থিতিও বুঝতে পারিনা। কিছু বিষয়ে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা মানুষের থেকেও বশি।[৭]

শয়তান অন্তরে (ক্বলব) ওয়াসওয়াসা প্রদান করার মাধ্যমে উস্কানি দেয় ও আমাদের চিন্তাভাবনা, আবেগ-অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে। তারা এমন সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যে মানুষ বুঝতে পারে না ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কুরআনের সর্বশেষ সূরাহতে আল্লাহ বলেছেন,

- 'বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মাবুদের; আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।' (সূরাহ নাস, ১১৪:১-৬)

সারাদিনব্যাপী শয়তানের বিপক্ষে আল্লাহর সুরক্ষা লাভের জন্য এই সূরাহ পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে। সেই শয়তান মানুষ বা জিন যাদের মধ্য থেকেই হোক না কেন। ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে সূরাহ নাস সম্পর্কে লিখেছেন, 'মানুষ যখন অমনোযোগী হয় এবং ওয়াসওয়সার প্রতি বেখেয়াল থাকে তখন শয়তান আদম সন্তানের অন্তর জবরদখল করতে চায়। আর যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান পিছু হটে।'[৮] শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরো পরিপূর্ণ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই বইয়ের তেরোতম অধ্যায়ে।

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ শয়তান সম্পর্কে বলেছেন,

'প্রতিটি মানুষের অন্তরে তাওহিদ, মা'রিফাত, ঈমান ও ইয়াকিন রয়েছে আল্লাহর ওয়াদা ও সতর্কতার ব্যাপারে। আবার একই অন্তরে রয়েছে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, অহমিকা ও রিপুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অন্তরের অবস্থান এই দুইয়ের মাঝামাঝি।

---

[৭] al-Sha'rawi, 1995, Magic and Envy in the Light of the Qur'an and Sunna, Dar al Taqwa, p. 9.
[৮] Ibn Kathir, 2000, p. 648.

কখনো অন্তর ঝুঁকে পড়ে ঈমানের দাওয়াত, মা'রিফাত, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর একান্ত সন্তুষ্টির দিকে। আবার কখনো অন্তর ঝুঁকে যায় শয়তানের আহবান, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও পাশবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে। এই ধরনের অন্তরকে দেখে শয়তানের মনে আশার সঞ্চার হয়। সে এখানে এসে শিবির স্থাপন করে ও বসতি গাঁড়ে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে (শয়তানের বিরুদ্ধে) বিজয় প্রদান করেন।'

• '... আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১২৬)

মানুষের অন্তরের উপর শয়তানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যতক্ষণ না মানুষ নিজেই শয়তানের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। সেগুলো হলো প্রবৃত্তির তাড়না, সন্দেহজনক আমলের পিছে ব্যস্ত হওয়া, বিভ্রান্তি ও অলীক আশা। ফলে শয়তান মানুষের অন্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এরপর এসব অস্ত্র হাতে তুলে নেয় ও মানুষের বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করতে থাকে। যদি মুমিনের ঈমানি বাহিনী প্রস্তুত থাকে, তবে তারা সুরক্ষা দিতে এগিয়ে আসবে, বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং শয়তানকে পরাজিত করবে। অন্যথায় সে ভূমি শত্রুর হস্তগত হবে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ,' (বিপদ থেকে রক্ষাকারী কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই আল্লাহ ছাড়া))। যখন বান্দা নিজেই শত্রুকে আমন্ত্রণ জানায়, দূর্গের দরজা খুলে দেয়, নিজের অস্ত্র শত্রুর হাতে তুলে দেয়; তখন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করা যায় না।'[১]

৪.৫ নফসের কামনা-বাসনা ও দুর্বলতাসমূহ

নফসের পরিশুদ্ধির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি বাধার নাম শাহওয়াত (কামনা-বাসনা) ও শুবুহাত (সন্দেহ)।

৪.৫.১ (শাহওয়াত) কামনা-বাসনা : এগুলো নফসের ক্ষুধা বা চাহিদা। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন মাত্রার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যেমন- হিংসা, অহংকার, অলসতা ও বিভিন্ন গুনাহের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি। আরো থাকতে পারে সম্পদ, ক্ষমতা, মর্যাদা, শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি লোভ। এই আসক্তিগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে পরীক্ষা করা হয় এবং যাচাই করে দেখা হয় যে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে আমরা এগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি কি না।

• 'অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। ...' (সূরাহ আরাফ, ৭:১৭৬)

---

[১] al-Jawziyyah, 2000, pp. 32-33.

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।' (সূরাহ নাযিয়াত, ৭৯:৪০-৪১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু ও কামনা-বাসনা দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে সব ধরনের অপছন্দনীয় ও কষ্টকর বিষয় দ্বারা।'[১০] (বুখারি)

কখনো কখনো আমাদের বিপথগামীতা শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে হয়, আবার কখনো নফসের কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে হয়। আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য নফসের দুর্বলতাকে শয়তান অবশ্যই ব্যবহার করতে চায়। কাজেই, যদি প্রবৃত্তির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেই তাহলে এটি ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে। প্রবৃত্তির তাড়নার কারণে মানুষ বিভিন্ন বিকৃত চাহিদা ও লক্ষ্য স্থির করে, গুনাহ করে।[১১] এগুলোর ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খুবই নেতিবাচক। লাগামহীন ছেড়ে দিলে প্রবৃত্তির তাড়না ও লালসা আমাদের জীবনের প্রধান ফোকাস হয়ে যাবে। আমরা কামনার গোলামে পরিণত হবো, জীবনের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে প্রবৃত্তির হাতে। সুখ ও পরিতৃপ্তি নফসের তাড়নার উপর নির্ভরশীল হলে সেগুলো মেটানো ছাড়া আমরা কখনো তৃপ্ত হতে পারব না।

ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন ,

> 'যে কিছু পেলে খুশি হয়, না পেলে অখুশি হয়—সে ঐ বিষয়ের গোলাম। কেননা, গোলামী ও দাসত্ব হলো মূলত অন্তরের গোলামী ও দাসত্ব। ফলে যা কিছু অন্তরকে বশ করে গোলামীতে নিয়ে আসে, অন্তর সেগুলোর দাসে পরিণত হয়। একারণে বলা হয়, 'বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত থাকে যতক্ষণ সে যা আছে (আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন) তাই নিয়ে খুশি থাকে, আর স্বাধীন ব্যক্তিও গোলাম হয়ে যায় যতক্ষণ সে নিজের কামনা বাসনার পিছে ছুটতে থাকে।'[১২]

নিজের কামনা-বাসনাকে কোনো ব্যক্তি উপাস্য বানিয়ে নিতে পারে, এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

• 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে

---

[১০] Another way to state this is that the road to hell is paved with desires, while the road to heaven is paved with hardship. (Editor)

[১১] Zarabozo, 2002, p. 395.

[১২] Ibn Taymiyyah, 1999, Essay on Servitude. Birmingham, UK: Al Hidaayah Publishing and Distribution, pp. 100-101.

দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?' (সূরাহ্ জাসিয়া, ৪৫:২৩)

সৃষ্টিগতভাবে এসকল বৈশিষ্ট্য থাকার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তি নিজের অনৈতিক ও বিপথগামী কাজের পক্ষে এগুলোর দোহাই দেবে। জুনায়েদ আল-বাগদাদী বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তিকে তার স্বভাবের জন্য দোষ দেয়া যায় না, বরং তাকে দোষারোপ করা হয় স্বভাব অনুসারে কাজ করার জন্য।'[১৩] আল্লাহ্ তাআলা নফসের এসকল বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন একটি পরীক্ষা হিসেবে। আবার তিনিই এসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এগুলো মোকাবেলা করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহতে পর্যাপ্ত উপকরণ দিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা সেগুলো প্রতিরোধ করতে পারি, মুজাহাদা করতে পারি। ফলে নিজেদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিজয় করে আত্মোন্নয়ন ঘটাতে আমরা আশাবাদী।

৪.৫.২ সন্দেহ :

সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, ভুল ধারণা ইত্যাদি একজন ব্যক্তির মাঝে বিরাজমান জ্ঞান ও বিশ্বাসকে নষ্ট করে বা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। সাধারণত সন্দেহ সৃষ্টি হয় অজ্ঞতা থেকে। একারণে ইসলামে ইলমের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি এমন আচরণ করতে পারে যা আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অসন্তোষজনক। অজ্ঞতার ফলে ইয়াকিনে কমতি আসে, দ্বীনি দৃঢ়তায় ঘাটতি শুরু হয়, আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পথে ঘাটতি সৃষ্টি হয়।[১৪] আল্লাহ্ বলেন,

'আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।' (সূরাহ্ ফুরক্বান, ২৫:৪৩-৪৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

'তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।' (সূরাহ্ মুলক, ৬৭:১০)

সন্দেহজনক কাজে জড়িত ব্যক্তিরা অন্তরে কখনো প্রশান্তি পায় না। তাদের মন-মগজ বিক্ষুব্ধ থাকে, সবসময় ভাবতে থাকে তাদের কাজ কবুল হলো কি না। অপরদিকে মুমিনরা কেবল সেসব কাজ সম্পাদন করে যেগুলো করা বৈধ। ফলে তাদের অন্তর প্রশান্ত থাকে। 'এটা না করে ওটা করা উচিত ছিল'—তাদেরকে এমন ভাবতে হয় না। কিছু করলে সেজন্য নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে হয় না, তারা ইয়াকিন অর্জন করে।[১৫]

---

[১৩] Abu Nu'aym, A., Hilyat al-Awliya (Vol. 10), p. 287.

[১৪] Zarabozo, 2002, pp. 395, 398.

[১৫] Zarabozo, 1999, Vol. 1, p. 566.

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও আর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না, তাই গ্রহণ- করো। সত্যপ্রীতি অবশ্যই শান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।' (তিরমিযি, নাসাঈ)।

মুমিন তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহ ও ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন,

- 'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।' (সূরাহ হুজুরাত , ৪৯:১৫)

ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসের বরকতে মুমিনরা আল্লাহর রাহে কাজ করতে অনুপ্রাণিত থাকে। এ পথে যেকোনো কুরবানী করতে তৈরি থাকে। তারা এমন আবেগ ও ইয়াকিনের সাথে কাজ করে যা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসে অর্জন করা সম্ভব নয়।

৪.৬ অন্তর ও আত্মার উপর কার্যকরী শক্তিসমূহের সারকথা

অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে উদাসীন হলে জীবনের উদ্দেশ্য হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাব। জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাতে সত্যবাদী ও আন্তরিক হওয়া। যেসব কাজে ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচা যাবে, আমাদেরকে সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে আল্লাহমুখী হওয়া, হিদায়াত কামনা করা, ইখলাস ও সততা।

মানুষ প্রতিনিয়ত যেসব আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকে সে বিষয়ে ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ বলেছেন,

> মানুষ তার শত্রু ইবলিসের কারণে হয়রান হলেও, ইবলিস কখনো মানুষকে পরিত্যাগ করে না। বরং তার কাছে আসতে থাকে রিপু ও জৈবিক কামনা-বাসনার সকল দরজা দিয়ে। রিপু মানুষকে শয়তানের নিকটবর্তী করে দেয়, কারণ শয়তান নফসের কাম্য বস্তুকে উপস্থাপন করে সুশোভিত করে। এরপর শয়তান, রিপু ও নফস—এই তিন শক্তি মিলে বান্দার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকে। এমনকি বান্দার আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও তাদের কাছে অচল যন্ত্রপাতির মতো আত্মসমর্পণ করে...
>
> এই হলো জমিনের বুকে বান্দার প্রকৃত অবস্থা! অসহায় বান্দা আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। এরপর আল্লাহ রহমত প্রেরণ করে বান্দাকে সাহায্য করেন। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বান্দা সেসব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যারা তার ধ্বংসের উপায় তালাশ করছে। এমতাবস্থায় আরও সাহায্যের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বান্দার কাছে নবি-রাসূল প্রেরণ করেন। শয়তানের বিরুদ্ধে একজন সম্মানিত ফেরেশতা মোতায়েন করেন। যখনই শয়তান বান্দাকে তার আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করে, তখন ফেরেশতা আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে শয়তান তার শত্রু এবং শয়তানের আনুগত্যে কেবল ধ্বংস ও ক্ষতি অপেক্ষমাণ। এরপর কখনো এই পক্ষ জয় লাভ করে, কখনো অপরপক্ষ জয় লাভ করে। আসলে সেই

প্রকৃত বিজয়ী যাকে আল্লাহ বিজয় প্রদান করেন; সেই প্রকৃত নিরাপদ যাকে আল্লাহ নিরাপত্তা প্রদান করেন...

প্রবৃত্তির তাড়না ও আসক্তির বিপরীতে (যা মানুষকে শয়তানের আনুগত্যে পরিচালিত করে) আল্লাহ তাঁর বান্দার হৃদয়ে নূর প্রদান করেন, সঠিক বোধশক্তি ও জ্ঞান প্রদান করেন। ফলে বান্দা প্রত্যেক খেয়ালখুশির পিছে দৌড়ানো থেকে বিরত হয়। যখনই সে কোনো ভ্রান্ত খেয়ালখুশি অনুসরণ করতে শুরু করে তখনই আল্লাহ প্রদত্ত বোধশক্তি, জ্ঞান এবং নূর এসে তাকে ডাকতে থাকে, 'সাবধান! সাবধান! তোমার সামনে ধ্বংস, তোমার সামনে ক্ষতি! এই রাহবারের (পথপ্রদর্শক) পেছনে সফর করলে তুমি দুর্বৃত্ত ও ডাকাতের কবলে পড়বে!' এরপর বান্দা কখনো এই সদুপদেশ অনুসরণ করে কেননা সে বুঝতে পারে এটা প্রজ্ঞাপূর্ণ সদুপদেশ; আবার কখনো প্রবৃত্তির তাড়নাকেই নিজের রাহবার বানিয়ে নেয়।[১৬]

---

[১৬] al-Jawziyyah, 2000, pp. 16-17.

||অধ্যায় পাঁচ||
মোটিভেশন (প্রেষণা)

সাধারণত মোটিভেশন বা প্রেষণার সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়—এটি সেই চাহিদা বা তাড়না যা কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কার্যক্রমকে শক্তি যুগিয়ে চলে।[১] আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন প্রেরণার (Motive) নিয়ামত দান করেছেন। এগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের মৌলিক ও প্রধান উপাদান। মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেসব 'স্বভাব' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, এগুলো তারই অংশ। তিনি বলেছেন,

- 'মূসা বললেন, আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:৫০)

'প্রয়োজন' (Need), 'তাড়না' (Drive) ইত্যাদি পরিভাষাগুলো সাধারণত আভ্যন্তরীণ মোটিভেশনকে নির্দেশ করে। আর প্রলোভন বা লাভের আশা (incentives) এগুলো হলো বাহ্যিক প্রভাবক। 'প্রয়োজন' থেকেই 'তাড়না'র সৃষ্টি হয়, আর এই তাড়নাই 'প্রয়োজন' মেটাতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে আমরা বিভিন্ন প্রকারের মোটিভেশন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক, দৈহিক ও মানসিক মোটিভেশন ইত্যাদি।

৫.১ আধ্যাত্মিক মোটিভেশন

আগেই আমরা আলোচনা করে নিয়েছি যে, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা মানবসত্তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এটি পূরণ করাই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে যারা ব্যর্থ হয় তারা অনুভব করে এক শূন্যতার অনুভূতি, হতাশা, উদ্বেগ ও শংকা। এই মোটিভেশনটাই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা করতে আমাদেরকে আগ্রহী করে তোলে। আমরা জানতে চাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে, এই চাওয়াটা আধ্যাত্মিক প্রেষণারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহকে আমাদের রব, রিযিকদাতা, একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য সত্তা হিসেবে মেনে নিতে এটাই আমাদের বাধ্য করে। সকল নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এই বিষয়টি ফিতরাত ও ঈমানের আকিদার সাথে সংযুক্ত, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

৫.২ শারীরবৃত্তীয় প্রেরণা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিয়ামত হিসেবে কিছু দৈহিক প্রেরণা (motive) বা তাড়না (drive) দিয়েছেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষ ও মানবজাতিকে রক্ষা করা বা টিকিয়ে রাখা। যেমন- মানুষ ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যগ্রহণের প্রেষণা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে পিপাসা, ক্লান্তি, গরম, ঠাণ্ডা, ব্যথা ইত্যাদি অনুভব করলে শরীরে যে চাহিদা তৈরি হয়, সেটা পূরণ করতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। সবসময় দেহকে অবশ্যই তার স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় (state of homeostasis) থাকতে হবে, কেননা এই অবস্থাটিতেই দেহ যথাযথভাবে কর্মক্ষম থাকতে পারে, কাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম দেহের ভিতর সঠিকভাবে চলতে পারে। যদি কোনোভাবে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন দেহে একটা চাহিদা জেগে ওঠে। এই চাহিদাই তাকে ধাবিত করে দ্রুত প্রয়োজন মিটিয়ে আবার সেই সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে। যেমন ধরেন, একজন নারী ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যের অনুসন্ধান করবে, রান্না করে খেয়ে নিবে। যখন ক্ষুধা মিটে গেল, শরীর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা ফিরে পেল। সে তখন আর খাদ্যের প্রতি কোনো চাহিদা অনুভব করবে না। মানে, তার দৈহিক তাড়নাটি তখন কমে গেছে।

একটি বিষয় বেশ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্যণীয়; মানুষ চাইলেই যেকোনো উপায়ে নিজের চাহিদা মেটাতে পারে না। অবশ্যই সেগুলো পূরণ করতে হবে গ্রহণযোগ্য ও শরিয়া মোতাবেক বৈধ উপায়ে। এসব চাহিদা চরিতার্থ করতে হবে অনুগত হয়ে এবং আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে। অবৈধ পন্থায় পরিতৃপ্তি মানুষকে তার সহজাত বিশুদ্ধ স্বভাব থেকে বিচ্যুত করে এবং অসুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।

জান্নাতে আদমের কোনো চাহিদা ছিল না। সেখানে ছিল না মানবিয় চাহিদার কোনো অস্তিত্ব। সেই সুখের জান্নাত থেকে বহিষ্কারের পথে শয়তান তাকে প্ররোচিত করবে— আল্লাহ সে ব্যাপারে আদমকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেছেন,

- 'অতঃপর আমি বললামঃ হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে **ক্ষুধার্ত হবে না** এবং **বস্ত্রহীণ হবে না**। এবং তোমার **পিপাসাও হবে না** এবং **রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না**।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:১১৭-১১৯)

আখিরাতের জীবনে জান্নাতীরা খাদ্য-পানীয় পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার করবে, কিন্তু এগুলো তাদের 'চাহিদা' পূরণের জন্য প্রদান করা হবে না। বরং আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে এগুলো দেয়া হবে উপভোগের জন্য, চাহিদা পূরণের জন্য না। দুনিয়াতে অবস্থানকালে আমরা বিভিন্ন মাত্রায় এসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, কেউ বেশি কেউ কম। আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে এসব প্রয়োজন পূরণের পদ্ধতিকে সহজ ও উপভোগ্য করে দিয়েছেন। যেমন ক্ষুধা সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করে বলা হয়েছে,

• 'অতএব তারা যেন ইবাদাত করে এই ঘরের পালনকর্তার যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।' (সূরাহ কুরাইশ, ১০৬:৩-৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

'আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির।' (সূরাহ্ নাহল, ১৬: ১১২)

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

• 'তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে।' (সূরাহ্ ইউনুস, ১০:৬৭)

• অন্যত্র বলেছেন,

'তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে।' (সূরাহ্ ফুরক্বান, ২৫:৪৭)

শীতলতা, উষ্ণতা, ক্লান্তি ও ব্যথা ইত্যাদি পরিহারের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন,

• 'আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ তোমাদের জন্যে সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড় সমূহে তোমাদের জন্যে আত্ম গোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।' (সূরাহ্ নাহল, ১৬: ৮০-৮১)

মানুষের আরেকটি মৌলিক শারীরবৃত্তীয় তাড়না হলো যৌন তাড়না। দুনিয়াতে মানবপ্রজাতির ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রাখার জন্য যেটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই তাড়নার প্রভাবেই আমরা পরিবার গঠন করি। পরিবার থেকে হয় সমাজ, আর সমাজ থেকে জাতি। আল্লাহ্ বলেছেন,

• 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের

ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (সূরাহ নিসা, ৪:১)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।' (সূরাহ হুজুরাত , ৪৯:১৩)

কুরআনে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষ সৃষ্টির আলোচনা করেছেন, কেননা এই 'জোড় বাঁধা' থেকেই ক্রমান্বয়ে গোত্র ও জাতি বিকশিত হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক যে ভালোবাসা, দয়া ও মিল-মহব্বতের চাষ হয়; তা তৈরি করে দেয় শিশু বেড়ে ওঠার সুস্থ পরিবেশ। আর একেকটি সুস্থ পরিবারের সমন্বয়েই না গঠিত হয় সুস্থ সমাজ। আল্লাহ বলেছেন,

- 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরাহ রুম, ৩০:২১)

প্রেমময় এই সম্পর্কের একটি উপাদান হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ঘনিষ্ঠতা। এ সম্পর্কে সুরা বাকারায় আলোচনা করে আল্লাহ বলেছেন,

- 'রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। ...' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৮৭)

যৌন কামনা নিবৃত্ত করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অধিকার। বিয়ের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য তো এটাই।

বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কেননা এর মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা পায় এবং সমাজ মুক্ত থাকে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাধি থেকে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী। আর যার এ সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, এটি তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী। (মুসলিম)। যারা বিবাহ করতে অপারগ তাদের জন্য সিয়ামের বিধান প্রদান করা হয়েছে যেন নিজেদের যৌন তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

একবার এক ব্যক্তি বিয়ে করবে না মর্মে প্রতিজ্ঞা করলে রাসূল (সা.) তাকে তিরস্কার করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি আবার পানাহার করি, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-

শাদিও করি। (এটাই আমার সুন্নাহ; পথ, পদ্ধতি) যে আমার সুন্নাহ মেনে চলে না সে আমার (দলভুক্ত) নয়।' (বুখারি ও মুসলিম)।

বৈধ উপায়ে নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পুরস্কার প্রদান করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এমনকি, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলনও সাদকা। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যৌন চাহিদা মেটালে তাতেও সাওয়াব হয়? তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা মেটালে তাতে তার গুনাহ হবে কি না? (নিশ্চয়ই তার গুনাহ হবে) এভাবে যদি সে হালাল পন্থায় এটি করে তবে তার সাওয়াব হবে।' (মুসলিম)

যখন কোনো পুরুষ নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীকে দেখে কামনা অনুভব করে তাহলে তার উচিত নিজের স্ত্রীর কাছে গিয়ে কামনা পূরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাউকে কোনো স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তাতে তার মন প্রলুব্ধ হয় তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে সংগম করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর হবে।' (মুসলিম)

এই হাদিসটি সুনির্দিষ্টভাবে পুরুষদের উদ্দেশ্যে, কেননা নারীদের তুলনায় পুরুষরা সহজেই যৌনতায় উদ্বুদ্ধ হয়। ইসলামি শরীয়াহতে স্ত্রীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যেন তারা স্বামীর শারীরিক প্রয়োজন পূরণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্কে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এমনকি স্বামী অন্যায় কাজেও প্রলুব্ধ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি তার বিছানায় স্বীয় স্ত্রীকে ডাকে; কিন্তু স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয় এবং একারণে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশতারা ভোর পর্যন্ত মহিলাটির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।' (বুখারি ও মুসলিম)।

যৌনতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই হাদিসের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কে যৌনতার গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। অবৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণের বিরুদ্ধে ইসলামে নানা অনুশাসন রয়েছে। বহুবিবাহকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ইসলামে নারীদের জন্য পর্দার বিধান রয়েছে। আরও আছে নারী-পুরুষ উভয়ের দৃষ্টি সংযত করা, বিপরীত লিঙ্গের সাথে লেনদেন সীমিত করা, লজ্জাশীলতা বজায় রাখা, মেয়ে দেখা ও বিয়ের ক্ষেত্রে সীমারেখা মেনে চলা, জিনা-ব্যভিচারের কঠিন শাস্তির বিধান ইত্যাদি। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে রক্ষার জন্য এই অনুশাসনগুলো খুবই উপযুক্ত।

৫.৩ মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা/অভিপ্রায়

৫.৩.১ উদ্দীপক (Incentive) :

চারপাশের যেসব উপাদান দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে একজন ব্যক্তি সেই উপাদানটি পেতে অনুপ্রাণিত হয় সেটাই উদ্দীপক। উদ্দীপক দ্বারা শরীর ও মনের বাইরের জিনিস বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ: মানুষ সারা মাস ধরে কাজ করে যায় মাসের শেষে নির্দিষ্ট অঙ্কের বেতন

হাতে পাওয়ার জন্য। এই বেতনের টাকাটা হলো সেই উদ্দীপক—যা তাকে কঠিন পরিশ্রম এবং আরও ভালো পারফর্মেন্স করতে উৎসাহ যোগায়। আবার (নেতিবাচক) উদ্দীপকের মাধ্যমে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখাও সম্ভব। যেমন- শুধুমাত্র বেতনের টাকার জন্যেই আমরা কাজ করি না, বসের ঝাড়ি থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

৫.৩.২ শাস্তি ও পুরষ্কার :

শাস্তি ও পুরস্কার ইসলামি জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর অনেক আলোচনা রয়েছে কুরআনে। মূলত মানুষের অধিকাংশ আচরণই পরিচালিত হয় পুরস্কার অর্জন বা শাস্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ।

কুরআনে উল্লেখিত পুরস্কার ও শাস্তির অধিকাংশই দীর্ঘমেয়াদে (আখিরাতে) সংঘটিত হবে, নগদ ঘটবে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'Delayed Gratification' বা 'বিলম্বিত পুরষ্কার'। অর্থাৎ নগদ ছোট পুরষ্কার অর্জনকে কিছুটা পিছিয়ে দেয়া, যেন পরবর্তীতে আরও বেশি পুরস্কার লাভ করা যায়। মুসলিমদের 'বিলম্বিত পুরস্কার' লাভের বিষয়টি ঘটবে আখিরাতে আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে। ঈমানদাররা নিজেদের বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও উত্তম আমলের বরকতে সেই পুরষ্কার পাবে। অপরদিকে কাফিরদের জন্য শাস্তি। এটাও বিলম্বিত রাখা হয়েছে তাদের কুফর ও অন্যায় আচরণের জন্য। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপারে দুনিয়ার শাস্তি ও পুরস্কারের সাথে আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ দিক থেকেই সেগুলো ভিন্ন। সমস্ত কুরআন জুড়ে বারবার স্মরণিকা হিসেবে শাস্তি ও পুরষ্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন,

- 'অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দেবেন সজীবতা ও আনন্দ। এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।' (সূরাহ ইনসান, ৭৬:১১-১৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'। এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।' (সূরাহ ইনসান, ৭৬:২০-২২)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয়

নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপর পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।' (সূরাহ্ কাহ্ফ, ১৮:৩০-৩১)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্য আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়া নীড়ে।' (সূরাহ্ নিসা, ৪:৫৭)

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'নেতিবাচক উদ্দীপক' (negative reinforcement) বলে সেগুলোও কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হলো, খারাপ পরিণতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে আচরণকে ঠিক করার প্রচেষ্টা। যেমন- সূরাহ ইসরাতে বিচারদিবসের নানা ভয়-ভীতির কথা এসেছে, সেদিন কিছু মানুষকে আল্লাহ্ ভয়-ভীতি ও দুঃখ, চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্ত রাখবেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

- 'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।' (সূরাহ্ আহকাফ, ৪৬:১৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।' (সূরাহ্ যুখরুফ, ৪৩:৬৮)

আখিরাতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর সুমহান চেহারার দর্শন (দীদার) লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! তারা বলবে, আমরা উপস্থিত আছি। হে আমাদের প্রতিপালক! সব কল্যাণ তোমার হতে নিহিত! মহান আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ। তার বলবে, হে আমাদের রব! আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি আমাদেরকে যে অনুগ্রহ দিয়েছেন তা অপর কোনো সৃষ্টিকে দেননি। মহান আল্লাহ বলবেন, এর চেয়ে উত্তম বস্তু আমি কি তোমাদের দেব না? তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম ও উন্নত বস্তু আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতীর্ণ করব। এরপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।' (বুখারি ও মুসলিম)

সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি হলো আল্লাহর সুমহান চেহারার পানে চেয়ে থাকা। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন,

- 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।' (সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫:২২-২৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যাওয়ার পর কল্যাণ ও বরকতের মালিক আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি অধিক আর কিছু চাও? তারা বলবে,

আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেননি? আপনি আমাদের জান্নাতে গমন করাননি এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি দেননি? এ সময় আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে নেবেন। জান্নাতবাসীদের আল্লাহ দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই দেয়া হবে না।' (মুসলিম, তিরমিযি)। সুতরাং, এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর দীদার লাভ করাই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য যার জন্য মানুষের প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম করা উচিত।[২]

এই সকল আয়াত ও অন্যান্য দলিলের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে আল্লাহর ভয়, নেক আমল ও দুনিয়াতে সবর করার কারণে মুমিনদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।[৩] আল্লাহ বলেছেন,

- 'এই যে, জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল।' (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩:৭২)

একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো, পুরস্কারের যোগ্য হলেও কেউ আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে **কাফিরদের প্রাপ্য শাস্তির আলোচনা** এসেছে,

- 'এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমুহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।' (সূরাহ নিসা, ৪:৫৬)

'... আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।' (সূরাহ কাহাফ, ১৮:২৯)

আখিরাতে কাফির মুশরিকদের লাঞ্ছিত করা হবে এবং তারা কখনোই লাভ করতে পারবে না আল্লাহর মহান চেহারা দর্শনের আনন্দ ও সম্মান। এটাই হবে তাদের সবচেয়ে বড় অপ্রাপ্তি।

- 'হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯২)

- অন্যত্র বলেছেন,

---

[২] al-Ashqar, U.S., 2002, Paradise and Hell in the Light of the Qur'an and Sunnah, Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, p. 309.
[৩] For more details, see al-Ashqar, 2002b.

'কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।' (সূরাহ মুতাফফিফিন, ৮৩:১৫)

সুস্থ চিন্তাশক্তি, প্রকৃত জ্ঞান ও আল্লাহর ভয় যার রয়েছে, সে অবশ্যই চেষ্টা করবে যত বেশি সম্ভব উত্তম আমল করে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। আখিরাতের জীবন ও আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করাই হচ্ছে প্রত্যেক প্রকৃত ঈমানদারের প্রধান লক্ষ্য। তাদের চিন্তা-চেতনা ও প্রেষণা-তাড়নার মূল উদ্দেশ্যই হবে এটা।

৫.৪ আমলনামা ও বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

মানুষকে আরও কার্যকরভাবে 'মোটিভেইট' করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা রেখেছেন। বিষয়টি Behaviour management system এর মতো— যেখানে সবসময় চলতি হিসাব ও কাজকর্ম সংরক্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা চাইলে মানুষের কাছ থেকে এই তথ্য গোপন রাখতে পারতেন। কিন্তু তার অসীম প্রজ্ঞা অনুসারে তিনি মানুষকে এটা জানিয়ে দিয়েছেন যেন আমরা আরও বেশি ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত হই। তিনি সেই ফেরেশতাদেরও সৃষ্টি করেছেন যারা আমাদের আমলনামা রেকর্ড করছেন। আমাদের প্রত্যেকের উপর দুইজন ফেরেশতা সদা-সর্বদা মোতায়েন রয়েছেন, যারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করছেন।[৪] আল্লাহ বলেছেন,

- 'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা কর।' (সূরাহ ইনফিতার, ৮২:১০-১২)

- অন্যত্র বলেছেন

  'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' (সূরাহ ক্বাফ, ৫০:১৬-১৮)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, ফেরেশতারা সব সময় আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মকে সংরক্ষণ করে রাখছেন। এই রেকর্ড কিতাবের আকারে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়া হবে হবে বিচার দিবসে। আমাদের প্রত্যেকের ডান পাশের ফেরেশতা ভালো কাজগুলো সংরক্ষণ করছেন, আর বাম পাশের জন মন্দ কাজগুলো। আল্লাহর অসীম রহমত অনুসারে ফেরেশতারা মন্দ কাজকে সাথে সাথেই লিপিবদ্ধ করেন না, বরং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেটা লেখা থেকে বিরত থাকেন, যেন এর মাঝে গুনাহকারী ব্যক্তি তাওবা করে নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বাম কাঁধের

[৪] al-Ashqar, 2005, p. 68.

ফেরেশতা ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত কলম উঠিয়ে রাখেন। যদি কোনো মুসলিম গুনাহ করে এবং যদি সে তাওবা করে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে তিনি (সেটা লেখা থেকে) বিরত থাকেন। অন্যথায় তিনি একটি (মন্দ আমল) লিপিবদ্ধ করেন। (আলবানির তাহকীককৃত নির্ভরযোগ্য হাদিস)

৫.৫ প্রতিযোগিতামূলক তাড়না

জীবনে অর্থপূর্ণ কোনোকিছু অর্জনের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সকলেই চায় কোনো বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করতে কিংবা উঁচু মানের জীবন কাটাতে। এই ধারণাটাকে বলা হয় 'এচিভমেন্ট মোটিভেশন' বা অর্জনের অনুপ্রেরণা। এখানে একই সাথে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা চলে আসে। প্রতিযোগিতা করা ও অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার তাড়নাটি (drive) বিভিন্ন আকাংক্ষিত লক্ষ্যের সাথে জড়িত। সেটা বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু হতে পারে, অর্থনৈতিক কোনো লক্ষ্য হতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো অবস্থানও হতে পারে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কিছু উপকারিতা থাকলেও স্মরণ রাখতে হবে যেন সেটা ইসলামি শরিয়াহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করে ফেলে।

আমাদেরকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আর তা হলো উত্তম ও নেক আমল, সদাচার। এই প্রতিযোগিতা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা অর্জনের জন্য, জান্নাত লাভের জন্য। আল্লাহ কুরআনে এই প্রতিযোগিতার আলোচনা করে বলেছেন:

- 'নিশ্চয়ই সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। **এ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।'** (সূরাহ মুতাফফিফিন, ৮৩:২২-২৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।' (সূরাহ হাদীদ, ৫৭:২১)

- 'অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে,' (সূরাহ ওয়াকেয়াহ, ৫৬:১০-১২)

তারাই অগ্রবর্তী যারা এই প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করেছে ও দুনিয়ার জীবনকে কাজে লাগিয়ে আখিরাতে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। আখিরাতেও তারা অন্যদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং অর্জন করে নেবে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা।

৫.৬ বস্তুগত তাড়না

মানুষের সহজাত স্বভাবে লালায়িত রয়েছে বস্তুগত সামগ্রী অর্জনের ইচ্ছা। এজন্য মানুষ একে অপরের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। এই তাড়নার সাথে মূলত জড়িয়ে আছে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ, দারিদ্র্য ও অভাব থেকে মুক্তি ইত্যাদি বিষয়। কুরআন ও হাদিস— উভয় স্থানে এই তাড়নার আলোচনা এসেছে:

- 'মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।' (সূরাহ হাদীদ, ৫৭:২০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবে অবশ্যই সে দ্বিতীয় আরেকটি চাইবে। আর মাটি ছাড়া কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।' (উত্তম সনদে বর্ণিত, আহমাদ, তাবারানি)।

উল্লেখিত কুরআনের আয়াত এবং হাদিস হতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সম্পদ আহরণের তাড়না আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে প্রদান করেছেন। তবে এটিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। এই চাহিদা আমাদের মাঝে দেবার উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে পরীক্ষা করা। যাদেরকে সম্পদ দেয়া হয়েছে তারা সেটা বৈধ পথে খরচ করছে কিনা এবং যারা সম্পদ অর্জন করছে তারাও বৈধ পথে অর্জন করছে কিনা, আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করছে কিনা, সম্পদের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে কিনা ইত্যাদি যাচাই করার জন্য।

সাধারণভাবে, সম্পদ ও রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। কাকে কতটুকু সম্পদ দেয়া হবে সেগুলো তাকদিরে নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন,

- 'আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।' (সূরাহ হুদ, ১১:৬)

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখনই তাকদির অনুসারে তার দুনিয়ার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তারপর সেখানে

(মাতৃগর্ভে) ফেরেশতা পাঠানো হয়। অতঃপর সে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করায় এবং ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়—(গর্ভে থাকা শিশুর) রিজিক, বয়স, আমল এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান। (বুখারি)

একজন ব্যক্তি যাই করুক না কেন তাকদিরে নির্ধারিত রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যা তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে সেটা পাবেই আর যা পায়নি তা কখনো পাবার ছিল না।[৫] সুতরাং যদি কেউ মনে করে সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবে অথবা আল্লাহর ইবাদাতে কিছু ছাড় দিলে আরও বাড়তি আয় হবে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।[৬]

সম্পদ ও দুনিয়ার আনন্দদায়ক বস্তু অর্জনে কাজ করায় কোনো পাপ নেই। তবে অবশ্যই সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং সম্পদ অর্জন করা যেন ব্যক্তির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। যদি হালাল পথে, বিশুদ্ধ উপায়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উপার্জন করা হয় তবে সেটাও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছ থেকে সেই কাজের পুরস্কার প্রদান করা হবে। এভাবে সম্পদ উপার্জনকে একটি নিয়ামতে পরিণত করা যায়। আর নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে করলে সেটা হবে অভিশাপ।

- 'বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (সূরাহ তাওবা, ৯:২৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

'হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।' (সূরাহ তাওবা, ৯:৩৪-৩৫)

---

[৫] Qadhi, 2002, 15 Ways to Increase Your Earnings from the Qur'an and Sunnah. Birmingham, UK: Al-Hidaayah Publishing and Distribution, p. 16.
[৬] Ibid., p. 14.

• অন্যত্র বলেছেন,

'মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (সূরাহ ফজর, ৮৯:১৫-২০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং খামিসার (এক ধরণের দামী পোশাক) গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক , অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দেবে না। ...' (বুখারি)।

এই সুনির্দিষ্ট হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে যারা সম্পদ কে ভালবাসে তারা সম্পদের গোলামে পরিণত হয়। আর যারা নিজেদের লালসা ও আকাঙ্ক্ষার গোলামে পরিণত হয় তারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর গোলাম হতে পারেনা। তারা যত বেশি দুনিয়াকে ভালোবাসবে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও নিবেদন তত কমে আসতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামত যত নিকটবর্তী হতে থাকবে ততই দুনিয়ার প্রতি মানুষের লালসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে তারা আল্লাহ থেকে বহু দূরে সরে যাবে।' (আল-হাকিম, উত্তম সনদে বর্ণিত হাদিস)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই উম্মাহর জন্য সম্পদের ফিতনার আশংকা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের উপরে দারিদ্র্যের ভয় করি না বরং আমি ভয় করি তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পদের আধিক্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করবে।' (আল হাকিম, বিশুদ্ধ হাদিস)। এ কারণে তিনি প্রায়শই এই দুআ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাই সম্পদের ফিতনা থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই দারিদ্রের অভিশাপ থেকে।' (বুখারি ও মুসলিম)

৫.৭ আগ্রাসী তাড়না

মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, বিশেষত যখন উস্কানি দেয়া হয় কিংবা আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়। আগ্রাসনের সংজ্ঞায় বলা যায়; এটি ঐ সকল শারীরিক বা মৌখিক কাজ যার উদ্দেশ্য ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন করা, এটা পূর্বশত্রুতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, অথবা ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পনার শেষ ধাপ হিসেবেও হতে পারে।[৭] আদম (আ.) এর সৃষ্টির ঘটনায় মানুষের এই আগ্রাসী প্রবণতার প্রমাণ রয়েছে:

---

[৭] Myers, 2007, p. 751.

- 'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৩০)

সম্ভাব্য বিভিন্ন কারণে ফেরেশতারা জানতেন, আল্লাহর এই নতুন সৃষ্টি (মানুষ) উল্লেখিত ধ্বংসাত্মক কাজগুলো করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানান যে, মানবসৃষ্টির মাঝে এক বিশেষ প্রজ্ঞা নিহিত যার গূঢ়ার্থ একমাত্র তিনিই জানেন।

যখন আদম ও হাওয়াকে অবাধ্যতার কারণে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হচ্ছিল, তখন আল্লাহ বলেছিলেন:

- '...এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৩৬)

এ আয়াতে (শয়তানের সাথে মানুষের শত্রুতা এবং) মানুষের পারস্পরিক শত্রুতার কথা এসেছে। এগুলোর ফলে বিভিন্ন সংঘাত-সংঘর্ষ, হিংসাত্মক আচরণ ও এমনকি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয়।

বস্তুত মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম আগ্রাসী কাজটি ঘটেছিল আদম (আ.) এর দুই সন্তান হাবিল ও কাবিলের ঘটনায়। কাবিল নিজের ভাই হাবিলকে হিংসার বশবর্তী হয়ে খুন করেছিল। ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, আগ্রাসী মনোভাবের সাথে আমাদের কুপ্রবৃত্তিও জড়িত। আল্লাহ বলেন:

- 'আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা ভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ২৭-৩০)

জৈবিক (বায়োলজিক্যাল) এবং পরিবেশগত উভয় কারণের উপস্থিতিতে আগ্রাসন সৃষ্টি হয় ও প্রভাবিত হয়। কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এটা এতক্ষণে স্পষ্ট যে, মানুষ চাইলে নিজের আগ্রাসী মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সামাজিকভাবে 'গ্রহণযোগ্য' আচরণ বজায় রাখতে পারে। যদিও সমাজের উপকারার্থেও আগ্রাসনের

আলাদা কল্যাণদায়ী ভূমিকা রয়েছে, যেমন বিশেষ করে 'জিহাদ'-এর আমলটি। জিহাদ একটি আরবি পরিভাষা; যার শাব্দিক অর্থ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম-উন্নতি সাধনের চেষ্টা প্রভৃতি। শাব্দিক অর্থে এটি একজন ব্যক্তির যেকোনো ধরনের প্রচেষ্টাকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় এর সাধারণ ও স্বাভাবিক অর্থকেই বুঝতে হবে*।[৮] (অর্থাৎ শাব্দিক অর্থের বদলে পারিভাষিক অর্থ প্রযোজ্য হবে)। ইসলামি পরিভাষায় জিহাদ অর্থ হলো, আল্লাহর পথে বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা। জিহাদের লক্ষ্য আমাদের অন্তর থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি, সমাজ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্ বলেন,

• 'তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত।...' (সূরাহ হাজ্জ, ২২:৭৮)

• অন্যত্র বলেছেন,

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।' (সূরাহ্ আনকাবুত, ২৯:৬৯)

এরই অংশ হিসেবে যখন দৈহিক ও মিলিটারি (সামরিক) যুদ্ধের বিষয়টি আসে, তখন সঙ্গতকারণেই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে নানা আগ্রাসন পরিচালনা করতে হয়।

• 'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।' (সূরাহ্ হুজুরাত , ৪৯:১৫)

• অন্যত্র বলেছেন,

'আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।... আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।' (সূরাহ্ বাকারাহ্, ২:১৯০-১৯৩)

---

[৮] * কুরআনে যেসকল আয়াতে জিহাদ শব্দ এসেছে, তার মধ্যে কেবল চারটি স্থানে সাধারণ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম অর্থ অন্তর্ভুক্ত; অন্যান্য আয়াতে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা বোঝানো হয়েছে। সেগুলো হলো সূরাহ হাজ্জ ২২:৭৮, সূরাহ্ আনকাবুত ২৯:6,৬৯, সূরাহ ফুরকান ২৫:৫২ এবং সূরাহ তাহরীম ৬৬:৯। সূত্র – ইবনে নুহাস।

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা*[১] দূরীভূত হয়ে এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।' (সূরাহ আনফাল, ৮:৩৯)

জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াতে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা, যেমনটি উল্লেখিত আয়াতে এসেছে। তিনি একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। একমাত্র তাঁর ইবাদাতের মাধ্যমেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। বৈধ ও অবৈধ আগ্রাসনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো নিয়ত এবং লক্ষ্য। আল্লাহ বলেছেন,

> • 'যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহে। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের রাহে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।' (সূরাহ নিসা, ৪:৭৬)

কাজেই প্রকৃত ঈমানদাররা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর কাফিররা লড়াই করে নানান বাতিল ইলাহ ও পূজনীয় বস্তু বা মতাদর্শের পক্ষে (যেমন- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ক্ষমতা, তেল, সম্পদ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত)।

আল্লাহর কালিমা ও আইনকে জমিনে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল (সার্বভৌমত্ব) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা জিহাদের লক্ষ্য। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার জন্য লড়াই করে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।' (বুখারি)। এ বিষয়টি সহজেই বোঝা যায়। কেননা, প্রকৃত অর্থে আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদাত করা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যক্রমে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী থাকবে। ইসলাম একমাত্র দ্বীন যা সার্বিকভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের উপর জোর দিয়েছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে— সামাজিক থেকে অর্থনৈতিক, পারিবারিক থেকে রাজনৈতিক, প্রতিটি ক্ষেত্রে। আল্লাহর কালিমা বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম। এর সাথে অনিবার্যভাবে জিহাদের অন্যান্য লক্ষ্যগুলো জড়িত থাকে। তবে প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ হলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য লক্ষ্যগুলো পূরণ হতে থাকবে। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে জমিনের বুক থেকে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, শোষণ, বঞ্চনা নিরসন করা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি।

এমনকি যে সকল মুমিনরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদের আমল করছেন, তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যেন পদ্ধতিগতভাবে এই কাজটি আল্লাহর শরিয়াহ মোতাবেক সম্পাদিত হয়। কুরআনের বিভিন্ন জিহাদের আয়াতে নানা সতর্কবাণীর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। যেমন নারী, শিশু ও বয়স্কদের হত্যা

---

[১] • ফিতনা শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এখানে ফিতনা অর্থ কুফর ও শিরকের শাসন। তাফসীর মারেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত। ৮:৩৯ আয়াতের তাফসীর দ্র।

করা যাবে না যতক্ষণ না তারা নিজেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। সাধারণভাবে সকল ধরনের নৃশংসতা, নির্মমতা, অত্যাচার করা, মৃতদেহ বিকৃত করা, অঙ্গহানি ঘটানো ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই সীমাগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়াটা আমাদের বর্তমান মুসলিমদের মারাত্মক একটি ভুল। এবং এটিকে কেন্দ্র করে অমুসলিমরা বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ওপর নানারকম জঘন্য আক্রমণ পরিচালনা করছে। এই সব ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা ইসলামকে বিকৃত করছে এবং লোকেদেরকে ইসলামের প্রকৃত বার্তা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

৫.৮ সহযোগী তাড়না

অপরের সাথে মানসিক বন্ধনের অনুভূতি এবং অনেকের মাঝে নিজের জায়গাটা অনুভব করা (আমি এই পরিবারেরই একজন—এই বোধ) মানুষের আরেকটি অন্তর্নিহিত **তাড়না**। মানুষ যে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট থাকে ও নিজের গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে ফেরে—তা এই চাহিদারই প্রকাশ। যেমন ধরুন বন্ধুত্ব, বিয়ে ও পরিবারের মাঝে আমরা সামাজিক নিশ্চয়তা অনুভব করি যা আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। ফলে আমাদের ডিপ্রেশন, আত্মহত্যা ও অল্পবয়সে মৃত্যুর হারও কমে আসে। পক্ষান্তরে, নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরা অনেক বেশি মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা অনুভব করেন। এ বিষয়টি সামনে সামাজিক সাইকোলজি অধ্যায়ে আরও আলোচনায় আসবে। এখানে আমরা বিষয়টি উল্লেখ করলাম কারণ এটি মানুষের জীবনে খুবই শক্তিশালী 'মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর'।

৫.৯ তাড়না ও অভিপ্রায় (motives) পূরণে মধ্যমপন্থা

দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের তাড়না পূরণ করা জীবনে পরিতৃপ্ত ও 'ভালো থাকা'র জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যেও এগুলো জরুরি। আমাদের ভিতরে এই চাহিদাগুলো আল্লাহ তাআলা বিনা কারণে সৃষ্টি করেননি, এগুলো পুরোপুরি দমন করার নির্দেশনাও প্রদান করেননি যেমনটি অন্যান্য ধর্মে (বৈরাগ্য অনুসরণের মাধ্যমে) দেখা যায়। বরং ইসলামি শরিয়তে নির্ধারিত সীমানা মেনে এসব চাহিদা পরিতৃপ্ত করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক এই অনুভূতিগুলো পরিচালনা করলে ব্যক্তিও লাভবান হয়, উপকৃত হয় সমাজও। জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে অবশ্যই এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে যেন সেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে।

এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হারাম বিষয় পরিহার করা। যেমন হারাম খাদ্য, পানীয়, যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বৈধ চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অনুসরণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্তরে ঈমান ও তাকওয়া থাকলে এসব চাহিদাকে বৈধ উপায়ে তৃপ্ত করে সন্তুষ্ট থাকা যায়। কেননা এই দৃঢ়বিশ্বাস ও আল্লাহভীতিই করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো ইলমের ভিত্তিতে চিনিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন,

- 'হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরাহ আরাফ, ৭:৩১)

খাদ্য পানীয় গ্রহণে মধ্যমপন্থা অনুসরণের গুরুত্ব গবেষণার মাধ্যমে আজ নিশ্চিত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি অতিরিক্ত পানাহার করা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অধিক খাদ্য গ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্থূলদেহের অধিকারী হবার ফলে নানা রকমের ক্রনিক (দীর্ঘমেয়াদী) রোগে আক্রান্ত হন। যেমন- উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ। এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় তারা মৃত্যুবরণও করেন অল্প বয়সে। এছাড়া স্থূলদেহী হবার কারণে মর্মপীড়া, আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি নানান মানসিক সমস্যায় তাদেরকে ভুগতে দেখা যায়।

একইভাবে ধন-সম্পদের ব্যাপারেও আমাদেরকে মধ্যমপন্থী হতে হবে। মিতব্যয়িতার নামে কৃপণতা পরিহার করতে হবে, দান সাদাকা-র অভ্যাস করতে হবে। তবে কোনো কাজেই অপচয়কারী ও অমিতব্যয়ী হওয়া যাবে না, বিলাসিতা করা যাবে না। ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে উভয় ধরনের প্রান্তিকতা বর্তমান দুনিয়ার একটি সাধারণ চিত্র। অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে বা সম্পদ শেষ হয়ে যাবার ভয়ে সম্পদ জমিয়ে রাখে। আবার অনেকে বেখেয়ালি হয়ে বিলাস-ব্যসনে সম্পদ খরচ করে, যা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। বিশেষত যখন সারা দুনিয়ায় এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। মুমিনরা কিভাবে নিজেদের সম্পদ সামলায় থাকে সে সম্পর্কে আল্লাহ জানিয়েছেন,

- 'এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।' (সূরাহ ফুরকান, ২৫:৬৭)

৫.১০ সম্পদ ও সুখের পারস্পরিক সম্পর্ক

এবারে আমরা দারুণ একটি গবেষণার ফলাফল দেখব। সম্পদ ও সুখের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে এই গবেষণাটি করা হয়েছিল। গবেষণায় উঠে এসেছে, 'weath is like health: its utter absence can breed misery, yet having it is no guarantee of happiness' অর্থাৎ, 'সম্পদ ঠিক স্বাস্থ্যের মতো; এর অনুপস্থিতি কৃপণতা সৃষ্টি করে, তবে সম্পদ থাকলেই সুখপ্রাপ্তির গ্যারান্টি আছে তা নয়।'[১০] মায়ার্স(Myers) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টেনেছেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৯৫ সাল এর মধ্যে দেখা গেছে, একজন গড়পড়তা আমেরিকার নাগরিকের উপার্জন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (ট্যাক্স প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকে)। কিন্তু পূর্বের তুলনায় ধনী হলেও তাদের জীবনে সুখ কিন্তু বাড়েনি। ১৯৫৭ সালে ৩৫% লোক বলেছেন তারা 'খুবই সুখী', একই কথা ২০০৪ সালে বলেছেন ৩৪% লোক। আমেরিকা এবং একই সাথে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং চীনে পরিচালিত জরিপ থেকে সিদ্ধান্ত যেটা এলো তা হলো - "economic growth in affluent countries has provided no apparent

[১০] Myers, 2007, p. 540.

boost to morale or social well being" – অর্থাৎ, "ধনী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের নৈতিক বা সামাজিক জীবনে কোনো দৃশ্যমান উন্নতি ঘটাতে পারেনি।"[১১] উপরন্তু অনেকে এমন যুক্তিও পেশ করতে পারেন যে, এসব 'উন্নত দেশে'র লোকেরাই বরং বেশি দুঃখ-কষ্টে আছে। কেনন, তাদের মধ্যে অপরাধ, তালাক, কিশোর বয়সে আত্মহত্যা ও ডিপ্রেশনের হার বেশি।

স্টাডিতে আরও দেখা গেছে, যারা অধিক সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে তাদের আবেগিক স্বাস্থ্যের গ্রাফ নিম্নমুখী। বিশেষত যারা ক্ষমতা অর্জন করা, লোক দেখানো বা নিজেকে প্রমাণের জন্য সম্পদ উপার্জন করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি অধিক সত্য। যারা 'যা পেয়েছি তাতেই খুশি' থাকে অর্থাৎ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবনযাপন করে তারা অন্যদের তুলনায় অধিক সুখ অনুভব করে।[১২] গবেষণার মাধ্যমে উঠে আসা এই বিষয়টি বহু আগেই আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করেছেন ওহীর মাধ্যমে। ইসলাম আমাদের শেখায়, নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সেই আল্লাহর প্রতি, যিনি আমাদের সকল নিয়ামতরাজি সরবরাহ করে চলেছেন।

---

[১১] Ibid., pp. 540-541.
[১২] Ibid., pp. 540-541.

||অধ্যায় ছয়||

আবেগ

• 'এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান।' (সূরাহ নাজম, ৫৩:৪৩)

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো আবেগ। উপরের আয়াত আমাদের জানাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে হাসি, কান্না, আনন্দ, ভাবনা প্রভৃতির ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে এসবের উপযুক্ত কারণও তিনিই তৈরি করেন।[১] একবার ভেবে দেখুন, জীবনটা কত পানসে হতো যদি কোনো ভালোবাসা, আনন্দ না থাকত! এমনকি যদি কোনো দুঃখ, রাগও না থাকত, তখন আমরা কেমন রোবটের মতো হয়ে যেতাম ভাবুন তো! জীবনে কোনো আনন্দ বা হতাশা কিছুই থাকত না। একটি আবেগিক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ অংশটা হলো ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি ও দেহাভ্যন্তরের স্বাস্থ্যগত অবস্থা, যা দেখা যায় না। আর এর বাহ্যিক প্রকাশ হলো চেহারার অভিব্যক্তি ও আচার-আচরণসমূহ, যা বাইরে প্রকাশ পায়। বিশ্বব্যাপী মানুষ একইভাবে আবেগ অনুভূতির প্রকাশ করে। এতে প্রমাণ হয় যে, আবেগ মিশে আছে আমাদের সহজাত স্বভাবের মাঝে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানেও বিষয়টি বার বার এসেছে।

সাধারণভাবে আবেগকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক— এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ইতিবাচক আবেগের মধ্যে রয়েছে আনন্দ আর নেতিবাচক আবেগের মধ্যে রয়েছে দুঃখ। যদিও আমরা সাধারণত ইতিবাচক আবেগ-অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি, তবে নেতিবাচক আবেগেরও বেশ গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে। যেমন- একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগান্বিত হওয়া। যদিও রাগ নেতিবাচক আবেগের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে রাগের প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। যেমন- উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আল্লাহর দ্বীনের জন্য ক্রোধের ব্যাপারে বিখ্যাত ছিলেন।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, আবেগও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সফলতার অর্থ নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রবাহিত করা। যেহেতু আবেগ একটি সহজাত ও স্বাভাবিক অনুভূতি, কাজেই এটা নির্মূল করতে বলা হয়নি আমাদেরকে। দুঃখ, রাগ এসব আমরা অনুভব করতেই পারি।

---

[১] Ibn Kathir, 2000, Vol. 9, pp. 336-337. 2

তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, সবখানেই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রয়েছে এবং তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন আবেগের প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় বহিঃপ্রকাশের সীমানা।

৬.১ ভালোবাসা

ভালোবাসা একটি সহজাত ও সর্বজনীন অনুভূতি। এটি বিভিন্নরূপে ও মাত্রায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। আমরা আমাদের জীবনসঙ্গীকে একভাবে ভালোবাসি, পিতামাতাকে আরেকভাবে, আবার শিশুদেরকে আরেকভাবে ভালোবাসি। এগুলো সবই আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের অংশ। এগুলো সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও উৎসাহিত; এমনকি কিছুক্ষেত্রে কাফিরদের প্রতিও সহানুভূতির কথা বলা হয়েছে। এখানে একমাত্র শর্ত এটাই যে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর থেকে বেশি ভালোবাসা যাবে না। ভালোবাসা নিন্দনীয় হবে তখন, যখন কোনোকিছুকে বা কাউকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসা হবে, কিংবা কারো ভালোবাসা, স্বীকৃতি, অনুমোদন পেতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা অনন্য ও পৃথক এক ভালোবাসা, যা বাকি সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র।

ঈমানের একটি জরুরি ও বাধ্যতামূলক অনুষঙ্গ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা। একইভাবে অন্যান্য মুমিনদেরকেও ভালোবাসতে হবে এবং যা কিছু আল্লাহ উত্তম ও কল্যাণকর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন (ঈমান, আমল) সেগুলোকেও ভালোবাসতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাকে অন্যসব ভালোবাসার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে, যেমন- নিজের পরিবার, সম্পদ বা দুনিয়ার অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে বেশি। আল্লাহ বলেছেন:

- 'বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (সূরাহ তাওবা, ৯:২৪)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্য যেকোনো ব্যক্তি, বস্তু তথা সবকিছু থেকে বেশি ভালোবাসা সত্যিকার মুমিনের নিদর্শন। এর মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ অনুভব করা যায়। এই ভালোবাসার অর্থ বান্দা আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জনের ভিতরে সুখ খুঁজে পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর থেকে প্রিয় হওয়া; (২) কাউকে খালিস আল্লাহর জন্যই মুহাব্বত করা; (৩) কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা।' (মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।' (মুসলিম)

আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ তার আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করা। অনুগত হৃদয়ে, উৎসাহের সাথে তাঁর আনুগত্য করতে হবে যদিও সেটা আমাদের নফসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোক না কেন। আল্লাহ যা কিছু বাধ্যতামূলক করেছেন ও অনুমোদন করেছেন সেগুলোকে ভালোবাসতে হবে। আর যা কিছু নিষেধ করেছেন সেগুলো ঘৃণা করতে হবে। আল্লাহর হিকমত, কুরআন ও শরিয়াহ-কে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা ও তা অনুসরণ করে সুপথ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখা ও ব্যাকুল হওয়া এই ভালোবাসার লক্ষণ।

আর রাসূলকে ভালোবাসার অর্থ হলো তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যত বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন সেগুলোর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের দৈনন্দিন জীবনে সর্বোচ্চ সাধ্যমত সুন্নাহ বাস্তবায়ন করা। মুমিন হিসেবে আমরা সকল নবি রাসূল, তাদের অনুসারী ও নেক বান্দাদের ভালোবাসি, কারণ তারা সকলেই আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা-ই করেছেন। আল্লাহকে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে আমরা তাদেরকেও ভালোবাসব ও ওয়ালি (বন্ধু, মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করব। এর অর্থ তাঁদেরকে মুহাব্বত করা, সাহায্য-সমর্থন যোগানো, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা-সম্মান-শ্রদ্ধা ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৫৫-৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা যারা মুত্তাকী, সে যেই হোক, যেখানেই থাকুক।' (আহমাদ, সনদ উত্তম)

যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের পরিচয় এসেছে এই আয়াতে,

- 'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৫৪)

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহও যাদেরকে ভালোবাসেন, এই আয়াতে তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো;

১। মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হওয়া; অর্থাৎ তারা দ্বীনি ভাইবোনদের প্রতি নম্র, সহমর্মী এবং সদয়।

২। সেসব কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ও কঠোরতা পোষণ করা যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

৩। নিজের জান, হাত, জিহ্বা (কথা), সম্পদ তথা সবকিছু দিয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৪। কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করা বরং এই ভেবে অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করা যে এই কাজগুলো আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক হলে সমালোচনাকারীর সমালোচনা কিংবা প্রশংসাকারীর প্রশংসায় কিছু এসে যায় না।

এই মূলনীতিগুলো বোঝা ও কবুল করার মাধ্যমে আমাদের ঈমান মজবুত হবে ও আমরা আল্লাহর নিকটতর হতে পারব।

৬.২ ভয়

সাধারণত ভয়কে নেতিবাচক আবেগের মধ্যে গণ্য করা হয়। আমরা ভয় পাই কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, যেমন- কোনো ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় আমরা ভয় পাই। এটি একটি সহজাত প্রতিক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদেরকে ব্যথা-বেদনা, ক্ষতি, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া কিংবা মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। যখন আমরা কোনো ভীতিকর বস্তু বা পরিস্থিতির উপস্থিতি অনুভব করি তখন আতঙ্কিত হয়ে সেই বিষয় থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, কোনো কিছুকেই আল্লাহর থেকে বেশি ভয় করা চলবে না।

৬.২১ আল্লাহর ভয়

যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, তখন তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবে এবং আনুগত্যের মাধ্যমে চেষ্টা করবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের। আল্লাহ বলেন,

- 'অতএব, আল্লাহর দিকে পলায়ন করো ...(সূরাহ যারিয়াত, ৫১:৫০)

আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া বা পলায়ন করার অর্থ শিরক, কুফর ও গুনাহের গ্রাস থেকে পলায়ন করা, তাওবা ইস্তিগফার করা ও আল্লাহর রহমত তালাশ করা। এভাবে একজন ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে পলায়ন করে প্রবেশ করে তাঁর রহমতের মধ্যে। বাস্তবে কারো পক্ষেই কখনো আল্লাহ থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়, একমাত্র প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিই এটি বোঝেন। এখানে একটি চমৎকার বিষয় কিন্তু লক্ষণীয়, 'যখন কেউ কোনো সৃষ্টিকে ভয় করে তখন তার বিপরীত দিকে পলায়ন করে। কিন্তু যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করে সে আল্লাহর দিকেই দৌড়ে আসে।'[২]

কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহকে ভয় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অন্য কোনো সৃষ্টি বা মানুষকে ভয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

---

[2] al-Syed, M. F., 1995, Fear of Allah in the Light of the Quran, the Sunnah and the Predecessors, 'Compiled from the works of Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, and Abu Hamid al-Ghazali', (M.A. Kholwadia, Trans.), London: Al-Firdous Ltd., p. 9.

• 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (সূরাহ নিসা, ৪:১)

• অন্যত্র বলেছেন,

'... আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।...'(সূরাহ বাকারাহ, ২:১৯৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

'যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৭৬)

• অন্যত্র বলেছেন,

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১০২)

৬.২.২ বিচার দিবস ও জাহান্নামের ভয়

প্রকৃত ঈমানদাররা বিচার দিবস ও জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির ভয় রাখে। এই ভয়ই তাদেরকে টিকিয়ে রাখে সরল পথের উপর এবং বাঁচিয়ে রাখে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

• 'আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৪৮)

• অন্যত্র বলেছেন,

'আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:১৫)

• অন্যত্র বলেছেন,

'আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি।' (সূরাহ ইনসান,৭৬:১০)

• অন্যত্র বলেছেন,

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে...' (সূরাহ নাযিয়াত, ৭৯:৪০)

• অন্যত্র বলেছেন,

'এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' (সূরাহ আলে ইমরান,৩:১৩১)

৬.৩ আশা

আশার সমার্থক বিষয় হলো সুধারণা পোষণ করা, ইতিবাচক মানসিকতা রাখা। আর বিপরীত বিষয় হলো নৈরাশ্য। আশাবাদী ব্যক্তি সবকিছুর মধ্যে উত্তম ও কল্যাণকর বিষয় প্রত্যাশা করে। যেমন- কোনো গ্লাসে অর্ধেক পানি থাকলে সে বলে, 'এই গ্লাসের অর্ধেকটা ভর্তি!' আশাবাদী ব্যক্তির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে ইতিবাচক মানসিকতা থেকে এবং ভালো ভবিষ্যতের প্রত্যাশা মনে লালন করে।

মুমিন হিসেবে আমরা সব সময় প্রতিটি বিষয়ে সর্বোত্তম ফলাফলের আশা রাখব। বিশেষত কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত ও ফজলের আশা হারানো যাবে না। আল্লাহ বলেন,

• 'পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' (সূরাহ আরাফ, ৭:৫৬)

• অন্যত্র বলেছেন,

'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:১৬)

এই আয়াত দুটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে মুমিনের অন্তরে থাকা আশার কথা, যে আশা সে করে আল্লাহর ওয়াদাকৃত বিরাট পুরস্কারের জন্য। যে লোক বিচার দিবসকে স্মরণ রাখে এবং সেই দিনের সফলতা ও পুরস্কারের আশা রাখে, সে তো ভালো কাজে আরও উৎসাহ পাবে, এটাই স্বাভাবিক। দুনিয়াবী প্রাপ্তিতে ঘাটতি হলেও আখিরাতের পুরস্কার ও সুখস্বপ্নের মাঝে সে সান্ত্বনা খুঁজে নেবে। আর আখিরাতের সবচেয়ে আনন্দদায়ক পুরস্কার তো হবে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করা। সুবহানআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যদি কোনো কাফির আল্লাহর রহমত সম্পর্কে জানত, সে জান্নাতে প্রবেশের আশা হারাত না। আর যদি কোনো মুমিন আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে জানত, সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করত না।' (বুখারি)

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মুমূর্ষু বালককে দেখতে গেলেন। রাসূল (সা.) জানতে চাইলেন, তুমি কেমন বোধ করছ? বালক জবাব দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর প্রতি আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি রয়েছি। তিনি বললেন, এই দুই অবস্থা একত্রে কোনো বান্দার অন্তরে জমা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে আশাকৃত

বিষয় প্রদান করবেন ও ভীতিকর বিষয় থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।' (তিরমিযি, ইবনু মাজাহ এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা)।

একটি চমকপ্রদ বিষয়

'আশাবাদ ও সুস্বাস্থ্য' এই বিষয়ে গবেষণাগুলো আমাদের জানাচ্ছে, যারা তুলনামূলকভাবে অধিক আশাবাদী ও ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী, তারা অন্যদের চেয়ে ভালো দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করে থাকেন। আশাবাদী মানুষের ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা, মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ কম থাকে। আশাবাদী পুরুষদের মধ্যে হৃদরোগের (coronary heart disease) হার কম, ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বেশি, সার্জারি থেকে দ্রুত সেরে উঠার হার বেশি। ইতিবাচকতার সাথে সুস্বাস্থ্যের যে সম্পর্ক, এর কারণ হতে পারে অনেকগুলো; যেমন- অন্যদের তুলনায় বেশি অ্যাক্টিভ থাকা, মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকা (coping effort), স্ট্রেস এর সাথে সুন্দরভাবে মানিয়ে নেয়া (চাপ ও ধকলপূর্ণ পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা), আশেপাশের মানুষের সহানুভূতি খোঁজা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন (শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যাভ্যাস) ইত্যাদি।

৬.৪ ভালোবাসা, ভয় ও আশার মধ্যে ভারসাম্য

প্রকৃত ঈমানদার ভালোবাসা, ভয় ও আশা— এই আবেগগুলোর মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। কোনো একটিকে অন্যটির চেয়ে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় না। আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি কারণ আমাদের উপর প্রতিনিয়ত অগণিত নিয়ামত দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। একই সাথে আমরা নিজ গুনাহের দোষে তাঁর শাস্তি ও অসন্তুষ্টিকে ভয়ও করি। আবার একই সাথে আমরা এই আশাও রাখি যে, তিনি আমাদের ভালো আমলগুলো কবুল করে নেবেন এবং তাওবা কবুল করে গুনাহ মাফ করে দেবেন।

ইবনু রজব (রহ.) চমৎকারভাবে লিখেছেন, যদি কোনো মুসলিম আশা, ভয় ও ভালোবাসার মধ্যে কেবল একটির ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদাত করে তবে সে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্টতায় চলে যাবে। তিনি লিখেছেন,

> '...যে ব্যক্তি ভয়, ভালোবাসা ও আশার ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদাত করে সে একজন মুওয়াহহিদ মুমিন (তাওহিদবাদী ঈমানদার)। প্রকৃত মুমিন কখনো অন্যগুলো বাদ দিয়ে কেবল একটি আবেগের প্রতি ঝুঁকে থাকে না। সেটা আশা, ভয় বা ভীতি যাই হোক না কেন। এককভাবে কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরা পথভ্রষ্ট দলগুলোর কাজ। এই জায়গায় ভারসাম্যহীনতার কারণে কেবলমাত্র আবেগই ভারসাম্যহীন হয় না, ঈমানও টালমাটাল হয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকটি আবেগিক উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। যাতে করে একজন ব্যক্তির জন্য সত্যপথে চলার অনুপ্রেরণা মেলে বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে।'[৩]

---

[3] Ibn Rajab, Worshipping Allah out of love, fear, and hope, retrieved October 10, 2010 fromhttp://abdurrahman.org/salah/worshippingallahoutof.html.

৬.৫ ঘৃণা

যেভাবে আমরা আল্লাহ ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে ভালোবাসব, ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে ঘৃণা করব যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ ও তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামের সক্রিয় বিরোধিতা করে। এই ঘৃণা হবে কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কোনো পদক্ষেপও নেয়া যাবে না, কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখানো চলবে না। যে বিষয়গুলোর প্রতি ঘৃণা রাখা জরুরি তার মধ্যে রয়েছে কুফর (যখন অবিশ্বাসটা না জানার কারণে নয়), নিফাক, বিদআত এবং গুনাহ। কুফর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

- 'তোমাদের জন্যে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে...(সূরাহ মুমতাহানা, ৬০:৪)

মুনাফিকরা ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু। আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে ঘৃণা করা বাধ্যতামূলক। কুরআনে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। সুতরাং একজন প্রকৃত ঈমানদারের অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছুই থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?' (সূরাহ মুনাফিকুন, ৬৩:২-৪)

একই কথা প্রযোজ্য ফাসেক, গুনাহগার ও বিদাতিদের ক্ষেত্রে। তাদের প্রতি ঘৃণার মাত্রা নির্ধারিত হবে ইসলাম হতে তাদের দূরত্ব অনুসারে।

অন্তরে ঘৃণা রাখার পর তাদের সাথে নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করতে হবে। মুমিনদের কর্তব্য হলো যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক ও দূরে রাখা। তাদের শত্রুতা ও বৈরিতার মাত্রানুসারে তাদের প্রতি শত্রুতা ও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। সকল কাফিররাই এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন ইহুদি-খ্রিস্টান, নাস্তিক, মুশরিক, মুরতাদ নির্বিশেষে যারাই সক্রিয়ভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির চেষ্টায় ব্যস্ত। এই বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের বহু আয়াত দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি আয়াত সামনে উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহ বলেছেন,

• 'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' (সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮:২২)

• অন্যত্র বলেছেন,

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (সূরাহ তাওবা, ৯:২৩-২৪)

এমন অনেক কাফির রয়েছে যারা ইসলামের বার্তা পায়নি এবং এ কারণে সেটা কবুল করেনি। আবার অনেকে ইসলামের বার্তা পেয়েছে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশ্য তারা ইসলাম ও মুসলিমের ক্ষতি করে না, কিংবা শত্রুদের সহায়তাও করে না। তারা এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহর রাহে ঘৃণা ও ভালবাসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হলো আমাদের অন্তর।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন,

'কোনো কিছুর প্রতি ঘৃণা-ভালোবাসা বা পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে অন্তরে অবশ্যই পরিপূর্ণতা থাকতে হবে। অন্তরে কোনো ঘাটতির অর্থ ঈমানের ঘাটতি, তা না হলে অন্তরে এ ব্যাপারে কোনো কমতি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কর্মের কথায় এলে, কর্ম মানুষের নিজ সামর্থ্য ও পরিস্থিতির অনুসারে কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু অন্তরে কোনো কমতি থাকা চলবে না। অন্তরের পছন্দ-অপছন্দ যখন পরিপূর্ণতা পায়, তখন মানুষ কর্মে উদ্বুদ্ধ হয় নিজ সক্ষমতা অনুপাতে যতটুকু কুলায়। যতটুকুই সে করতে পারুক, পরিপূর্ণ পুরস্কারই তাকে দেয়া হবে যদি অন্তরের পরিপূর্ণতা থাকে।[৪]

---

[৪] al-Qahtani, M. S., 1999, Al-Wala' wa'l-Bara' According to the Aqeedah of the Salaf (Part 2), London: Al-Firdous, Ltd., p. 86.

কাফিরদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাথী হিসেবে গ্রহণ করা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন,

'আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, কোনো ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের কাছ থেকে সহমর্মিতা প্রত্যাশা করতে পারে না। স্বয়ং ঈমানই তা করতে দেয় না, ঠিক যেভাবে দুইটি বিপরীত বিষয় পরস্পর বিকর্ষণ করে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনের প্রতি ভালোবাসা থাকা অসম্ভব। আর যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অন্তরকে কাফিরদের প্রতি সংযুক্ত রাখে, তখন এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে তার অন্তরেও কোনো ঈমান নেই।[৫]

৬.৬ রাগ

সাধারণভাবে রাগকে নেতিবাচক আবেগ হিসেবে ধরা হয়, যা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। তবে আল্লাহর খাতিরে রাগের বৈধতা রয়েছে। বিভিন্ন কারণে মাঝেমধ্যে রেগে ওঠা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মুমিনরা এ সময়ও নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং আল্লাহর দেয়া সীমা লঙ্ঘন করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবলমাত্র তখনই রেগে যেতেন, যদি দেখতেন আল্লাহর হক নষ্ট করা হচ্ছে। যেমন ধরুন, তিনি রেগে গিয়েছিলেন যখন তাকে একজন ইমামের ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি দীর্ঘ সালাত আদায় করেন, ফলে লোকেদের কষ্ট হয়। আরেকবার রাগ করেছিলেন যখন তিনি আম্মাজান আইশার ঘরে প্রাণীর ছবি যুক্ত পর্দা দেখতে পেলেন, তখন।

আরেক ঘটনায় যখন উসামা ইবনু যায়েদ এসে একজন মহিলা চোরের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন তার সুপারিশের ভিত্তিতে হয়তো শাস্তি কমিয়ে দেয়া হবে। রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকারিণীর সাজা (হাত কাটা) মওকুফের সুপারিশ করছ?' (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের রাগ সম্পর্কে কুরআনে এভাবে আলোচনা করেছেন,

- 'যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের **রাগকে সংবরণ করে** আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৩৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

'যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং **ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা** করে,...' (সূরাহ শুরা, ৪২:৩৭)

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই, বরং ক্রোধের মুহূর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারি, মুসলিম)

---

[৫] Yasin, 1997

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি এসে নবি (সা.) কে বলল, আমাকে কোনো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার একই অনুরোধ করল। প্রত্যেকবার নবি (সা.) বললেন, 'রাগ করো না! রাগ করো না!' (বুখারি)

রাসূলুল্লাহ (সা.) রাগ প্রশমনের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যেন মানুষের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো আল্লাহর কাছে শয়তানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে রাগকে রূপান্তরিত করে ক্রোধে। সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি (সা.)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দুজন লোক পরস্পর গালমন্দ করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবি (সা.) বললেন, আমি এমন একটি দুআ জানি, যদি লোকটি পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে ''আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান''-আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে... (বুখারি ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি রেগে ওঠে এবং বলে আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম; তাহলে তারা রাগ চলে যাবে। (বুখারি)

রাগ নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে নীরবতা অবলম্বন ও অবস্থান পরিবর্তন করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন চুপ থাকে।' (বিশুদ্ধ হাদিস, আহমদ)। রেগে গেলে চুপ করে থাকা ও নীরবতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেউ রেগে গেলে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং কুফরি কথা পর্যন্ত উচ্চারণ করে ফেলে অথবা অন্য ব্যক্তিকে অভিশাপ বা গালমন্দ করে কিংবা নিজের স্ত্রীকে রাগান্বিত হয়ে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়। নীরব থাকলে নিজের ও নিজের প্রিয়জনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। এভাবে অন্য ব্যক্তির সাথে বৈরিতা, ঘৃণা ও তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনাকেও সীমিত রাখা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে যেন বসে যায়। তবে তার রাগ নেমে যাবে। যদি এতে রাগ চলে না যায় তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।' (বিশুদ্ধ হাদিস, আহমদ)। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে যাওয়া কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়ার মাধ্যমে কাউকে শারীরিক ক্ষতি করা বা আঘাত করার সম্ভাবনা কমে যায়। রেগে গেলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি হতে পারে, কাউকে আঘাত করে ফেলতে পারে, সেখান থেকে জখম কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। বেশিরভাগ সময়ই রাগ পড়ে গেলে মানুষ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত বোধ করে রাগান্বিত অবস্থায় ঘটে যাওয়া কাজের জন্য। সুতরাং সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে রাগের অবস্থায় ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টির সম্ভাব্য সকল রাস্তা আটকে দেয়া।

মুমিন অবশ্যই রাগ নিয়ন্ত্রণের বিশাল পুরস্কারের কথা স্মরণে রাখবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রাগান্বিত অবস্থায় প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তার অন্তরকে বিচার দিবসে পরিতৃপ্তিতে ভরে দেবেন।' (বিশুদ্ধ হাদিস, তাবারানি)। আরেক হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যেকোনো হুর থেকে নিজের ইচ্ছামতো বেছে নেওয়ার অধিকার দান করবেন।' (ইবনু মাজাহ)

রাগ এবং সুস্বাস্থ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পরিচালিত গবেষণায় উঠে এসেছে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য। রাগ এবং বৈরিতা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় (রিস্ক ফ্যাক্টর) এবং এই রাগ থেকেও হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। রাগের কারণে সৃষ্টি হয় উচ্চ রক্তচাপের। এছাড়া স্ট্রোক এবং ডায়াবেটিসেও রাগের কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে।[৬] সুতরাং মানসিক এবং সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি রাগের দরুণ দৈহিক ক্ষতিও হয়ে থাকে। দীর্ঘসময় রেগে থাকার ভিতরে কোনো কল্যাণ নেই। এক্ষেত্রে একমাত্র রাসূল (সা.) এর সুন্নাত অনুসরণের মধ্যেই নিশ্চিত স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নিহিত।

৬.৭ আবেগের সারকথা

নিজেদের ঈমান ও দ্বীনদারিতা মজবুত করে আমরা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে পারি। কুরআন জানাচ্ছে, যারা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলবে, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে নেতিবাচক আবেগ লাঘবের মাধ্যমে। আল্লাহর তরফ থেকে এটি মুমিন বান্দাদের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহ বলেছেন,

- 'আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত হবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৩৮)

এ বিষয়টি পৃথক অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

---

[৬] Taylor, S., 2006, Health Psychology (6th Ed.), Boston, MA: McGraw-Hill, p. 348.

||অধ্যায় সাত||
বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও প্রজ্ঞা

সমকালীন মনোবিজ্ঞান এভাবে ইন্টেলিজেন্স-এর (বুদ্ধিমত্তা) সংজ্ঞা দিয়ে থাকে: যে সামর্থ্যের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা হয় এবং (বিগত) জ্ঞান প্রয়োগ করে নবউদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয়।[১]

বুদ্ধিমত্তার উপর জেনেটিক্স (জিনের নকশা) ও পরিবেশ উভয়ের প্রভাব রয়েছে। তবে গবেষণায় পাওয়া যায়, তুলনামূলকভাবে জেনেটিক্স এর প্রভাব শক্তিশালী। আইকিউ (Intelligence Quotient) হলো কোনো ব্যক্তির একটি অভীক্ষায় অর্জিত স্কোর বা নম্বর যার মাধ্যমে কিছু বিষয়ে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য পরিমাপ করা হয়। যেমন- সাধারণ জ্ঞান, অনুধাবন শক্তি, শব্দভাণ্ডার, পাটিগণিত মিলানো, স্মৃতিশক্তি, দেখে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা (perceptual organization) ও তথ্য বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুততা ইত্যাদি বিষয় যাচাই করা হয়। সাধারণত দেখা যায়, সাত বছর বয়সের পর থেকে আইকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর জীবনভর কম-বেশি একই থাকে।

বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আরেকটি জনপ্রিয় সমসাময়িক তত্ত্ব হলো (গার্ডনার থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স) 'গার্ডনারের বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব'। গার্ডনার প্রস্তাব করেছেন যে, আমাদের আট রকম বুদ্ধিমাত্রা রয়েছে। প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে স্বাধীন ও পৃথক। প্রত্যেক ব্যক্তি এসব বুদ্ধিমত্তার কিছু বিষয়ে দক্ষ আর কিছু বিষয়ে দুর্বল। তুলনামূলকভাবে এই তত্ত্বটি একটু আগে আলোচিত 'স্টান্ডার্ড ইন্টেলিজেন্স' (আদর্শ বুদ্ধিমত্তা) টেস্ট অপেক্ষা ব্যাপক, কেননা সেটা মূলতঃ ভাষাগত ও গাণিতিক দক্ষতা যাচাইয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আট প্রকার বুদ্ধিমত্তার মধ্যে আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক সাতটি ।[২]

১। ভাষাগত (Linguistic): ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা, (শব্দের) ক্রমধারার সূক্ষ্মতা টের পাওয়া।

---

[১] Myers, 2007, p. 431.
[২] Ibid., p. 434.

২। গাণিতিক-যুক্তিবাদী বুদ্ধিমত্তা (Logical-mathematical): যুক্তি ও সংখ্যার বুদ্ধিমত্তা, ধারাবাহিক যুক্তি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্যাটার্ন বিন্যাস ও ক্রমধারা (order) নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা।

৩। সুর-সম্বন্ধীয় (Musical): পিচ (pitch), ছন্দ, সুর, তাল ও স্বর (টোন) এর সূক্ষ্ম ওঠানামা টের পাওয়া বা ধরতে পারা।

৪। শারীরবৃত্তীয় (Bodily-kinaesthetic): নিজের দেহকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার ও বিভিন্ন বস্তুকে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা।

৫। স্থান, দূরত্ব সংক্রান্ত (Spatial): (দূরত্ব পরিমাপক বিষয়াদি তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ইত্যাদি অনুধাবন ও ব্যবহারে যোগ্যতা- যেমন- আঁকা, নকশা, চিত্র, ধাঁধা সমাধান) চারপাশের পরিবেশকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও ঘুরিয়ে কল্পনা করার দক্ষতা।

৬। আন্তঃব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal): লোকজন ও পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনের দক্ষতা।

৭। অন্তঃব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal): ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ-সত্তা অনুধাবনের মাধ্যমে নিজেকে ও অন্যকে বিশ্লেষণের যোগ্যতা।

৭.১ ইসলামে যুক্তির (আকল) অবস্থান

বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে সমসাময়িক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে ইহকালীন জীবন এবং এই জীবনে উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষা, আরও মান-মর্যাদা ও আরও ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সক্ষমতা বাড়ানো। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণার সাথে এটা একদমই বিপরীত। ইসলাম অধিক মনোযোগ প্রদান করে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বোঝার উপর। বুদ্ধিমত্তার আরবি শব্দ 'আকল'। আকল-কে অর্থ নানা রকম হতে পারে, যেমন- যুক্তি, বোধশক্তি, কিছু বোঝার ক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, যৌক্তিকতা, মন ও মেধা ইত্যাদি।[৩]

এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি সহজাত মানবিক ক্ষমতা। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারি।[৪] বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।' (সূরাহ মুলক, ৬৭:১০)

- অন্যত্র বলেছেন,

  '...এগুলোর মধ্যে নিদর্শণ রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।' (সূরাহ রাদ, ১৩:৪)

---

[৩] Wehr, 1974, p. 630.

[৪] Ibn Taymiyyah, 2005, The Decisive Criterion between the Friends of Allah and the Friends of Shaytan, Birmingham, UK: Daar Us-Sunnah Publishers, p. 217.

যারা নিজেদের 'আকল' ব্যবহার করে, তারা বোধশক্তি ও যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে সত্যের কাছে পৌঁছাতে পারে।

ইসলাম অনুসারে মানুষের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন

যে পাঁচটি সার্বজনীন বিষয়কে সংরক্ষণের জন্য ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার একটি হলো 'আকল' বা বোধশক্তি। অন্য চারটি হলো ঈমান, জীবন, বংশধারা ও সম্পদের নিরাপত্তা। ইসলামে বোধশক্তিকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; কেননা এর ভিত্তিতেই মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার কর্মের ব্যাপারে। এটিই সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে আল্লাহর অন্য সব সৃষ্টির তুলনায় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। অবশ্য যদি মানুষ এই উপহারের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে, তবে।

ইসলামি আইনশাস্ত্র এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে মানুষের বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, সুন্দর জীবন ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। সেজন্য, মনোজগতের সুস্থতা ও বুদ্ধিমত্তা বিনষ্ট করে কিংবা কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, এ ধরনের সকল উপাদান ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৯০-৯১)

যারা এ ধরণের কার্যক্রমে লিপ্ত হয় তাদেরকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিবরাইল আমার কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ মদকে অভিশপ্ত করেছেন এবং এর প্রস্তুতকারী, পানকারী, বহনকারী, যার কাছে বহন করা হয়, যে বিক্রি করে, যে ক্রয় করে, যে ঢেলে দেয় এবং যাকে ঢেলে দেয়া হয় তাদের সবাইকে অভিশপ্ত করেছেন।'(আহমাদ ও ইবনু হিব্বান)। ব্যক্তি-সমাজের জন্য এসব উপাদানের ক্ষতি ও বিপদ যেহেতু অত্যন্ত গভীর, সেজন্য ইসলামি আইনে এসবের শাস্তিও বেশ কঠিন।

সকল প্রকারের মিথ্যা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতাদর্শ, কুসংস্কার এবং ধোঁকা প্রতারণা থেকে মানুষের যুক্তিমানস বা চিন্তাশক্তিকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে। ইসলামে ভাগ্যগণনা, জাদুবিদ্যা ও এ জাতীয় কাজ যে নিষিদ্ধ, তার অন্যতম কারণ এটা। ঠকবাজ ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ধোঁকা দেয়। যা দর্শকের ঈমান পর্যন্ত নষ্ট করতে পারে, আকিদাকে বিকৃত করে দিতে পারে। গায়েবের যেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে কোনো জ্ঞান প্রদান করা হয়নি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা একজন মুসলিমের উচিত নয়; কেননা এর ফলে সন্দেহ এবং বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। উৎসাহ দেয়া হয়েছে যৌক্তিক তথ্য-প্রমাণাদির অনুসরণ এবং সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণাকে। চিন্তার এই স্বাধীনতা বা 'ফ্রিডম অফ থট' আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিরাট এক নিয়ামত; তবে একে অবশ্যই যথাযথ সীমানার ভেতরে রাখতে হবে। শরিয়াহ বহির্ভূত সীমানায় গিয়ে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা কিংবা কোনো চিন্তার প্রচার-প্রসার হতে পারে না। ওহীর উপরে কখনো যুক্তি বা 'আকল' প্রাধান্য পাবে না। যদিও এই দ্বীনের অধিকাংশ বিষয়ই মানবিক বোধশক্তিতে বোধগম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য; তবুও ইসলামের সবকিছুকেই একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা অনুচিত। কেননা, যুক্তিরও নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মোটাদাগেই মানুষের বোধশক্তির ক্ষমতার বাইরে; কারণ মানুষকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা অসীম নয়, বরং সীমাবদ্ধ। কার্যতঃ আল্লাহর অসীম জ্ঞানের বিপরীতে মানুষের জ্ঞান এতই সামান্য যে তা ধর্তব্যই নয়। সাধারণভাবে কুরআন ও হাদিসকে আমাদের গাইডলাইন হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এগুলোকে মূল ধরে এই দুনিয়াকে বুঝতে হবে এবং উপযুক্ত বিশ্বাস নিজেদের মধ্যে বিকশিত করতে হবে।

৭.২ জ্ঞান

মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসগত বিষয়ে জ্ঞানের গুরুত্ব সুস্পষ্ট। যার কারণে এর মর্যাদাও অনেক বেশি। জ্ঞান ছাড়া আমরা কেবল বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিশুদ্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অসম্ভব। অবশ্য মনন-চর্চার দ্বারাও জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের ভুল-শুদ্ধ, হালাল-হারাম জানতে পারি। আর আমাদের সহজাত ফিতরাতের বৈশিষ্ট্য যেহেতু একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। কিন্তু তা বিশুদ্ধভাবে করা অসম্ভব এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যজ্ঞান না থাকলে।

জ্ঞানের গুরুত্ব

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে প্রথম ওহী নিয়ে ফেরেশতা জিবরাইল এলেন, সেই ঘটনার মাধ্যমে ইসলামে জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি ফুটে উঠেছে:

- 'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।' (সূরাহ আলাক, ৯৬:১-৫)

বিগত অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, আল্লাহ তাআলা আদমকে বিভিন্ন বস্তুর নামকরণের যোগ্যতা প্রদান করেছিলেন। এই যোগ্যতা তিনি ফেরেশতাদেরকে দেননি। নতুন কিছু শেখা ও বোঝার এই ক্ষমতার কারণেই আমরা অন্যান্য সৃষ্টি থেকে অনন্য। এবং এই ক্ষমতাটি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সাথে সরাসরি যুক্ত। জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা ছাড়া কোনো কিছু যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যতঃ অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।'(মুসলিম)। এই বাধ্যবাধকতা আমাদের পুরোটা জীবনব্যাপী বজায় রয়েছে,

যতক্ষণ না আমাদের চিন্তাশক্তি ও বোঝার ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে (বার্ধক্য বা রোগ-ব্যাধির কারণে)।

জ্ঞান অর্জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের খুঁজে দেয় সরল পথ এবং এই পথে অটল থাকতেও আমাদের সহায়তা করে। সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আমাদের দুনিয়ার জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাবে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে অবশেষে। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বারবার কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

- '... আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।' (সূরাহ ফাতির, ৩৫:২৮)
- 'এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।' (সূরাহ , ২৯:৪৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

'... বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

'...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।...' (সূরাহ মুজাদালাহ্, ৫৮:১১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যদি আল্লাহ কোনো ব্যক্তির কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে তাকে দ্বীনের বোধশক্তি প্রদান করেন (কুরআন ও হাদিস বোঝার ক্ষমতা প্রদান করেন)।' (বুখারি)।

তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম (কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান) হাসিলের জন্য কোনো রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা তালিবে-ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আলিমের জন্য আসমান ও জমিনের সব কিছুই মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আবিদের উপর আলিমের ফজিলত এরূপ, যেরূপ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ফজিলত সমস্ত তারকারাজির উপর। আর আলিমগণ হলেন, নবিদের ওয়ারিস, এবং নবিগণ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমূদ্রা) মীরাছ হিসাবে রেখে যান না, বরং তাঁরা রেখে যান- ইলম। কাজেই যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করল, সে প্রচুর সম্পদের মালিক হলো।' (আবু দাউদ, তিরমিযি, উত্তম সনদে বর্ণিত হাদিস)।

উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলোতে ইলম অর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইলম নিজে শেখা ও অপরকে শেখানোর মধ্যে নিহিত আছে অনেক উপকারিতা ও ফজিলত। মানুষ যত রকম কর্মকাণ্ড ও চেষ্টায় শ্রম দিয়ে থাকে,

তার মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। ইলমচর্চার পুরস্কারও কল্পনাতীত। বাস্তবেও কারো পক্ষে জ্ঞান ব্যতীত উচ্চ মর্যাদা অর্জন সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান ও সত্য পথসহ (দুনিয়ায়) পাঠিয়েছেন, তার উপমা বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির পানি কোনো ভালো জমিতে পড়লে জমির উর্বর অংশ তা শুষে নেয় এবং নতুন নতুন তাজা ঘাস জন্মায়। অপরদিকে জমির শুকনো অংশে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখান থেকে পানি তুলে নিয়ে পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচকার্য চালায় এবং ফসল উৎপাদন করে। জমির আর এক অংশ থাকে ঘাসহীন অনুর্বর, সেখানে পানিও আটকায় না, ঘাসও জন্মায় না। এটা হলো সেই লোকের উপমা, যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে গভীর বুৎপত্তি লাভ করে এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমায় পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়। এভাবে সে নিজেও জ্ঞান অর্জন করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। অপরদিকে শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির যে দ্বীনি জ্ঞানের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না এবং আল্লাহর যে বিধানসহ আমায় পাঠানো হয়েছে তা সে গ্রহণও করে না।' (বুখারি)

উক্ত হাদিসে আলোকপাত করা হয়েছে, ইলমের সাথে সম্পর্কিত মানুষ তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো যারা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে, নিজেরাও আমল করে এবং অন্যদের কাছে সেটা পৌঁছে দেয়। এই ধরনের লোকেরা নিজেরা জ্ঞান থেকে উপকৃত হয় এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও জ্ঞানের উপকারিতা পৌঁছে দিয়ে উপকৃত হয়। এর ফলে তারা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে রয়েছে যারা জ্ঞান অর্জন করে এবং অন্যদের কাছেও সেটা পৌঁছে দেয় কিন্তু নিজেরা জ্ঞানের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এই ধরনের লোকেরা প্রথম দলের তুলনায় কম মর্যাদাবান এবং তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা হতে পারে। শেষ প্রকার হলো যারা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেগুলো এড়িয়ে চলে। তারা নিজেরা ইলম শেখে না অথবা অপরের কাছ থেকে নিজের উপকারের জন্য শোনে না কিংবা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে না। এরাই তিন প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, 'কেবল মাত্র দুই ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে তা ব্যয় করার মত ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত (প্রজ্ঞা, দ্বীনের জ্ঞান) দান করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যান্যকে তা শিক্ষা দেন।' (বুখারি)

কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা বৈধ কেননা এই দুইক্ষেত্রে আমলকারী ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা ও সদগুণ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যের নিয়ামত দেখে হতাশাগ্রস্ত হওয়া বা অভিযোগ পেশ করা বা তার ক্ষতি হোক এমন ইচ্ছা পোষণ করা – এখানে এখানে

ঈর্ষার অর্থ নয়। বরং অন্যের সদগুণ, যোগ্যতা, আল্লাহর নিয়ামত লাভ ইত্যাদি দেখে নিজেও অনুরূপ লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করাকে বোঝানো হয়েছে। এই হাদিসে 'হিকমত' বা প্রজ্ঞা শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে কুরআন ও হাদিসের গভীর জ্ঞান, যে জ্ঞান মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী। কল্যাণ কেবল এই জ্ঞানের মাঝেই যার দ্বারা আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) আলি (রা.) কে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ একটি লোককেও সুপথ প্রদর্শন করলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়ে উত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

লাল উটের থেকেও উত্তম এই উপমা প্রদানের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে এটি অন্য সবকিছুর থেকে উত্তম। সেই সময়ে আরবে লাল উটকে অত্যন্ত দামী ও মূল্যবান বিবেচনা করা হতো। এই হাদিসে সেই লাল উটের দৃষ্টান্ত পেশ করে হিদায়েতের গুরুত্ব ও মূল্য বোঝানো হয়েছে। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবানের পূর্বে নিজের ইলম থাকতেই হবে। কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান হাসিল করা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ইলম ছাড়া কেউ আরেকজনকে হিদায়াত এর দিশা প্রদান করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলোও অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহর জিকর ও তাঁর আনুগত্য এবং আলিম ও ইলম হাসিলকারী।' (তিরমিযি, ইবনু মাজাহ, সনদ নির্ভরযোগ্য)

এই হাদিসে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার সবকিছুই অভিশপ্ত যদি সেগুলো কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন বানিয়ে দেয়। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, তাদের জন্য দুনিয়া অভিশপ্ত যারা সারাজীবনে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে স্মরণ করে না। জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একজন ইবাদাতকারী বান্দাকে অবশ্যই জানতে হবে কোনো কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর কীসে তাঁর অসন্তুষ্টি। এ কারণে জ্ঞানের ধারক-বাহক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে উল্লেখিত হাদিসে অভিশপ্ত বিষয়বস্তুর বাইরে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আবিদের (ইবাদাতকারীর) ওপর আলিমের (জ্ঞানীর) শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শেখায় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ এমন কি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া, এমনকি মাছেরাও তাদের জন্য দুআ করে। (নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় বর্ণিত তিরমিযির হাদিস))।

'আলিম' শব্দের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেরা ফরজ আমল পালন করেন, সুন্নাত অনুসরণ করেন এবং সে মোতাবেক জ্ঞান অর্জন করেন ও অপরকে শিক্ষা প্রদান করেন। আর আবেদ হলো সেই ব্যক্তি যে তার অধিকাংশ সময়ে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়। এই হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও জমিনের অন্যান্য সকল সৃষ্টির কাছে আলিমদের মর্যাদা ও সম্মানের

বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর রহমত করেন যিনি মানুষকে উপকারী জ্ঞান (ইসলামের জ্ঞান) শিক্ষা দেন। ফেরেশতারা তাঁর মাগফিরাত ও গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন। অন্যান্য সৃষ্টিও তাঁর কল্যাণের দুআ করেন। একজন আবিদের উপরে আলেমের শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ হলো আলিমের ইলমের উপকারিতা সমাজের অন্যান্য মানুষদের কাছেও পৌঁছে যায়, অপরদিকে আবিদের নফল আমল ও আল্লাহর স্মরণের উপকারিতা কেবল তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু কোন জ্ঞান?

আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।' (মুসলিম)। কিন্তু আজকাল দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই হাদিসকে সব ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন ধর্মীয় জ্ঞানের বাধ্যবাধকতার প্রতি। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, তাঁর নাম ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করা, কিভাবে ইবাদাত করতে হবে, আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং দুনিয়াতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কিভাবে আমাদের আখিরাতের জীবনকে প্রভাবিত করবে ইত্যাদি বিষয় বাধ্যতামূলক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বুঝে নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ; ব্যক্তিগতভাবে যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক (ফরজে আইন) তার সাথে সমষ্টিগত বাধ্যতামূলক (ফরজে কিফায়া) জ্ঞানের কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যে জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক তার মধ্যে রয়েছে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান, যেমন- কুরআন ও হাদিস বোঝা, ঈমান, আকিদা, ইবাদাত বন্দেগি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানসমূহ ও দৈনন্দিন বিষয়াদির হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞান। আর সমাজের উপর সামষ্টিকভাবে যে জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক সেগুলো মুসলিম সমাজের কিছু ব্যক্তির মধ্যে থাকলেই যথেষ্ট। তখন বাকি মানুষের উপর সেই বাধ্যবাধকতা আর থাকবে না। কিন্তু যদি সমাজের কেউ সেই দায়িত্ব পূরণ না করে, তাহলে প্রত্যেকেই দায়ী থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামি শরীয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা, শিক্ষাদান ও অন্যান্য বিষয়।

৭.৩ প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা

জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কী— তা নিয়ে যুগে যুগে মানব জাতি বহু আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছে। কিভাবে এ বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জন করা যেতে পারে, এ নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সেক্যুলার পরিভাষায় প্রজ্ঞা (উইজডম) অর্থ: সঠিক বিষয়টি বাছাই করার ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য। এটি অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি এবং গভীর অনুধাবন শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে পরিশীলিত তথ্যকে বোঝায়। যদিও এ বিষয়টিকে অনেকাংশেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু দুনিয়াবী বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রজ্ঞাবান হওয়ার জন্য কোনো জরুরি শর্ত নয়। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা

জেনেছি, সেক্যুলার শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান মনোযোগ থাকে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের উপর; আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় খুব অল্পই।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে 'স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স' নামে নতুন একটি পরিভাষা আনা হচ্ছে। এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা হচ্ছে; ('স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স' হলো) আধ্যাত্মিক তথ্য উপাত্তের মানানসই (adaptive) ব্যবহার যা দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।[৫] নিম্নের বিষয়গুলোর প্রস্তাব করা হয়েছে 'স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স' এর উপাদান হিসেবে;

১। দৈহিক ও মানসিক (সীমাবদ্ধতা) অতিক্রমের ক্ষমতা।

২। আশপাশ সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন থাকার সামর্থ্য।

৩। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে পরিশুদ্ধ করার সামর্থ্য।

৪। আধ্যাত্মিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য।

৫। নিষ্ঠাবান বা গুণবান হবার ক্ষমতা।[৬]

স্পিরিচুয়ালিটির (আধ্যাত্মিকতা) সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। এরমধ্যে নানাবিধ চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস, মতাদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, প্রজ্ঞার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংজ্ঞাটিকে ফোকাস করা হয়, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নাজিলকৃত ওহীর উপর ভিত্তি করে।

আল্লাহর প্রজ্ঞা

চূড়ান্ত প্রজ্ঞা আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি সর্বজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাবান। বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে,

- 'যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'(সূরাহ নিসা, ৪:১১১)
- 'নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরাহ জাছিয়া, ৪৫:৩৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়।' (সূরাহ হিজর, ১৫:২৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও

---

[৫] Emmons, R. A., 2000, Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern, The International Journal of the Psychology of Religion, 10, p. 3.
[৬] Ibid., p. 10.

সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরাহ মুমিন, ৪০:৮)

মানুষের কখনো এমন ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে তারা আল্লাহর থেকেও প্রজ্ঞাবান! কেননা, এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। বাস্তবে মানুষের প্রজ্ঞা মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। তিনি নিজ ইচ্ছামাফিক প্রজ্ঞা ও অনুধাবন শক্তি প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করেন।

কুরআনে প্রজ্ঞা

মানুষ কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া প্রজ্ঞার কিছু অংশ অর্জন করতে পারে। বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন প্রজ্ঞাবান গ্রন্থ। আল্লাহ বলেছেন,

- 'প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম।' (সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:২)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে মাহফুযে।' (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩:৩-৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর প্রজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে কিছু বিশেষ প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তাকে নবি ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। সেই প্রজ্ঞা সংরক্ষিত হয়েছে হাদিস ও সুন্নতের মাধ্যমে। এগুলো আল্লাহর ওহীরই অংশ। ফেরেশতা জিবরাইল রাসূলের অন্তরে প্রজ্ঞা স্থাপন করেছেন। নবিজি (সা.) বলেছেন, 'আমি কাবা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ-এ দু' অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর (ফেরেশতা) দু' ব্যক্তির মাঝে থাকা ব্যক্তিকে (আমাকে) উল্লেখ করে বললেন, 'আমার নিকট স্বর্ণের একটি তশতরী নিয়ে আসা হলো-যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তাপর আমার বুক থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেট যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হলো। তারপর হিকমত ও ঈমান পরিপূর্ণ করা হল...'(বুখারি)

রাসূলকে যে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার আলোচনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। সাধারণত তাকে যে কিতাব প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের প্রসঙ্গে সেই হিকমতের কথা উল্লেখ করা হয়,

- 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও **হিকমত**। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।' (সূরাহ জুমুয়াহ, ৬২:২)

• অন্যত্র বলেছেন,

'...আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।' (সূরাহ নিসা, ৪:১১৩)

• অন্যত্র বলেছেন,

'... আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়।...' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৩১)

• অন্যত্র বলেছেন,

'আর আল্লাহ যখন নবিগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।...' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৮১)

রাসূলের প্রজ্ঞার বাস্তব নিদর্শন হলো তার সুন্নাহ। মুসলিমরা সুন্নাহর সাথে লেগে থাকতে এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জীবনযাপন কেমন হতে পারে, আল্লাহর রাসূল (সা.) তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাসূলের সুন্নতের পেছনে কি কি হিকমত বা প্রজ্ঞা রয়েছে সেগুলোর সবটা আমরা নাও জানতে পারি, কিন্তু এরপরেও আমরা সেগুলো পালন করে চলি আল্লাহর আদেশ বলে। কেননা, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের জন্য কোনো কোনো বিষয় উপকারী এবং তিনি সেগুলোর নির্দেশনাই প্রদান করেছেন।

লুকমান হাকিমের বিজ্ঞতা

কুরআনে যে সকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের আলোচনা এসেছে তাদের মধ্যে লুকমান হাকিম অন্যতম। তাকে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লুকমান দুনিয়াবী রাজত্ব ও ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি কিংবা ভিন্ন বর্ণনায় গোলাম। তাঁর 'প্রকৃত মানবিয় প্রজ্ঞা' উৎসারিত হয়েছে আসমানী প্রজ্ঞার উৎস হতে। সুতরাং সকল প্রজ্ঞার সূত্রপাত তখনই ঘটে যখন আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জীবনকে চালানো হয়- অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক কী তা বুঝতে হবে এবং তাঁর ইবাদাত করতে হবে যথোপযুক্তভাবে। লুকমান (আ.) এর এই গভীর বোধশক্তি ছিল। আল্লাহ বলছেন:

• 'আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যানের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

• যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।

• আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

• পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।

• হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।

• হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

• অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

• পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।' (সূরাহ লুকমান, ৩১:১২-১৯)

এই আয়াতগুলোতে প্রজ্ঞার মূল বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে এবং কিভাবে সেগুলো জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা আলোচিত হয়েছে। সেই প্রকৃত জ্ঞানী যে এই নির্দেশনাগুলো বুঝতে সক্ষম এবং স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করে পরিপূর্ণভাবে। পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ জীবনের জন্য এগুলো এক সুমহান নির্দেশিকা।

৭.৪ জ্ঞানী সম্প্রদায়

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা প্রদান করেন। কুরআনের ভাষায় তাদেরকে বলা হয় প্রজ্ঞাবান সম্প্রদায় (أُولُو الْأَلْبَابِ)। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উপহার লাভ করা এক অসাধারণ নিয়ামত। তিনি বলেন,

> • 'তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৬৯)

• অন্যত্র বলেছেন,

> 'আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে **বুদ্ধিমানদের** জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:১২৮)

বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ বোঝাতে এখানে যে আরবি শব্দ (أولي النُّهىٰ) ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ বুদ্ধিমত্তা, অনুধাবন শক্তি, বোধশক্তি ইত্যাদি। আর পুরো আয়াতে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে যারা পূর্ববর্তী উম্মাতের ঘটনাগুলো পাঠ করে এবং সেখান থেকে শিক্ষা আহরণ করে তাদেরকে।

বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিষয়ের বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও অনুধাবন শক্তিকে প্রজ্ঞা বলা হয় না; বরং প্রজ্ঞা হলো আল্লাহ ও তাঁর আদেশ-নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পণ করাই হলো প্রজ্ঞা। মানুষের প্রজ্ঞা সম্পর্কে বিনয়ের সঙ্গে কেবল এতটুকু বলা যায় যে, আমাদের প্রজ্ঞাটুকু মহাপ্রজ্ঞার একচ্ছত্র অধিকারী আল্লাহর প্রজ্ঞার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র, আর এটাও যে তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন, তা তাঁর অপার করুণা আর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই না।

||অধ্যায় আট||
শিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন (লার্নিং এন্ড মডেলিং)

শিক্ষণের সংজ্ঞায় বলা যায়, 'অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো জীবসত্তার আচরণে তুলনামূলকভাবে কিছুটা স্থায়ী যেসব পরিবর্তন অর্জিত হয় তাই শিক্ষণ (learning).[১] এই সংজ্ঞায় শিক্ষণের আচরণগত উপাদানসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যেটুকু আচরণে প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা পঠনের (রিডিং) মাধ্যমেও জ্ঞান হাসিল করে কোনোকিছু শিখতে পারি, যেমনটি আগেই আলোচনায় এসেছে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ধরণ কগনিটিভ বা বুদ্ধিবৃত্তিক হলেও, এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব অবশ্যই আমাদের আচরণের উপর আসতে হবে।

শেখার মাধ্যম হিসেবে যে নিয়ামতগুলো আল্লাহ্ দিয়েছেন সেগুলো তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

- 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।' (সূরাহ্ নাহল, ১৬: ৭৮)

এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন (সহজাত জ্ঞান বা ফিতরাত ব্যতীত) তার কোনো জ্ঞান থাকে না। আল্লাহ্ই তাকে ইন্দ্রিয় শক্তি দেন, বুদ্ধিমত্তা দেন। যাতে এগুলো কাজে লাগিয়ে সে চারপাশের পৃথিবী থেকে শিখতে পারে। এবং এভাবে আল্লাহ্র নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জেনে তাঁর প্রতি সে যেন কৃতজ্ঞ হতে পারে। এই চক্ষু, কর্ণ ও অন্তরের মাধ্যমে দেখে, শুনে, পড়ে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানুষ নানা কিছু শিখে থাকে তার সারাটা জীবন ধরে।

কুরআন নিজেই একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা উপকরণ; যেখানে বৈচিত্র্যময় উপায়ে জ্ঞানকে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পাঠে পরিপূর্ণ এই কুরআন। আমাদের

---

[১] Myers, 2007, p. 313.

শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তাআলা সমস্ত কুরআন জুড়ে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যেমন:

১। সরাসরি বক্তব্য (direct speech); যাতে কোথাও ধমক দেয়া হয়েছে আবার কোথাও দেয়া হয়েছে উৎসাহ,

২। যুক্তিপূর্ণ কথোপকথন (dialogue); যা ক্রমে ক্রমে একটি পরিসমাপ্তি ও সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়,

৩। উপমা ও দৃষ্টান্ত (parables); বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য উপমা ব্যবহার ও দৃষ্টান্ত প্রদান,

৪। শাস্তি ও পুরস্কার; মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেন আমরা উন্নত আচরণের অধিকারী হতে পারি এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি,

৫। পুনরাবৃত্তি (repetition); গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও মূলনীতিসমূহের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৮.১ ক্লাসিক্যাল ও অপারেন্ট কন্ডিশনিং (classical and operant conditioning):

সেক্যুলার বিহেভিয়ারিস্ট (behaviourist) তত্ত্ব অনুসারে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণ (লার্নিং) ঘটে ; (১) চিরায়ত প্রশিক্ষণ (classical conditioning) এবং (২) অপারেন্ট প্রশিক্ষণ (operant conditioning)। এসব তত্ত্বে আচরণ ও পরিবেশের প্রভাবের উপর ফোকাস করা হয়।

চিরায়ত প্রশিক্ষণ (classical conditioning) হলো দুটি উদ্দীপকের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার প্রশিক্ষণ। এখানে নিরপেক্ষ উদ্দীপকেই (neutral stimulus) সাড়া পাওয়া যায়, কেননা সেই নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সাথে একই সময়ে আরেকটি স্বয়ংক্রিয় সহজাত উদ্দীপক (natural stimulus) রাখা হয়। সহজাত উদ্দীপকের দ্বারা ব্যক্তি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের অর্থ শিখে নেয়।

যেমন ধরুন, সন্তানদের দুপুরের খাবারের জন্য ডাকতে গিয়ে কোনো মা যদি একটি ঘন্টা বাজান, প্রথম প্রথম সন্তানরা বুঝবে না কেন ঘন্টা বাজানো হচ্ছে, (যেহেতু এর কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই)। ফলে তারা খাবার টেবিলে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে পারে। কিন্তু ঘন্টা বাজানোর একই সাথে যদি খাবার পরিবেশন করতে থাকা হয় তখন সবাই খাবার টেবিলে দৌড়ে আসবে। (এখানে ঘন্টা বাজানো নিরপেক্ষ উদ্দীপক, খাবার পরিবেশন করা সহজাত উদ্দীপক)। শিখে নেবে যে, ঘন্টা বাজানোর উদ্দেশ্য খেতে ডাকা। এরপর থেকে শুধু ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই টেবিলে চলে আসবে।

অপারেন্ট প্রশিক্ষণ (operant conditioning) হলো আচরণ-পরবর্তী ফলাফল দেখে শিখে নেয়া। কোনো আচরণের পর (behaviour) যদি পুরস্কার (আকাঙ্ক্ষিত কিছু)

পাওয়া যায় তবে আচরণটি বাড়িয়ে দেয়। আর যদি শাস্তি (অনাকাংক্ষিত কিছু) আসে তবে সেই আচরণ কমিয়ে দেয়। যেমন কিনা, ঘর পরিষ্কার করলে যদি কোনো শিশুকে ক্যান্ডি দেয়া হয় তবে এটা পুরস্কার, সে আবারও করতে উদ্বুদ্ধ হলো। আর শাস্তি হলো ফুলদানী ভেঙ্গে ফেললে প্রহার করা, এরপর সে আর ভাঙবে না। শিখে গেল।

সাধারণত এই মূলনীতিগুলো নির্দিষ্ট কিছু আচরণ (behaviour) ও তাদের উপর পরিবেশের প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে। তারপরও বলতে হয়, এগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে; কেননা এর মাধ্যমে সব ধরনের শিক্ষণ ও আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আচরণ এতই জটিল যে নিছক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলা ঠিক নয়। সেক্যুলার আচরণবিদরা (বিহেভিয়ারিস্ট) শেখার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও অনুধাবন (cognition); ইচ্ছাশক্তি (volition) ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের (choice) মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভূমিকাকে উপেক্ষা করেন। তাদের চিন্তাধারা অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য জবাবদিহিতা বা দায়দায়িত্ব আরোপ করা যায় না। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামি চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক, কেননা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও তার ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

৮.২ আধ্যাত্মিক নমুনা প্রদর্শন (মডেলিং)

নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমেও শিক্ষণ ঘটে। মডেলিং (নমুনা প্রদর্শন) বা 'দেখে শেখা' (অবজারভেশনাল লার্নিং) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে অপর ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট আচরণ প্রত্যক্ষ করে অনুকরণ করা হয়। বিজ্ঞানীরা বাস্তবিকই মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব অংশে 'প্রতিরূপী নিউরন'(মিরর নিউরন) আবিষ্কার করেছেন যা এ ধরনের শিক্ষণের নিউরাল ভিত্তি প্রদান করেছে।[২] সঙ্গতকারণেই নমুনা (মডেল) সবচেয়ে কার্যকরী হয় যখন মডেলের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকে।

আলবার্ট বান্ডুরা (Albert Bandura) নামের একজন তাত্ত্বিক (social learning theorist) মনোবিজ্ঞানের 'মডেলিং কনসেপ্ট' সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'কোনো নির্দিষ্ট আচরণ কার্যকর করতে বা নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করতে নমুনা প্রদর্শনের শক্তিশালী ভূমিকা বিশদভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে...মানুষের সামনে কোনো আচরণের দৃষ্টান্ত বা নমুনা উপস্থিত থাকলে তারা সেসব কাজ বা কর্মধারায় সহজে সংযুক্ত হয়, যেমন- পরোপকারী আচরণ, স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান, নগদ বা বিলম্বিত পুরস্কার অনুসন্ধান, সহমর্মিতা প্রকাশ, শাস্তিমূলক আচরণ বা নির্দিষ্ট খাদ্য ও পোশাক পছন্দ করা, নির্দিষ্ট বিষয়ে কথাবার্তা বলতে আগ্রহী হওয়া, কোনো কিছুতে কৌতূহলী বা নিষ্ক্রিয় হওয়া, নতুন বা প্রথাগতভাবে চিন্তা করা ইত্যাদি।'[৩]

---

[২] Ibid., p. 341.

[৩] Bandura, A., 1986, Social Foundations of Thought and Action, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, p. 206.

অবজারভেশনাল লার্নিং বিষয়ে (দেখে শিখা) সাম্প্রতিক সংযোজন হলো 'স্পিরিচুয়াল মডেলিং'। কোনো ধর্মীয় অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্বের জীবন ও আচরণ নকল করার মাধ্যমে মানুষ যে আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত হতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। হতে পারে সেই ব্যক্তিত্ব অতীতের কোনো ব্যক্তি (নবি) অথবা সাম্প্রতিক ব্যক্তিত্ব (কোনো ধর্মীয় পরিবার বা গোষ্ঠী)।[৪] এখানে মূল চালিকাশক্তি হলো 'অবজারভেশনাল স্পিরিচুয়াল লার্নিং', যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যদেরকে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় দক্ষতা ও আচরণ শিখে নেয়।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আধ্যাত্মিক মডেলের শ্রেষ্ঠ নমুনা। জীবনে আত্মিক প্রশান্তি ও 'ভালো থাকা'র জন্য ইসলামে নির্দেশিত আচার অনুষ্ঠান, সামগ্রিক জীবনবোধ ও দর্শনের দিক দিয়ে তিনিই আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। কিয়ামত পর্যন্ত তাকেই মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত ও বিশ্বজনীন রোলমডেল-এর মর্যাদায় বিভূষিত করা হয়েছে। অনন্যসাধারণ নৈতিকতা, ন্যায়সঙ্গত আচরণবিধি ও উন্নত চরিত্রমাধুর্যের নমুনা রয়েছে তাঁর জীবনে। আরও রয়েছে অসাধারণ দক্ষতা। এগুলো সবই সেই বিশেষ লক্ষণ যা নবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থানকে ফুটিয়ে তোলে।[৬]

পবিত্র কুরআনে আক্ষরিকভাবেই তাকে 'রোল মডেল' হিসেবে পেশ করা হয়েছে,

- 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে **উত্তম নমুনা** রয়েছে।' (সূরাহ আহযাব, ৩৩:২১)

(أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) শব্দটিকে এখানে 'উত্তম নমুনা' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এর অর্থ এমন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ, যাকে অবশ্যই অনুকরণ ও আনুগত্য করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যখন অন্যকে অনুসরণ করে, তখন তার আচার-আচরণ ও ভঙ্গি সবকিছু নকল করে। এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের জীবনে নবি মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। মুসলিমরা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পথ ও মত অনুসরণ করতে আদিষ্ট।

রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করা মূলত আল্লাহর আনুগত্য করারই আরেক রূপ। আল্লাহ বলেছেন,

- 'যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।' (সূরাহ নিসা, ৪:৮০)

---

[৪] Oman, D., & Thoreson, C.E., 2003, Spiritual modeling: A key to spiritual and religious growth?, The International Journal for the Psychology of Religion, 13 (3), p. 150.

[৫] Ibid.

[৬] al-Mubarakpuri, S., 1996, The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet, Riyadh, Saudi Arabia: Dar-us-Salam Publications, pp. 496-503.

রাসূলের কাছ থেকে যে জ্ঞান এসেছে তার উৎসও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহী। এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে,

- 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।' (সূরাহ আনফাল, ৮:২০)

- অন্যত্র বলেছেন,

  '... রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক ...' (সূরাহ হাশর, ৫৯:৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৩২)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া।' (সূরাহ নূর, ২৪:৫৪)

শেষোক্ত দুটি আয়াতে এসেছে, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক হিদায়াত ও আল্লাহর রহমতের উপর থাকবে। সর্বোচ্চ সাধ্যমত রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যদি সেগুলো আঁকড়ে ধরো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।' (উত্তম সনদে বর্ণিত, মালিক, আল-হাকিম, আল-বাইহাকি)।

আরেক হাদিসে এসেছে, 'বনি ইসরাইল বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মাত তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে, তাদের সবাই জাহান্নামী একটি ব্যতীত। তারা (সাহাবিরা) বললেন, সেই এক দল কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন: (যারা) আমার ও আমার সাহাবিদের পথের উপর থাকবে।' (তিরমিযি, সনদ নির্ভরযোগ্য)

রাসূলের সুন্নাত বর্ণিত হয়েছে হাদিসের মাধ্যমে। হাদিস হলো তাঁর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির সমষ্টি। গুরুত্ব ও সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনায় কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। কেননা, আল্লাহর অনুপ্রেরণায়ই তিনি যা যা বলেছেন ও করেছেন, সেগুলোই হাদিস হিসেবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। রাসূলের এসব সুন্নাতকে সংরক্ষণ করা হয়েছে বিভিন্ন কিতাবে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ হলো সহীহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম। রাসূলের সঙ্গীসাথীগণ (সাহাবায়ে কেরাম) তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজকে সংরক্ষণ করেছেন ও মুখস্ত করে রেখেছেন। এগুলোই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলিমগণ

প্রচার করেছেন। তাঁরা হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য এক সূক্ষ্ম ও কঠোর পদ্ধতিও তৈরি করে গেছেন যাতে বিশুদ্ধ হাদিস থেকে দুর্বল ও জাল হাদিস আলাদা হয়ে যায়।

চলুন, পূর্বের আলোচনায় ফেরত যাই। সাধারণভাবে 'অবজারভেশনাল লার্নিং'কে (দেখে শেখা) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য **চারটি প্রক্রিয়া** প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলো 'অবজারভেশনাল স্পিরিচুয়াল লার্নিং' এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য[৭]

১। মনোনিবেশ (attention) : মনোনিবেশ চর্চা করা হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিছু আচারের মধ্য দিয়ে, যা সেই অনুকরণযোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের দিকে সকলকে মনোযোগী করে তোলে।[৮] যেমন, ইসলামে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আল্লাহর রাসূলের উপর দরুদ পেশ করার মাধ্যমে তাকে স্মরণ করা হয়, এভাবে প্রত্যেক মুসল্লীকে প্রতিনিয়ত মনোযোগী করে তোলা হয় নবিজির দৃষ্টান্ত অনুকরণের দিকে।

২। স্মৃতিশক্তি (retention) : ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবনের নানা ঘটনা ও শিক্ষা বারবার আলোচনার মাধ্যমে অনুকরণকারীদের অন্তরে অনুকরণকৃত ব্যক্তির স্মৃতি চাঙ্গা রাখা হয়। এটি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা বক্তব্যের মাধ্যমে হতে পারে।[৯] ইসলামে এই পদ্ধতির একটি স্পষ্ট নমুনা হলো রাসূলের সীরাত ও হাদিস অধ্যয়ন করা।

৩। অনুকরণ (reproduction) : ব্যক্তি যা শিখেছে সেগুলো দৈনন্দিন জীবনে পালন করার মাধ্যমে ও দক্ষতা অর্জনের চেষ্টার মাধ্যমে এটি ঘটে।[১০] ইসলামে এর উদাহরণ হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জিকির-আজকার, উত্তম আচার-ব্যবহার ইত্যাদি।

৪। প্রেষণা (motivation) : আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টায় এটি চূড়ান্ত ধাপ। এখানে মনোযোগ প্রদান করা হয় পুরস্কারের দিকে। যদি ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার উপর অটল থাকতে পারে তবে সেই পুরস্কার সে অর্জন করবে।[১১] ইসলামে মুমিনদের প্রতি ওয়াদাকৃত শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়গুলো এই মর্মে সুপরিচিত।

---

[৭] Bandura, 1986, pp. 51-55; Oman and Thoreson, 2003, p. 154.
[৮] Oman and Thoreson, 2003, p. 154.
[৯] Ibid.
[১০] Ibid.
[১১] Ibid., p. 155.

||অধ্যায় নয়||

জীবনের উত্থান-পতন ও পরীক্ষা

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জীবনকে এভাবেই নির্ধারণ করেছেন যে, এখানে নানা পরীক্ষা, বালা-মুসিবত, কষ্ট-বিপত্তি থাকবেই। ভালোমন্দ উভয় অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ আসলে আমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি বলেছেন:

- 'প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরাহ আম্বিয়া, ২১:৩৫)

মানুষের জীবনে একের পর এক পরীক্ষা আসতেই থাকবে। এটাই নিয়তির বিধান। দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু তাকদিরে নির্ধারিত পরীক্ষার উপাদান। দুঃখ-কষ্ট কিংবা আরাম-আয়েশ, সম্পদ, প্রাচুর্য, দারিদ্র, ভালোমন্দ ইত্যাদি সবকিছুই পরীক্ষার উপাদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্ট ও বিপদ-আপদে পতিত হলে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তা জেগে উঠে। মিথ্যা বিশ্বাস, ভ্রান্ত মতাদর্শ ও আচার-আচরণের নিচে বিশুদ্ধ ফিতরাতের যে বৈশিষ্ট্যগুলো চাপা পড়ে থাকে, সেগুলো জেগে ওঠে। তখন আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদেরকে বিপদ ও কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন,

- 'আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:১২)

- অন্যত্র বলেছেন,

'তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায় ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও-অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:২২-২৩)

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বললে, এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য আমাদেরকে কষ্ট দেয়া নয়; বরং আমাদের জীবনের বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করার জন্যই এগুলো ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে মন্দ ও অকল্যাণকর মনে হলেও, বাস্তবে প্রত্যেকটি পরীক্ষা দিনশেষে আমাদের জন্যই কল্যাণই বয়ে আনে। আল্লাহ অপার করুণা যে, মানুষের জন্য কেবলমাত্র কল্যাণকর বিষয়গুলোই তিনি তাকদিরে নির্দিষ্ট করেন। অনেক সময় সীমিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুনিয়ার ঘটনাগুলোর ব্যাখা আমাদের বুঝে না আসতে পারে। তবে এর মানে এই নয় যে, সেসবের মহত্তর কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। ধরন-ধাঁচ দেখে কিছু ঘটনার কারণ ও কল্যাণ (casue and effect) সহজেই বোঝা যায়। আবার সবই যে মানব-মস্তিষ্কে ধরা দেবে তা-ও নয়, কিছু বিষয় অস্পষ্টও থাকতে পারে। আসলে প্রতিটি ঘটনার প্রকৃত হিকমত বোঝা আমাদের বোধশক্তির বাইরে।

আল্লাহ্ বলেন,

- '... হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২১৬)

এই আয়াতটি জিহাদ প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে, যা পালন করা অনেক কষ্টকর মনে হয়, এমনকি মুমিনদের কাছেও। এই আয়াতেরই শুরুতে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।...' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২১৬)

কোনো বিষয়কে আমরা ক্ষতিকর মনে করলেও, তা আমাদের জন্য সর্বোত্তম হয়ে যেতে পারে, আবার আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণকর ঘটনাও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। একজন মুজাহিদকে যেসব কষ্ট ও সংগ্রাম করতে হয়, তার তুলনায় জিহাদের পুরস্কার ও কল্যাণ নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

সাইকোলজির কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষ সাধারণত ধর্মের মাধ্যমে (religious coping) ধকলপূর্ণ সময় সামলে উঠে; মূলত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মীয় সমাজের সহায়তাই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে। 'রিলিজিয়াস কোপিং' বলতে বোঝায়: 'ধকলপূর্ণ (stressful) পরিস্থিতিতে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ কোনো তাৎপর্য ও অর্থ খুঁজে পায়।'[১] এটি জীবনকে অর্থবহ করে এবং দুঃখ-দুর্দশা, ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব,

[১] Pargament, K. I., 1997, The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice, New York: Guilford Publications, p. 90.

অনুশোচনা ও ক্ষমার মতো বিষয়ের একটা ব্যাখ্যা তার সামনে দাঁড় করায়। পরিস্থিতি যত গুরুতর হয়, তত বৃদ্ধি পায় ধর্মের উপর নির্ভরশীল হবার সম্ভাবনা।

৯.১ পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টের উদ্দেশ্য

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পরীক্ষাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য সত্য প্রত্যাখানকারীদের থেকে আত্মসমর্পণকারীদের পৃথক করা - সহজ কথায়, কাফিরদের থেকে মুসলিমদের পৃথক করা। আল্লাহ্ বলেন,

- 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

  আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।' (সূরাহ আনকাবুত, ২৯:২-৩)

মানসিক-আঘাত (post-trauma) পরবর্তী সময় নিয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা হতে কুরআনের উক্ত আয়াতের সমর্থন পাওয়া যায়। মানসিক আঘাতের কারণে ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের শক্তিতে পরিবর্তন আসে; হয়তো সে ধর্মকে ত্যাগ করে কিংবা দুর্বলভাবে পালন করে,[২] নয়তো আরও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে।[৩] বিপদাপদে সংগ্রামের ফলে ব্যক্তির মাঝে যে পরিবর্তন আসে, তা আগের চেয়ে কর্মক্ষমতার উন্নতি ঘটায়। এভাবে 'ট্রমা'(মানসিক আঘাত) পরবর্তী সময়ে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনও অর্জিত হতে পারে।[৪]

পরীক্ষার নেয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এর দ্বারা আল্লাহ নতুন কিছু জেনে নিচ্ছেন যা পরীক্ষা না করলে তিনি জানতেন না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী, তিনি সবকিছু জানেন। অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তে। আল্লাহ ইতোমধ্যেই জানেন মানুষদের মধ্যে কারা ব্যর্থ হবে, কারা জাহান্নামে যাবে এবং কারা জান্নাতে যাবে। আমাদের পরীক্ষাগুলোর উদ্দেশ্য হলো, হাশরের দিনে আল্লাহর ন্যায়বিচার ও রহমতকে পরিপূর্ণতা প্রদান করা। দুনিয়ার জীবনে নিজেদের পছন্দ মাফিক কাজের কারণে কিছু মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর অনুগত ও আত্মসমর্পিত বান্দাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে। কার্যতঃ মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, এককভাবে নিজেদের আমলের জোরে নয়।

---

[২] Falsetti, S. A., Resick, P. A., & Davis, J. L., 2003, Changes in religious beliefs following trauma, Journal of Traumatic Stress 16(4), p. 392.
[৩] Linley, P. A., & Joseph, S., 2004, Positive change following trauma and adversity: A review, Journal of Traumatic Stress, 17(1), p. 11.
[৪] Ibid.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের আমল নাজাত দেবে না। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকেও না'? তিনি বললেন, আমাকেও না। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে নিবেন।'(বুখারি)

আল্লাহর রহমতের একটি বিশেষ অংশ হলো তিনি ভালোকাজের পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। ফলে কোনো ব্যক্তি নিজের চূড়ান্ত পরিণতি ও ঠিকানা নিয়ে কোনো যুক্তি-তর্ক পেশ করতে সক্ষম হবে না।

দুনিয়ার জীবনে একজন ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট-যাতনা তার গুনাহ মাফের উপলক্ষ্য হয়ে যায় অথবা গুনাহ মাফের সাথে সাথে নেক আমল ও সাওয়াবও বৃদ্ধি করে। উভয় অবস্থাতেই উপকৃত হন কষ্টভোগকারী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

আর গুনাহগার ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবেও বিপদ-আপদ আসতে পারে। এটিও প্রকারান্তরে আল্লাহর রহমত, কেননা এর মাধ্যমে গুনাহগার ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ পায়। দুনিয়ার যেকোনো শাস্তি আখিরাতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কাজেই সরল পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়ার বিপদাপদ একপ্রকার স্মরণিকা। আল্লাহ বলেছেন,

- 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।' (সূরাহ রুম, ৩০:৪১)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।' (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:২১)

এখানে লঘু শাস্তির মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষা, বিপদাপদ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং আখিরাতের কথা চিন্তা করলে দুনিয়ার বিপদাপদ বরং উপকারীই মনে হয়। যেহেতু বিচার দিবসে ভালোমন্দ আমল অনুসারে আমাদের বিচার করা হবে। যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম, আর নেক আমলের পাল্লা হালকা হলে ব্যর্থ। প্রতিটি বিপদাপদের পেছনে আল্লাহ তাআলার একটি পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য থাকে। আর সেটা হলো আখিরাতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। সেটা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমেই হোক, কিংবা জান্নাতীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই হোক।

এ সকল বিষয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে আমাদের সহায়তা করা। এক্ষেত্রে আগুন ও স্বর্ণের একটি উপমা পেশ করা যায়। আগুন যেভাবে স্বর্ণের

খাদ দূর করে, বিপদাপদ সেভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক গুণাগুণকে বিশুদ্ধ করে। খাদ দূর না হলে আত্মায় প্রলেপ পড়ে যায়। তখন সেটা তার আধ্যাত্মিক বিকাশে সর্বোচ্চ উন্নতি অর্জন করতে পারে না।

যেহেতু মুমিনের প্রধান লক্ষ্য আখিরাত, এ কারণে এই বিষয়গুলোর সঠিক বুঝ আমাদেরকে ধৈর্যশীল ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ করে তোলে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও বিপদের বদলা হিসেবে প্রাপ্ত পুরস্কারের কথা ভাবলে দুঃখের বোঝা হালকা অনুভূত হয়। যদি শেষ অব্দি আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করি ও ধৈর্যশীল হয়ে থাকতে পারি, তাহলে দিনশেষে সকল বিপদ ও পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলটি আমাদেরকে উপকৃতই করবে। আল্লাহ ও তাঁর পরিকল্পনার প্রতি আত্মসমর্পণের পুরস্কার আমরা তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার আশা রাখব।

যেকোনো পরীক্ষার ফলস্বরূপ আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা আসার কথা, আল্লাহর আরও কাছে আসার কথা এবং মন শক্ত হওয়ার কথা। এই লাভগুলো তখনই আসবে, যদি আমরা সবর করি এবং কষ্ট লাঘব হওয়ার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

- 'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,'যে ব্যাক্তি বিপদে এই দুআ পড়বে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন..." অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দান করুন এবং যা ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন।' তাহলে মহান আল্লাহ তাকে তার বিপদের প্রতিদান দেন এবং সে যা কিছু হারিয়েছে তার থেকে উত্তম বদলা দেন। ...(মুসলিম)

আস-সালিহ জীবনের পরীক্ষাগুলো থেকে শেখার মত পাঁচটি শিক্ষা[৫] বাছাই করেছেন,

১। আল্লাহর ইবাদাত, ঈমান ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি : বিপদ-আপদের ফলে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা অনুভব করতে পারে। সে বুঝতে পারে আল্লাহ ছাড়া তার কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই। ফলে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যায় এবং তাঁর উপর নির্ভর করতে শিখে। এভাবে ব্যক্তির তাওহিদের বুঝ শক্তিশালী হয় ও ঈমান বৃদ্ধি পায়।

---

[৫] as-Saalih, S., 2006, Testing, affliction, and calamities, retrieved October 26, 2010 from http://albaseerah.org/forum/showthread.php?t=4151.

২। দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা অনুধাবন : দুনিয়ার জীবন কখনো হাসি আনন্দে কাটে আবার কখনো দুঃখ বেদনায় ভরে যায়। পরীক্ষাগুলো আমাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও তুচ্ছতা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন আমরা দুনিয়াকে আঁকড়ে পড়ে না থাকি।

৩। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরকে স্মরণ করা: আল্লাহ বলেন,

- 'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

  এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরাহ হাদীদ, ৫৭:২২-২৩)।

এই আয়াত আমাদেরকে বিপদে ও আনন্দে ভারসাম্য প্রদান করে। কোনো বিষয়ে এত খুশি ও আনন্দিত হওয়া উচিত নয় যে আমরা গর্ব ও অহংকার করতে শুরু করব; আবার কোনো কিছুতে এত দুঃখিত ও বিমর্ষ হওয়া উচিত নয় যে আমরা হতাশ হয়ে যাব। কেননা, সবকিছুই আল্লাহর তাকদির ও ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে।

৪। নিজেদের অপারগতা ও আত্মিক ব্যাধি স্মরণ করা:

- আল্লাহ বলেছেন,

  'আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সব বিষয়েই যথেষ্ট-সববিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। '(সূরাহ নিসা, ৪:৭৯)

এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের অপারগতাগুলো অনুভব করে সেগুলো দূর করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত, যেন আখিরাতে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে না হয়। আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ার যেকোনো দুঃখকষ্ট ও বিপদ হতে বহুগুণ অসহনীয়। আল্লাহ বলেন,

- 'তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।' (সূরাহ শুরা, ৪২:৩০)।

এই আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি পরীক্ষা করেন যেন আমরা তাওবা করে আবার তাঁর দিকে ফিরে যেতে পারি। তিনি বলেছেন,

- 'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।' (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:২১)

৫। ধৈর্যশীলতা অর্জন : সত্য ও আনুগত্যে অটল থাকার জন্য সবরের প্রয়োজন। মিথ্যা ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচতেও ধৈর্য্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

- 'এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।' (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৩৫)

একজন মুমিন সর্বদা দুই অবস্থার যেকোনো এক অবস্থায় থাকে। হয় সে শোকর করে, নয়তো সবর করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'একজন মুমিনের অবস্থা খুবই আশ্চর্যজনক ,তার জন্য সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটি একমাত্র মুমিনের সাথেই ঘটে। যদি আনন্দদায়ক কিছু ঘটে তাহলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আর এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে ধৈর্য্যধারণ করে এবং এটাও (পরিণামে) তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম)

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ কথাগুলোকে এভাবে লিখেছেন,

> 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই। আল্লাহর কাছেই আমরা অনুনয়-বিনয় করি, তাঁর কাছেই (দুআর) জবাব লাভের প্রত্যাশা করি। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই আমাদের পর্যবেক্ষক, তিনি অবারিত রহমত বর্ষণ করে চলেছেন ভিতরে ও বাহিরে। তিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (১) যারা নিয়ামত প্রাপ্ত হলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর (২) পরীক্ষায় পতিত হলে সবর করে, (৩) গুনাহ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বান্দার সুখের স্মারক; দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার নিদর্শন। এই তিনটি অবস্থা থেকে কোনো বান্দাই মুক্ত নয় বরং প্রত্যেকেই এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় আবর্তিত হতে হয়।
>
> **প্রথম অবস্থা** হলো নিয়ামত লাভ করা।
>
> বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক নিয়ামত আসতে থাকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের (শোকর) মাধ্যমে এই নিয়ামতগুলো সুরক্ষিত থাকে। এর তিনটি ভিত্তি রয়েছে; (১) অন্তরের নিয়ামতের স্বীকৃতি অনুভব করা, (২) বাহ্যিকভাবে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটানো ও শুকরিয়া আদায় করা এবং (৩) সেই নিয়ামতগুলোকে এমন কাজে ব্যবহার করা যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। তাঁর কাছ থেকেই সকল অনুগ্রহ আসে এবং তিনিই সবকিছুর দাতা। এভাবে আমল করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করে, যদিও আল্লাহর অনুগ্রহের বিপরীতে কোনো শুকরিয়াই যথেষ্ট নয়।
>
> **দ্বিতীয় অবস্থা** হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষায় পতিত হওয়া। এগুলোর মাধ্যমে তিনি বান্দাকে যাচাই করেন। বান্দার কর্তব্য হচ্ছে বিপদে পড়লে সবর করা এবং তাকদিরের উপর ধৈর্য্যশীল থেকে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজের জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করা, যেমন- নিজের গালে আঘাত করা, শোকাহত হয়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, চুলদাঁড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি হতে বিরত থাকা। এভাবে সবরেরও তিনটি ভিত্তি রয়েছে, যদি বান্দা সেগুলো বজায় রাখতে পারে তাহলে বিপদ পরিণত হয় নিয়ামতে, পরীক্ষা থেকে আসে পুরস্কার এবং অপছন্দনীয় বিষয় হয়ে যায় কাঙ্খিত প্রিয় বিষয়! কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাকে

ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য পরীক্ষা নেন না বরং তিনি বান্দার সবর ও আনুগত্য (উবুদিয়াত) পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে যাচাই করেন। কেননা, বিপদ হোক, কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য— সর্বাবস্থায় বান্দা আল্লাহর অনুগত থাকতে বাধ্য, আল্লাহ আমাদের আনুগত্যের হকদার। অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে আমাদেরকে সেভাবেই আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, যেভাবে পছন্দনীয় পরিস্থিতিতে করে থাকি। অথচ বেশির ভাগ লোকের অবস্থাই উল্টোটা। এভাবেই আল্লাহর নিকট পৃথক হয় বান্দাদের মর্যাদা ও অবস্থান এবং নির্ধারিত হয়ে যায় চূড়ান্ত গন্তব্য।[৬]

শাইখ ইবনে উসাইমীন উল্লেখ করেছেন, প্রতিক্রিয়া অনুসারে সাজালে বিপদ-আপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষদের অবস্থাকে চার স্তরে ভাগ করা যায়:[৭]

১। যে অবস্থা নিষিদ্ধ: যারা বিপদে পড়লে আল্লাহর উপর ক্ষেপে যায় এবং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়! যেমন- যারা নিজেদের ধ্বংসের দুআ করে, জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, গালে থাপ্পড় মারে ইত্যাদি।

২। যে অবস্থা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক : বিপদে ধৈর্যশীল থাকা বাধ্যতামূলক। এই স্তরের লোকেরা বিপদ-আপদকে সহ্য করার চেষ্টা করে, যদিও সেগুলোকে তারা অপছন্দ করে। কিন্তু নিজেদের ঈমানের কারণে তারা প্রথম দলের মতো অসন্তুষ্ট হয় না।

৩। যারা বিপদ কবুলকারী : এই বান্দাদের কাছে বিপদ-আপদ স্বাভাবিক অবস্থার অনুরূপ! এগুলো সহ্য করা তাদের কাছে মোটেও কঠিন নয়।

৪। সর্বোচ্চ স্তর: যারা কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দা তাঁরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লাহর প্রতি শোকরগুজার হওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়। তারা বিপদের মুখেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; কেননা তারা বুঝতে পারেন যে বিপদের মাধ্যমে অনেক কল্যাণ লাভ হয়, যেমন- গুনাহ মাফ, নেক আমল বৃদ্ধি ইত্যাদি।

৯.২ ধর্মীয় কোপিং (Religious coping) এর উপকারিতা

জীবনের সংকটময় পরিস্থিতি— যেমন অসুস্থতা, মানসিক বা শারীরিক আঘাত, যুদ্ধ, প্রিয়জনের মৃত্যু ইত্যাদিতে ব্যক্তির মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের সাথে 'রিলিজিয়াস কোপিং' এর প্রভাব জড়িত।[৮] শুধুমাত্র 'নন-রিলিজিয়াস কোপিং' পদ্ধতিগুলোর প্রভাব যেখানে শেষ, সেখানে 'রিলিজিয়াস কোপিং' আরও সুস্বাস্থ্য ও 'ভালো থাকা' নিশ্চিত করে।[৯]

---

[৬] al-Jawziyyah, 2000, pp. 1-2.

[৭] Ibn al-Uthaymeen, M. S., In Times of Calamity, People Divide into Four Levels, retrieved October 25, 2010 from http://abdurrahmanorg.wordpress.com/2010/08/29/in-times-of-calamity-people-divide-into-four-levels/.

[৮] Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G., & Perez, L., 1998, Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors, Journal for the Scientific Study of Religion, 37(4), p. 710.

[৯] Pargament, 1997, pp. 279-288.

পারগামেন্ট (Pargament) প্রস্তাব করেছেন, 'রিলিজিয়াস কোপিং' পদ্ধতিগুলো একজন ব্যক্তির ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার মাঝে সম্পর্ক গড়ে দেয়, অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারকে এক ধরনের 'কোপিং' বলে মনে করতে হবে।[১০] বিভিন্ন ধকলপূর্ণ পরিস্থিতিতে এগুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের উপর।

কোপিং-এর সময় আধ্যাত্মিক উপকারিতার মধ্যে রয়েছে— মানসিক আঘাত (ট্রমা) থেকে সেরে ওঠার ও স্বস্তির উপায় বাতলে দেয়া; আশা ও স্বপ্ন দেখানো; ঘটনাটির একটা অর্থ ও উদ্দেশ্য দাঁড় করানো; ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা-জ্ঞান-উপকরণ দ্বারাই সামলে ওঠার একটা রাস্তা দেখানো; আত্ম-নিয়ন্ত্রণের একটি বাহ্যিক কাঠামো প্রদান করা; এবং দুঃসহ স্মৃতি কাটিয়ে ওঠার পথ দেখানো।

গবেষকরা নির্ণয় করেছেন, এক প্রকারের ধর্মীয় 'কোপিং' যাকে বলা হয় 'সমন্বিত ধর্মীয় কোপিং' (collaborative religious coping) দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ উপকার সাধন করে। 'সমন্বিত ধর্মীয় কোপিং' এর ক্ষেত্রে 'গডের' কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, আবার একই সাথে অব্যাহত থাকে নিজের চেষ্টাও, অর্থাৎ এটি একটি 'পার্টনারশিপ' পদ্ধতি।[১১]

অন্যান্য 'কোপিং' পদ্ধতিগুলোতে কখনো ব্যক্তি নিজেই এককভাবে সবকিছু সমাধান করতে চায় (self dicecting method; এখানে 'গডের' কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করা হয় না); আবার কিছু পদ্ধতিতে সবকিছু 'গডের' কাছে সঁপে দিয়ে নিজে হাল ছেড়ে বসে যায়, সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা না করে নিষ্ক্রিয় থাকে (deferring method; মুলতবি রাখা, স্থগিত রাখা)। এসব পদ্ধতি থেকে মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে সমস্যার তীব্রতাও।[১২]

চমকপ্রদ বিষয় হলো, ইসলামি জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার বিষয়টি কিছু দিক থেকে 'সমন্বিত ধর্মীয় কোপিং' (collaborative religious coping) এর মতো (যেমন- আল্লাহর উপর ভরসা করার পর মুসলিমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখে)। তবে এখানে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলিমরা সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর সাথে কোনো 'অংশীদারীত্ব' স্থাপন করে না। বরং মুসলিমরা আল্লাহকে সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান বিবেচনা করেন, তিনি কোনো অংশীদারীত্বের মুখাপেক্ষী নন, একাই যেকোনো সমস্যা সমাধানের পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রাখেন, সর্বশক্তিমান। 'সমন্বিত ধর্মীয় কোপিং' পদ্ধতিতে 'গডের' সাথে পার্টনারশিপ মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আলোকপাত করা হয়। কিছুক্ষেত্রে এই

---

[১০] Ibid.

[১১] Pargament et al., 1998, p. 711.

[১২] Fabricatore, A. N., Handal, P. J., Rubio, D. M., & Gilner, F. H., 2004, Stress, religion, and mental health: Religious coping in mediating and moderating roles, The International Journal for the Psychology of Religion, 14(2), p. 104; Pargament et al., 1998, pp. 711-712.

'অংশিদারিত্ব' সমপর্যায়ের ধরা হয়, যা নিঃসন্দেহে ইসলামি চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক। তবে আল্লাহর উপর নির্ভরতাকে ঊর্ধ্বে রেখে এবং আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে থেকে যখন ব্যক্তি কোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে, সেটি সাংঘর্ষিক নয় বরং প্রশংসিত।

আল্লাহ্ বলেন,

- '...যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।' (সূরাহ তালাক, ৬৫:৩)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরাহ আহযাব, ৩৩:৩)

বিভিন্ন মানসিক ধকল ও কঠিন চাপের সময়ে আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত উপায়-উপকরণের মাধ্যমে শরিয়াহর সীমানার ভিতরে নিজের করণীয় কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। একই সাথে নির্ভরতা ও ভরসা থাকবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। এভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল দুনিয়া ও আখিরাতের কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের দিকে চালনা করে। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে কিংবা আল্লাহর রহমতের আশা বাদ দিয়ে কেবল নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করবে। ভরসা এবং প্রচেষ্টা— দুটোই লাগবে।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বিষয়টি তাকদিরের প্রতি ঈমানের সাথে জড়িত। আল্লাহ বলেছেন,

- 'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরাহ হাদীদ, ৫৭:২২-২৩)

দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনেক সময় দেখা যায়, বিপদ-আপদ কেটে গেলে মানুষ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়; অথচ মুসীবত চলাকালীন সময়ে তার আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। আলোচ্য অধ্যায়ের শুরুতে এই সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। দুঃখ-দুর্দশা কেটে যাবার পর কুফরিতে ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

- 'বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে

অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।' (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৫০)

আল্লাহ তাআলা ক্রমাগত মানুষকে পরীক্ষা করতে থাকেন যেন আমরা তাওবা করে তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পাই।

||অধ্যায় দশ||
চেতনা, ঘুম এবং স্বপ্ন

(consciousness) চেতনা বলতে সাধারণত নিজের ব্যাপারে, চারপাশের পরিবেশের ব্যাপারে এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে হুঁশ বা সজ্ঞানতাকে বোঝানো হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কাজ, যৌক্তিক যেকোনো চিন্তা, সমস্যার সমাধান এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে এই সচেতন চিন্তাপ্রক্রিয়া আমাদের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় অবচেতনভাবেও আমরা নানা রকম তথ্য সন্নিবেশন করি, যেমন- গাড়ি চালানোর মতো কাজে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কয়েকটি কাজ একসাথে চলতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয় ও স্নায়বিক ব্যবস্থাপনা (nervous system) নিজে নিজে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে ঠিকই, কিন্তু যেহেতু 'সত্যিকারভাবে' কাজটাতে মনোযোগ দেয়া হয়না, তাই তার প্রতি পূর্ণ সজ্ঞানে 'সচেতন' থাকি না।[১]

জাগ্রত অবস্থাতেও অনেক সময় সচেতনতার কিছুটা ঘাটতি থাকতে পারে, যেমন- দিবাস্বপ্ন বা ঝিমুনি। ইসলাম সুস্থ কার্যক্ষম জীবনযাপনের জন্য মন ও চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতাকে জরুরি মনে করে। ঠিক এ কারণেই অ্যালকোহল, বিভিন্ন রকম মাদকদ্রব্য কিংবা যা যা এই চেতনাকে হরণ করে; চিন্তা ও বোধশক্তিকে অকেজো করে দেয়, সেগুলো সব ইসলামে নিষিদ্ধ। এছাড়াও হিপনোসিস (সম্মোহন), কিছু সুনির্দিষ্ট প্রকারের মেডিটেশন (ধ্যান) এবং যোগব্যায়াম (yoga), কিছু সুফি তরিকার বিভিন্ন রকম চর্চা ইত্যাদি এই নিষিদ্ধ ক্যাটাগরিতে পড়বে।

১০.১ ঘুম

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, মানুষের দৈহিক চাহিদাগুলোর অন্যতম প্রধান উপাদান ঘুম। এটি জাগ্রত অবস্থার বিপরীত এবং একটানা জাগ্রত অবস্থার পরিসমাপ্তি। যদিও ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়, এ অবস্থায় কৃতকর্মের কোনো দায় ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর বর্তাবে না, তারপরও এই ঘুমও কিন্তু ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন- দৈহিক শক্তি ও সজীবতা ফিরিয়ে এনে আবার অন্যান্য ইবাদাতে লেগে যাওয়ার জন্য যদি কেউ ঘুমায়। আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন ঘুমের উদ্দেশ্য দেহকে বিশ্রাম দেওয়া:

- 'তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, (সূরাহ নাবা, ৭৮:৯)

---

[১] Myers, 2007, pp. 271-273.

নানাবিধ কারণে ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই ঘুম ও বিশ্রামের গুরুত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। দিনভর কাজের ব্যস্ততার পর ঘুম দেহের কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে, মস্তিষ্কের টিস্যুগুলোকে পুনঃস্থাপন ও মেরামত করে। এ কারণেই সকালে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি সজীব ও সতেজ হয়ে। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, মনোযোগ বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, সৃজনশীলতা, কোনো সমস্যার সমাধান ও মেজাজ ঠিক রাখার জন্য ঘুম খুব জরুরি। ঘুম দেহের প্রতিরক্ষা-কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা শক্তিশালী করে।[২]

ঘুম আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তিনি বলেছেন,

- 'তাঁর আরও নিদর্শনঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরাহ রুম, ৩০:২৩)

ঘুম মৃত্যুর সমতুল্য এবং একে 'ছোট মৃত্যু' বলে গণ্য করা হয়। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে পুনরুত্থানের। যখন রাতে কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে যায় তখন ফেরেশতারা তার রূহকে নিয়ে যান। এরপর আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন যে, সেই রূহকে পুনরায় ফেরত পাঠানো হবে কিনা। যদি আল্লাহ ঘুমন্ত ব্যক্তির রূহকে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নেন তখন ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়ে দেন। আর যদি রূহকে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন ঐ ব্যক্তি অবশিষ্ট হায়াত পূরণের সুযোগ লাভ করে। এভাবে তাকদিরে নির্ধারিত মৃত্যুর মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত তার দেহে রূহকে ফেরত পাঠাতে থাকেন।[৩] আল্লাহ বলেন:

- 'তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সম্মুখিত করেন-যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:৬০)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৪২)

১০.২ ঘুমের আদবকেতা

ঘুমের আগে নবিজির বিভিন্ন সুন্নাত অনুসরণের জন্য মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ওযু করে ডান কাত হয়ে ঘুমানো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তুমি বিছানা গ্রহণ করবে, তখন নামাজের মত ওযু করবে, তারপর তোমার ডান

---

[২] Ibid., pp. 280-283.

[৩] al-Ashqar, 2002a, pp. 28-29.

পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়বে। তারপর বল, 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম,..'(বুখারি ও মুসলিম)

ওযু করে শোয়া বাধ্যতামূলক নয় তবে বিভিন্ন কারণে এটি প্রশংসিত। ঘুমের আগে পবিত্রতা অবস্থায় শোয়া জরুরি কেননা ঘুমিয়ে গেলে রূহকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেটা ফেরত দেয়া হবে কিনা আমরা জানিনা। রূহ যদি ফিরিয়ে দেয়া না হয়, তবে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুটা হলো। আর পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ তো আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। আরেকটি বিষয় হলো, ওযু অবস্থায় দেখা স্বপ্ন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং আপনি শয়তানের ক্ষতি থেকেও সুরক্ষিত থাকবেন।[৪] ডান কাতে ঘুমাতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকভাবেও আবিষ্কৃত হয়েছে এর বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত উপকারিতা, যেমন- হৃদপিন্ডের ওপর কম চাপ সৃষ্টি হওয়া, হজমে সহযোগিতা, পিঠের জন্য উপকারিতা ইত্যাদি। বিভিন্ন হাদিসে উপুড় হয়ে ঘুমানোকে নিন্দা করা হয়েছে।

রাতে ঘুমানোর পূর্বে একজন ব্যক্তির উচিত কুরআনের সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন সূরাহ, বিশেষ আয়াত ও দুআ পাঠ করে ঘুমানো, যেন ক্ষতিকর বিষয় ও অশুভ জিন শয়তান হতে সে রাতে সুরক্ষিত থাকে। যেমন, কুরআনের সর্বশেষ তিনটি সূরাহ (ইখলাস, ফালাক ও নাস), আয়াতুল কুরসি (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৫৫) এবং সূরাহ বাকারার শেষের দুই আয়াত ইত্যাদি।

আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সা.) প্রতি রাতে যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তাঁর দুই অঞ্জলী একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন। সে সময় 'কুল হুয়াল্লাহ আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল-ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন-নাস' পাঠ করতেন। তারপর উভয় হাতে যথাসম্ভব দেহ মাসেহ করতেন। মাথা চেহারা এবং শরীরের সামনের দিক থেকে তিনি তা শুরু করতেন। এভাবে তিনবার করতেন।' (বুখারি)

ঘুমের আগে পাঠ করার জন্য হাদিসে বিভিন্ন দুআ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার শয্যা গ্রহণ করতে বিছানায় আসে, সে যেন তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয় এবং বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়। কেননা, সে জানেনা যে, শয্যা ত্যাগ করার পর তার বিছানায় কি আছে। এরপর যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে তখন যেন ডান কাত হয়ে শয্যা গ্রহণ করে। এরপর সে যেন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি পবিত্র। আপনার নামেই আমি আমার পাঁজর রাখলাম, আপনার নামেই তা উঠাব। আপনি যদি আমার প্রাণ নিয়ে দেন তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি আপনি তাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে তাকে হিফাজত করুন যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাজত করে থাকেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

---

[৪] ash-Shulboob, F. A., 2003, The Book of Manners, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam, p. 280.

১০.৩ স্বপ্ন

স্বপ্ন বিষয়ে নানা সমসাময়িক তত্ত্ব দেখা যায় কিন্তু সেগুলোতে কোনো নিষ্পত্তি আসেনি। কেননা, যিনি স্বপ্ন দেখেছেন কেবলমাত্র তিনিই নিজের স্বপ্ন 'ভেরিফাই' (যাচাই) করতে সক্ষম। এটি আসলে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধানযোগ্য বিষয় নয়। এজন্যই স্বপ্নের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসা সম্ভব। ইসলামে স্বপ্নকে ঐশী অনুপ্রেরণার মতো মনে করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর ওহীর সূচনা ঘটেছিল কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমেই। আর নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে আদিষ্ট হয়েছিলেনও স্বপ্নে।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি হাদিস থেকে জানা যায়, স্বপ্ন তিন প্রকারের হয়ে থাকে বা তিনটি উৎস থেকে আসে। তিনি বলেছেন, 'যখন কিয়ামতের সময় সন্নিকটে হবে তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে, যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুমিনের স্বপ্ন হলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন হলো তিন ধরনের:

(১) সৎ স্বপ্ন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ স্বরূপ।

(২) আরেক স্বপ্ন হলো শয়তানের পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য আতংক বা ক্লেশ স্বরূপ।
(৩) আরেক ধরনের স্বপ্ন হলো মানুষ মনে যা ভাবে বা তার সাথে যা ঘটে, তা স্বপ্নে দেখে। যদি কেউ কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ে স্বপ্নে দেখে, তাহলে কাউকে বলা উচিত নয়; বরং উঠে গিয়ে সালাত আদায় করা উচিত।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে তখন এমন ব্যক্তির কাছেই বলবে, যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তিনবার থুথু ফেলে। আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।' (মুসলিম)

এই হাদিসের মাধ্যমে স্বপ্নের রকমফের অনুসারে নির্দিষ্ট আদবকেতা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি আপনি ভালো স্বপ্ন দেখবেন, তখন খুশিতে কেবল মুহাব্বতের লোকেদেরকে জানাবেন। মন্দ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবেন এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন অভিশপ্ত শয়তান, জিন ও স্বপ্নের ক্ষতি থেকে। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, এক্ষেত্রে ঘুমের পার্শ্ব পরিবর্তন করা উচিত। যদি কেউ বাম কাত হয়ে শুয়ে থাকে তাহলে সে ঘুরে গিয়ে ডান কাতে শয়ন করবে অথবা ঘুম থেকে উঠে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, যেমনটি মুসলিমের হাদিসে এসেছে। মন্দ স্বপ্নের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশনা হলো সেগুলো কাউকে জানানো যাবে না। এ সকল পদক্ষেপ অনুসরণের মাধ্যমে স্বপ্নের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

---

[৫] See Qur'an 37: 102

১০.৪ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল নির্বাচিত ব্যক্তিরাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের যোগ্যতা লাভ করেন, যেমন নবি-রাসূলগণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নের কথা শুনতেন এবং সাধারণত তিনি সাহাবিদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন ফজর সালাতের পর।[৬] বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজর সালাত শেষ করার পর পেছনের দিকে ঘুরতেন এবং প্রশ্ন করতেন যে গত রাতে তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি না।

এখানে লক্ষ্য করা জরুরি, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারতেন কারণ আল্লাহ তাকে ফেরেশতা জিবরাইল এর মাধ্যমে সেই জ্ঞান প্রদান করতেন। এটি তাঁর নিজস্ব জ্ঞান বা অনুমান ছিল না, বরং সেই ব্যাখাগুলো ওহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণে তাঁর সকল ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ সঠিক ছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে ইউসুফ (আ.) সুদক্ষ ছিলেন। সূরাহ ইউসুফে এসেছে,

- 'হে পালনকর্তা আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্য সহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। ...' (সূরাহ ইউসুফ, ১২:১০১)

কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় বন্দীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন ইউসুফ (আ.), এবং তিনি রাজার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাও প্রদান করেছিলেন যার ফলে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা সেই ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন:

'বাদশাহ বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী-এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। তারা বলল, এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলে, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। সে তথায় পৌঁছে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখা প্রদান করুন যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। বলল, তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। এবং এরপরে আসবে সাতটি কঠিন বছর; এই সাত বৎসর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা

---

[৬] Philips, A. A. B., 1996, Dream Interpretation According to the Qur'an and Sunnah, Sharjah, UAE: Dar Al Fatah, p. 38.

ব্যতীত। এরপরেই আসবে একবছর-এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে।' (সূরাহ ইউসুফ, ১২:৪৩-৪৯)

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. বিলাল ফিলিপস পাঁচটি মূলনীতি চিহ্নিত করেছেন:[৭]

১। নবি রাসুল ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন।

২। কেবলমাত্র ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৩। ভালো স্বপ্নের কেবল ইতিবাচক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৪। কেবল নবিদের ব্যাখ্যা শতভাগ সঠিক; অন্যান্য মানুষের ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

৫। ভালো স্বপ্নে যা দেখা গেছে সেগুলোর উপর আমল করা বৈধ।

---

[৭] Ibid., pp. 43-49.

||অধ্যায় এগারো||
মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

জীবনের বিভিন্ন ধাপ, পর্যায় ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কুরআনের বহু স্থানে আলোচনা করা হয়েছে,

- 'আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।' (সূরাহ মুমিনুন, ২৩:১২-১৪)

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশের এই ক্রমধারাকে বিজ্ঞানও নিশ্চিত করেছে।

- 'হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।' (সূরাহ হাজ্জ, ২২:৫)

কুরআনের কিছু স্থানে উদ্ভিদের উপমা প্রদানের মাধ্যমে মানব জীবনের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায়ের বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একই সাথে এই উদাহরণটি মৃত্যু ও পুনরুত্থানকেও বুঝায়।

- 'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন।' (সূরাহ নুহ, ৭১:১৭)

আমাদের ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে। নানান ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসে, যেমন- আধ্যাত্মিক, মানসিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক এবং দৈহিকভাবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশের উপর প্রধান

মনোযোগ প্রদান করা হয়। অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় আল্লাহর সাথে বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচর্যা ও উত্তম আখলাক অর্জনের প্রতি। ক্রমবিকাশের অন্যান্য অনুষঙ্গগুলো যেন অবশ্যই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অবদান রাখে, কেননা এসব উপাদানগুলো একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য, যার একটি আরেকটিকে শক্তি যোগায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন, মানবজীবনের ক্রমবিকাশের শুরু হয় মাতৃগর্ভ থেকে। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত একের পর এক বিভিন্ন পর্যায় অতিবাহিত হয়। এগুলো সবই আল্লাহর পূর্বপরিকল্পিত। আর আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেন, তার অবশ্যই উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না। অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরাহ নুহ, ৭১:১৩-১৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'নিশ্চয়ই তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।' (সূরাহ ইনশিক্বাক, ৮৪:১৯)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে জানানো হয়েছে, মানুষ তার জীবনভর একের পর এক এসব ধাপ অতিক্রম করতে থাকবে। জন্মের পূর্বে মায়ের গর্ভে অবস্থান করা, এরপর ভূমিষ্ঠ হওয়া, শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন এবং বার্ধক্য পর্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্তন চলতে থাকবে। এগুলো সকলের জন্য একই হলেও; প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা, বিকাশ প্রক্রিয়া, চারপাশের প্রভাবক, সময়কাল ও সীমাবদ্ধতার ভিন্নতা ও অসমতা রয়েছে। কিছু মানুষকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে তারা দ্রুত এসব পর্যায় অতিক্রম করতে পারে। আবার কেউ জন্মগতভাবে মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে, ফলে তাদের দৈহিক বিকাশ অব্যাহত থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হয়ে পড়ে স্থবির।

সময়ের সাথে কারো কারো অবস্থা একই রকম থাকলেও, অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই পরিবর্তিত হতে থাকে। এখানে একটি দারুণ ব্যাপার হল, আল্লাহ তাআলা সময়ানুক্রমে জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রদান করতে থাকেন। যেমন ধরুন, শৈশবে ছোট বাচ্চারা খেলাধুলার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী থাকে। যখন তাদের ৩-৪ বছর বয়স হয়, তখন তারা কল্পনা থেকে ছবি আঁকা বা 'কিছু সেজে অভিনয়' জাতীয় খেলায় আগ্রহী হয়। সময়ের সাথে সাথে তাদের সামাজিক দক্ষতাও পরিপক্ক হয়, যা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা করতে সাহায্য করে। বয়সন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে, বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত বিষয় বোঝার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, চিন্তাশক্তি উন্নত হয়। আর ঠিক এসময় থেকেই আল্লাহ তাআলা তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য জবাবদিহিতা আরোপ শুরু করেন।

জীবনে নানান ফ্যাক্টর দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই, যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সঙ্গীসাথী, শিক্ষক, মিডিয়া ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো 'সোশ্যাল সাইকোলজি' অধ্যায়ে

আলোচনা করা হবে। ‘Developmental psychology’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন করা এই বইয়ের পরিসরে সম্ভব নয়, তবুও আমরা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে যাচ্ছি।

১১.১ মা ও শিশুর বন্ধন এবং বুকের দুধপান করানোর গুরুত্ব

আল্লাহ বলেন:

- ‘আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ন দু’বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না।

  আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু’বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন।’ (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৩৩)

- অন্যত্র বলেছেন:

  ‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।’ (সূরাহ লুকমান, ৩১:১৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে যখন নারীদেরকে বুকের দুধপান করানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছিল, তখন এর বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে তাদের কোনো প্রকার ধারণা ছিল না। তারা জানতেন না যে, নারীর দেহ থেকে প্রবাহিত এই সাধারণ তরল পদার্থের কী আশ্চর্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে! কাল পরিক্রমায় বিজ্ঞানীরা মায়ের দুধের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও অসংখ্য গুনাগুণ আবিষ্কার করেছেন, যা মা ও শিশু উভয়ের জন্যই আল্লাহর নিয়ামত।

শুধুমাত্র বুকের দুধের মধ্যেই নয়, বরং দুধ পান করানোর প্রক্রিয়ার মধ্যেও উপকারিতা রয়েছে। এর অসংখ্য দৈহিক উপকারিতার মধ্যে একটি হচ্ছে পর্যাপ্ত পুষ্টি লাভ, যা অন্য কোথাও থেকে পূরণ হবার নয়। সেই সাথে দুধের সাথে মায়ের দেহ থেকে শিশুর দেহে স্থানান্তরিত হয় জীবাণু-প্রতিরোধী এন্টিবডি, যেন নানা রোগব্যাধি ও অসুস্থতা থেকে শিশু সুরক্ষিত থাকে। বুকের দুধপান করার মাধ্যমে শিশুর চোয়াল শক্তিশালী হয়, অ্যালার্জি ও ইনফেকশনের ঝুঁকি হ্রাস পায়, ইত্যাদি বহু স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে।

এমনকি এগুলোর ফলে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শিশুর অন্যান্য বিকাশের ক্ষেত্রেও (যেমন- সামাজিক, বুদ্ধিমত্তাগত ও মানসিক)।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে খাদ্য হিসেবে কেবলমাত্র বুকের দুধ পান করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকে। এরপর দুই বা ততোধিক বছর পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য চালু রাখার কথা বলে।[১]

হতে পারে, বুকের দুধ পান করানোর মানসিক উপকারিতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভধারণ, গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী প্রক্রিয়ায় বুকের দুধপান করানো একটি জরুরি সহজাত উপাদান। যে মা শিশুকে বুকের দুধ পান করান, তিনি তাঁর সহজাত দায়িত্ব পালনের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা অনুভব করেন। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মা ও শিশুর মধ্যে একটি বিশেষ নিবিড় সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে ওঠে, যার কোনো তুলনা নেই। এমন এক বন্ধন, যা ভাঙার সাধ্য কারও নেই।

শিশুর পরবর্তী বিকাশের জন্য এই বন্ধন ও নিবিড় সম্পর্ক না হলেই নয়। বিভিন্ন স্টাডিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে, এক বছর বয়সে শিশু ও মায়ের পারস্পরিক বন্ধন থেকে আঁচ করা যায় যে, পরবর্তীতে শিশুটির সামাজিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ কেমন হবে। যে শিশুরা মায়ের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে, তারা পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে যথাযথ আচরণ করতে পারে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। বিপরীতে যে শিশুরা মায়ের সাথে দুর্বল বন্ধনের অধিকারী হয়, তাদের মধ্যে পরবর্তী বয়সে নানা সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যেমন- আগ্রাসী মনোভাব, অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং বয়সন্ধিকালে অপরাধে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা মা-শিশুর এই সম্পর্কের গুরুত্ব সবচেয়ে ভালো জানেন। ফলে তিনি একটি চমৎকার ব্যবস্থাপনাও প্রদান করেছেন (বুকের দুধ পান করানো), যার মাধ্যমে মজবুত হতে পারে মা ও শিশুর বন্ধন।

১১.২ বার্ধক্য ও বয়স বৃদ্ধি

- 'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?' (সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৬৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আল্লাহ দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (সূরাহ রুম, ৩০:৫৪)

---

[১] World Health Organization, Breastfeeding, retrieved October 5, 2009 from http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/.

বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া (senescence) চলতে থাকে মানুষের পুরোটা জীবনব্যাপি। এর অর্থ হলো, বয়সের সাথে সাথে দৈহিক কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকা। বিকাশ মনোবিজ্ঞানের (Developmental Psychology) একটি বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হলো: বার্ধক্য আসা একটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক ঘটনা, যা কিনা সকল প্রজাতির জেনেটিক নকশায় গাঁথা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিকে স্বাভাবিক মনে হলেও, কেন এবং কিভাবে বার্ধক্য ঘটে— সেটার ব্যাখ্যা খোঁজার অন্য প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছে। যে তত্ত্বের পক্ষে দলিল-প্রমাণ এসেছে 'প্রতিটি প্রজাতির সর্বোচ্চ আয়ুষ্কাল জিনগতভাবে (জেনেটিক্যালি) নির্ধারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে' এই ধারণা থেকে। যদিও মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বেড়েছে, কিন্তু সর্বোচ্চ আয়ুষ্কাল রয়েছে স্থিতিশীল (প্রায় ১২০ বছর)। এ কথাও গবেষণায় এসেছে যে, শৈশবে আমাদের কিছু জিন মস্তিষ্কের হরমোনের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের কোষ বিভাজন ও মেরামত প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়ে এসে, যে জিনগুলো দৈহিক বৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল, সেগুলো 'সুইচ অফ' বা বন্ধ হয়ে যায়। আর যে জিনগুলো বার্ধক্যের সূত্রপাত করে, সেগুলো 'অন' হয়। এর ফলে দেহের কার্যক্রমে একটি শুরু হয় ধারাবাহিক ধীর পতন, যা চলতে থাকে মৃত্যু অব্দি। শুধুমাত্র দৈহিকভাবে নয় বরং কগনিটিভ (বুদ্ধিবৃত্তিক), ইমোশনাল (আবেগিক) ও মানসিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। কুরআনে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরকে আলোকপাত করে বার্ধক্যের যথার্থ বর্ণনা এসেছে।

১১.৩ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা

মৃত্যু হলো জীবনের উল্টোপিঠ। মৃত্যু ঘটে, যখন দেহ ও রূহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেক জগতে পদার্পণ করে।[২] প্রত্যেক প্রাণীকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কুরআনে এসেছে:

- 'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। ... '(সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৮৫)

- অন্যত্র এসেছে:

  'আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরাহ আম্বিয়া, ২১:৩৪-৩৫)

প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় তাকদিরে সুনির্ধারিত। সেটিকে এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই দুনিয়াতে মানুষের আয়ুষ্কাল লিখিত হয়ে যায় তাকদির অনুসারে। যদি কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি, তাহলে সে মরবে না, বেঁচে যাবে। একইভাবে কেউ যদি সব ধরনের আধুনিক

[২] al-Ashqar, 2002a, p. 28.

মেডিকেল যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে আয়ু বৃদ্ধির যাবতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, তবুও সে তার আয়ুষ্কাল এক সেকেন্ডও বাড়াতে পারবে না।

- 'আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। ...' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৪৫)
- 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।...' (সূরাহ নিসা, ৪:৭৮)

- আরেক জায়গায় এসেছে:

'আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই।' (সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬:৬০)

মৃত্যুর সঠিক সময়, স্থান ও ধরণ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অবগত। এটি গায়েবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিষয়টি মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখার একটি হিকমত হলো, যেন মানুষ সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে উৎসাহিত হয়। কেননা, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু চলে আসতে পারে।

- 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরাহ লুকমান, ৩১:৩৪)

১১.৪ মৃত্যুযন্ত্রণা ও বিহ্বলতা

মৃত্যুবরণের প্রক্রিয়াটি কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক,আল্লাহ বলেন,

- 'মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে।' (সূরাহ ক্বাফ, ৫০:১৯)

এই আয়াতে ব্যবহৃত (সাকারাতুল মাউত) শব্দটিকে 'মৃত্যুযন্ত্রণা' অনুবাদ করা হয়েছে। এটি একটি নেশাগ্রস্থ, ঘোরাচ্ছন্ন অবস্থা। মৃত্যুকালে একজন ব্যক্তি যন্ত্রণাদায়ক সেই অবস্থা অনুভব করবে। এটি মাতাল বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অনুরূপ, কেননা মুমূর্ষু ব্যক্তি থেকে সেরকম লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যেমন ধরুন, কথা জড়িয়ে যাওয়া, মনোযোগ হারিয়ে ফেলা, স্মৃতিভ্রম, হতবুদ্ধিতা ও প্রলাপ বকা। সামগ্রিকভাবে এই অভিজ্ঞতা কষ্টকর ও মর্মান্তিক।

মুমিনদের চেয়ে কাফির ও গুনাহগারদের মৃত্যুকালে অধিক দুর্ভোগ পোহাতে হবে। তারা ব্যাপক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাবে, যখন তারা বুঝতে পারবে তাদের সামনে কী ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ বলেন:

- 'ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলেঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাজিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাজিল করেছেন।

যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:৯৩)

এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুযন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এ বিষয়ে হাদিসে বর্ণনা এসেছে। আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছি তখন তিনি মৃত্যুর নিকটবর্তী। তাঁর সামনে একটি পেয়ালা ছিল, তাতে পানি ভরা ছিল। তিনি পেয়ালার মধ্যে হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন তারপর (হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে চেহারা মুবারক মুছলেন তারপর বললেন,

لا إِلَهَ إِلا الله، إِنَّ للمَوْتِ لسَكَرات

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! ইন্না লিল মাওতি সাকারাত!

নিশ্চয়ই মৃত্যুর সাথে রয়েছে (সাকারাত) যন্ত্রণা।'

এরপর তিনি দুই হাত উপরে উত্তোলন করে বারবার বলতে থাকেন,

فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى

সর্বোচ্চ সাথীর সান্নিধ্য! সর্বোচ্চ সাথীর সান্নিধ্য!

এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হলো আর হাত শিথিল হয়ে গেল। (বুখারি)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সেই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিতে সুযোগ দিয়েছিলেন, চাইলে তিনি এই দুনিয়াতে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন অথবা তিনি জান্নাতে নেক ব্যক্তিদের সাহচর্যে চলে যাবেন (নবি, সিদ্দিক, শহীদ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ)। তখন তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল, 'সর্বোচ্চ সাথী (আল্লাহর)র সান্নিধ্য!' এভাবে তিনি দুনিয়ার উপরে আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন।

১১.৫ মৃত্যুর পূর্বে তাওবা

রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত মুমূর্ষু ব্যক্তির তাওবা কবুলের দরজা খোলা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন (তিরমিযি, আহমাদ, সনদ নির্ভরযোগ্য)।

এখানে হাদিসের অনুবাদ করা হয়েছে 'কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত', এর আক্ষরিক অনুবাদ হলো, 'যতক্ষণ না সে গরগর আওয়াজ করতে শুরু করে' ততক্ষণ পর্যন্ত। যখন রূহ দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্ত উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায় মৃতব্যক্তি গরগর আওয়াজ করতে থাকে। এখানে সেটি বোঝানো হয়েছে।[৩]

---

[৩] al-Kanadi, 1996, p. 20 (footnote).

যখন রূহ দেহ ছেড়ে চলে যেতে থাকে সে অবস্থায় তওবা করলে কিংবা ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করলেও সেটা কবুল হয় না। আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (সূরাহ নিসা, ৪:১৮)

১১.৬ মৃত্যুকালে মুমিনের আনন্দ ও কাফিরের দুঃখ

মুমিন বান্দার মৃত্যুকালে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতারা উপস্থিত হন, তখন মুমিন ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠে। বিপরীতে যখন গুনাহগার ও কাফিরদেরকে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যতের খবর দেওয়া হয়, তখন তারা মর্মযাতনায় দিশেহারা হয়ে পড়ে ও আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে অপছন্দ করতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা ভালোবাসে, আল্লাহ্ ও তার সাক্ষাত লাভ করা ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে না, আল্লাহ্ ও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেন না। তখন আইশা (রা.) অথবা তাঁর অন্য কোনো সহধর্মিনী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পছন্দ করি না। তিনি বললেন, বিষয়টা এমন নয়। আসলে ব্যাপারটা হলো, যখন মুমিন বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভ ও সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শুনানো হয়। তখন তার কাছে সামনের সুসংবাদের চাইতে বেশি পছন্দনীয় কিছু থাকে না। সুতরাং তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পছন্দ করে, আর আল্লাহ্ ও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালোবাসেন। আর কাফিরের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র আজাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার কাছে সামনের আজাবের সংবাদের চাইতে অধিক অপছন্দনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং সে (এ সময়) আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা অপছন্দ করে, আর আল্লাহ্ ও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।' (বুখারি)

||অধ্যায় বারো||
সামাজিক মনোবিজ্ঞান

আমরা কীভাবে চিন্তা করি, একে অপরকে প্রভাবিত করি এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্ক তৈরি করি ইত্যাদি বিষয়কে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়নের নামই সোশ্যাল সাইকোলজি বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান।[১] জ্ঞানের এই শাখায় মূলত আলোকপাত করা হয় (মানুষের) বিভিন্ন আরোপিত বিশেষণ (Attribution), সাদৃশ্য ও আনুগত্য, গোষ্ঠীগত প্রভাব, ঐতিহ্য ও সংস্কার, আগ্রাসন ও পরোপকারিতা— এসব ধারণার উপর।[২] অন্যান্যদের আচরণকে আমরা যে ব্যাখা করি, তাকে বলে এট্রিবিউশন (Attribution) বা আরোপিত বিশেষণ। আমরা সবাই জানি, মানুষ সামাজিক প্রাণী। ফলে মানুষ নানাভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

১২.১ সামাজিক সমর্থনের ভূমিকা

সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় সামাজিক সম্পর্কের ইতিবাচক প্রভাবের সাথে দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে।[৩] গবেষণায় দেখা গেছে, যখন মানুষ সামাজিকভাবে সহায়ক পরিবেশে বসবাস করে, তখন দৈহিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ কার্যক্ষম থাকে।[৪] যারা প্রচুর সামাজিক সহায়তা পেয়ে থাকেন তাদেরকে সাধারণতঃ বিষণ্ণতা, উদ্বিগ্নতা, সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদিতে ভুগতে দেখা যায় না। তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে থাকে। সামাজিক অবলম্বনহীন বা খুব অল্প সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় তারা দীর্ঘায়ু হন।[৫]

---

[১] Myers, 2007, p. 723.

[২] Ibid.

[৩] Rhodes, G. L., & Lakey, B., 1999, Social support and psychological disorder: Insights from social sychology, in R. M. Kowalski & M. R. Leary (Eds.), The Social Psychology of Emotional and Behavioral Problems: Interfaces of Social and Clinical Psychology, Washington, DC: American Psychological Association, pp. 281-309; Uchino, B.N., 2006, Social support and health: A review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes, Journal of Behavioral Medicine, 29(4), pp. 377-378.

[৪] Hale, C. J., Hannum, J. W., and Espelage, D. L., 2005, Social support and physical health: The importance of belonging, Journal of American College Health 53, p. 276; Rhodes, G. L. & Lakey, B., 1999, pp. 281-309.

[৫] Uchino, 2006, pp. 377-378.

প্রকৃত অর্থে এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করে গেছেন চৌদ্দশ' বছর আগেই। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রিজিক ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।' (মুসলিম)। সামাজিক সমর্থনের পরিধি অনেক বিস্তৃত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ও কাছের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেই বেশি সমর্থন পাওয়া যায়, ঠিক যেমনটি হাদিসে এসেছে। সুসম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ তাদের প্রতি দয়া, নম্রতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।

আলিমরা এই সুনির্দিষ্ট হাদিসকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, 'আয়ু বৃদ্ধি পাবে' এর অর্থ হলো জীবনে বরকত লাভ হবে অর্থাৎ অল্প সময়ে অধিক কাজ করতে পারবে, যেমনটা সে দীর্ঘ হায়াত লাভ করলে করতে পারত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, আক্ষরিক অর্থেই আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না রেখে আপনি যতদিন আয়ু পেতেন; তার চেয়ে বেশিদিন আয়ু পাবেন, যদি আত্মীয়তা বজায় রাখেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আরো কিছু বছর যুক্ত করে দিবেন আপনার তাকদিরে।[৬]

সামাজিক সমর্থনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন- মানসিক সমর্থন (ঘনিষ্ঠতা, একাত্মবোধ, স্বস্তি), কারিগরি সহায়তা (বস্তুগত সমর্থন প্রদান), তথ্যগত সমর্থন ও দৈহিক সহমর্মিতা।[৭] এসব সামাজিক সহায়তা জীবনের বিভিন্ন ধকল ও চাপ সামলে নিতে সাহায্য করে। এছাড়াও বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিকল্প উপায় বাতলে দিয়ে জীবনে চলার পথে শক্তি যোগায়।

আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে গবেষণায়— নিজে সমর্থন গ্রহণের তুলনায় অন্যকে সামাজিক সহায়তা প্রদান বেশি উপকারী। অন্যকে সাহায্য করা, স্বেচ্ছাশ্রম দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে দুঃখকষ্টের অনুভূতি লাঘব হয় এবং ব্যক্তির মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।[৮] অন্যকে 'দেওয়ার' মধ্য দিয়ে জীবনের একটি অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার অনুভূতি লাভ হয়, যা দেয় প্রগাঢ় প্রশান্তি, কমিয়ে দেয় বিষণ্ণতা।[৯] বেশ মজার তথ্য মিলেছে একটি স্টাডিতে, যা করা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে বিবাহিত জীবনযাপন

---

[৬] Qadhi, 2002, p. 89.

[৭] Hale et al., 2005, pp. 276-277.

[৮] Schwartz, C, & Sendor, M., 2000, Helping others helps oneself: Response shift effects in peer support, in K. Schmaling (Ed.), Adaptation to Changing
Health: Response Shift in Quality -of -Life Research, Washington, DC: American Psychological Association, pp. 43-70; Wilson, J., & Musick, M., 1999, The effects of volunteering on the volunteer, Law and Contemporary Problems, 62, pp. 150-162.

[৯] Batson, C. D., 1998, Altruism and prosocial behavior, in D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology, New York: McGraw-Hill, Vol. 2, pp. 282-316; Brown, S. L., Nesse, R. M., Vinokur, A. D., & Smith, D. M., 2003, Providing social support may be more beneficial than receiving it: Results from a prospective study of mortality, Amercian Psychological Society, 14(4), p. 320; Taylor, J., & Turner, J., 2001, A longitudinal study of the role and significance of mattering to others for depressive symptoms, Journal of Health and Social Behavior, 42, p. 310.

করছেন এমন বয়স্ক বিবাহিতদের মধ্যে। 'সাহায্য প্রদান' বনাম 'সাহায্য গ্রহণ' এই সূচকের মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিদের স্যাম্পল থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত পর্যবেক্ষণ করে আয়ুষ্কাল অনুমানের চেষ্টা করা হয়। ফলাফলে এসেছে, যারা বন্ধু-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং যারা নিজেদের জীবনসঙ্গীকে মানসিক সাপোর্ট দিয়েছেন, তাদের মৃত্যুহার বেশ কম। আর সে তুলনায় 'সাপোর্ট নেয়া'র কোনো প্রভাব মৃত্যুহার হ্রাসের উপর পাওয়া যায়নি।[১০]

সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনের যেসব গুরুত্ব গত ১০০ বছরে মনোবিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করেছেন, সেগুলো চৌদ্দশ বছর আগে জানাই ছিল মুসলিমদের প্রথম প্রজন্মের কাছে। ব্যাপক ও বিস্তৃত জীবনব্যবস্থা ইসলাম বিস্তারিতভাবে নির্দেশনা দিয়েছে মুসলিম সমাজের চিন্তা-চেতনা, প্রভাব ও পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে, যে সমাজ আবর্তিত হয় আল্লাহর ভয় ও আখিরাত-সচেতনতাকে কেন্দ্র করে। মূলত এটাই এই সমাজের প্রধান উপাদান, যার ভিত্তিতে অমুসলিমদের সমাজ থেকে মুসলিমদের সমাজ আলাদা করা যায়।

১২.২ পরিবার ও প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)

পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কারণ, পরিবারগুলোর উপর পুরো সামাজিক কাঠামোটি দাঁড়িয়ে থাকে। সুস্থ কর্মক্ষম পরিবার ব্যতীত সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যেমনটা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি কিছু দেশে। এ কারণে ইসলামি শরিয়তে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পরিবারের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবারের বিভিন্ন উপকারী প্রভাব রয়েছে সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর।

১২.৩ বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব

একটি পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় অন্যান্য উপাদানগুলো। যদি এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কার্যকর থাকে, তবে আশা করা যায় বাকি সিস্টেমও ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। বিপরীতে বৈবাহিক সম্পর্কে অসামঞ্জস্য বা বিবাদ থাকলে, পুরো সিস্টেমে বিশৃংখলা দেখা দেবে। একটি মজবুত বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয় একটি সুস্থ কর্মক্ষম পরিবার। আর, একটি কার্যকর পরিবার থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় মজবুত সামাজিক ভিত্তি।

বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাদের সক্ষমতা আছে সে যেন বিবাহ করে...' (বুখারি)। তিনি আরো বলেছেন, 'যে বিবাহ করল সে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করল। কাজেই সে যেন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে।' (আত-তায়লাসি, সনদ নির্ভরযোগ্য)। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দ্বীনি যোগ্যতার বিকাশে ও আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যে সহযোগী হয়।

---

[10] Brown et al., 2003, pp. 320-327.

বিয়ের মাধ্যমে যখন আমরা আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন আমরা লাভ করি সামনের আয়াতে বর্ণিত সাকিনা (প্রশান্তি), আল্লাহ বলেছে:

- আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরাহ রুম, ৩০:২১)

একটি ইসলামি বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে ভালোবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা, নিঃস্বার্থ প্রেম এবং বৈবাহিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করে চলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সেই সর্বোত্তম মুসলিম যার আখলাক সর্বোত্তম আর তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে নিজ স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণকারী।' (তিরমিযি, সনদ নির্ভরযোগ্য)।

পরিবারে সংঘাত ও বিচ্ছেদ এড়াতে অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্কে সহযোগিতা, ছাড় দিয়ে চলা, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা, ক্ষমার গুণ ইত্যাদি থাকতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

- '...নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (সূরাহ নিসা,৪:১৯)

সমাজবিজ্ঞানের গবেষকগণ বিয়ের অনেক সামাজিক, পারিবারিক এবং দাম্পত্য উপকারিতা ও সুবিধা নির্ণয় করেছেন। বার বার ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় একই ফলাফল এসেছে যে, অবিবাহিতদের তুলনায় বৈবাহিক দম্পতিরা আবেগিক ও মানসিকভাবে বেশি ভালো থাকেন।[১১] বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপে উঠে এসেছে, বিবাহিত দম্পতি 'অবিবাহিত দম্পতি'র তুলনায় সুখী জীবন যাপন করেন।[১২] নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমানতালে রিপোর্ট করেছেন যে 'বিবাহবহির্ভূত দম্পতি'(cohabitation) এর তুলনায় বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানোর পর তারা ২.৪ গুণ সুখী জীবনযাপন করছেন।[১৩] সিঙ্গেল, তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা, বিপত্নীক কিংবা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো যুগলদের তুলনায় বিবাহিত নারীপুরুষরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম মাত্রায় ডিপ্রেশনে আক্রান্ত বলেও জানা গেছে।[১৪]

---

[১১] Kim, H. K., & McKenry, P. C, 2002, The relationship between marriage and psychological well-being: A longitudinal analysis, Journal of Family Issues, 23, pp. 885-911; Lees, D., 2007, Research Note: The Psychological Benefits of Marriage, retrieved October 15, 2009 from http://www.maxim.org.nz/files/pdf/psychologicalbenefitsofmarriage.pdf, pp. 1-4.

[১২] Stack, S., & Eshleman, J. R., 1998, Marital status and happiness: A 17- nation study, Journal of Marriage and Family, 60(2), pp. 527-536.

[১৩] Ibid.

[১৪] Brown, S. L., 2000, The effect of union type on psychological well-being: Depression among cohabitors versus marrieds, Journal of Health and Social Behavior, 41, pp. 241-

কেন অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতরা অধিকতর সুখী ও মানসিকভাবে সুন্দর জীবনযাপন করেন এবং জীবনে বেশি পরিতৃপ্ত থাকেন- এই বিষয়ের নানান ব্যাখ্যা রয়েছে। সাধারনত বিবাহিত মানুষরা অবিবাহিতদের তুলনায় ভালো দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হন আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোকেদের অধিকতর সুখী হবার সম্ভাবনা বেশি।[১৫] বৈবাহিক সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি উচ্চমাত্রার দায়িত্ববোধ থাকে, ফলে অধিকতর নিরাপত্তা অনুভূত হয় ও জীবনে 'স্ট্রেস' কমে আসে, বয়ে আনে উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য।[১৬] অবিবাহিত পুরুষের তুলনায় বিবাহিত পুরুষদের আয় রোজগার বেশি এবং তারা অধিক কর্মোদ্যমী, তাদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও বেশি।[১৭] বিবাহিত নারীরা সিঙ্গেল নারীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অধিক অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী হন।[১৮] বেশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে বিবাহিত জীবনে কমে আসে 'স্ট্রেস', ভালো থাকা যায় বেশি, সেই সাথে মানোন্নয়ন ঘটতে থাকে সম্পর্কটিরও।[১৯]

দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বৈবাহিক সম্পর্কের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, মূলত স্বাস্থ্যকর জীবনাচরণের মাধ্যমে। অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে ধূমপান, মদ্যপান, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের মতো স্বাস্থ্যহানিকর অভ্যাস কম দেখা যায়। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমত, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আচরণের দিকে খেয়াল রাখেন এবং আত্মসংযমে পরস্পরকে উৎসাহিত করেন। বিশেষত এটি পুরুষদের জন্য বেশি দরকার। দ্বিতীয়ত, তারা জীবনসাথীর কাছ থেকে সামাজিক সমর্থন লাভ করেন। যার কারণে বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে সফল ভাবে মানিয়ে নেয়া সহজ হয়। তৃতীয়ত, বিবাহিত ব্যক্তি সহজেই জীবনের অর্থ খুঁজে পান এবং পরিবারের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ অনুভব করেন। এটাই তার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতাকে দমিয়ে দেয় এবং স্বাস্থ্য-সচেতন হতে উৎসাহিত করে।[২০]

255; Earle, J. R., Smith, M. H., Harris, C. T., & Longino, C. F., 1998, Women, marital status and symptoms of depression in a midlife sample, Journal of Women and Aging, 10, p. 10; Lamb, K. E., Lee, G.
R., & Demaris, A., 2003, Union formation and depression: Selection and relationship effects, Journal of Marriage and Family, 65, pp. 953-962; Simon,
R. W., 2002, Revisiting the relationships among gender, marital status, and mental health, American Journal of Sociology, 107, pp. 1065-1096.

[১৫] Lees, 2007, p. 1.

[১৬] Marcussen, K., 2004, Explaining differences in mental health between married and cohabiting individuals, paper presented at the American
Sociological Association Meeting, San Francisco, CA.

[১৭] Korenman, S., & Neumark, D., 2001, Does marriage really make men more productive?, The Journal of Human Resources, 26, pp. 282-307.

[১৮] Hahn, B.A., 1993, Marital status and women's health: The effect of economic marital acquisition, Journal of Marriage and Family, 55, pp. 495-504.

[১৯] Ibid.

[২০] Waite, L. J., 1995, Does marriage matter?, Demography, 32(4), pp. 486-488.

উন্নত দৈহিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আরও দেখা যায়, বিবাহিত নারী-পুরুষের মৃত্যুর হার অবিবাহিতদের তুলনায় কম।[২১] এটিই স্বাভাবিক, কেননা বিবাহিত মানুষে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও বাজে অভ্যাস কম থাকে। ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি, বিয়ে করলে দুনিয়াবী বস্তুগত সম্পদও বৃদ্ধি পায়। ফলে দীর্ঘায়ুর জন্য দরকারী উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, সুষম খাদ্য, ভালো পরিবেশ নিশ্চিত হয়। বিয়ে ব্যক্তিকে একটি সামাজিক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করে দেয় এবং এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের জন্য।[২২]

শিশুদের উপরেও পিতামাতার বৈবাহিক সম্পর্কের প্রভাব রয়েছে, যা না বললেই নয়। গবেষকরা দেখেছেন, যেসব শিশু বৈবাহিক সম্পর্কজাত এবং পিতা-মাতা উভয়ের সাহচর্যে বেড়ে উঠে, তারা তুলনামূলকভাবে কম আবেগিক-আচরণগত (emotional-beahavioural) সমস্যার সম্মুখীন হয়।[২৩] অন্যদের তুলনায় স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কম; মাদকদ্রব্য সেবনের, অবৈধ দৈহিক সম্পর্কে জড়ানো ও নির্যাতিত হবার হার কম।[২৪] বিবাহিত ও পিতামাতা উভয়ে বিদ্যমান, এমন পরিবারের শিশুরা পড়ালেখায় অন্যদের তুলনায় ভালো ফলাফল অর্জন করে।[২৫]

'সিঙ্গেল প্যারেন্ট' (সাধারণত সিঙ্গেল মাদার) পরিবারের শিশুদের ফলাফল খারাপ হবার ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক ভূমিকা রাখে দারিদ্র। বাকি অর্ধেকের প্রভাবক হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক দুজন ব্যক্তির (পিতামাতা) সময় ও মনোযোগ কম পাওয়া। দুইজন 'প্যারেন্ট'কে পেলে শিশু বেশি অভিভাবকের তত্ত্বাবধান পায়, অধিক সামাজিক সমর্থন পায় ও হোমওয়ার্কে দুইজন 'বড় মানুষের' সহযোগিতা লাভ করে। 'সিঙ্গেল প্যারেন্ট' ফ্যামিলিতে পিতা অথবা মাতার মধ্যে যেকোনো একজনের সাথে শিশু সময় কাটায়;

---

[২১] Hu, Y., & Goldman, N., 1990, Mortality differentials by marital status: An international comparison, Demography, 27(2), pp. 233-250; Waite, 1995, pp. 488-489.

[২২] Waite, 1995, pp. 488-489.

[২৩] Brown, S. L., 2004, Family structure and child well-being: The significance of parental cohabitation, Journal of Marriage and Family, 66, pp. 351-367;
Hou, F., and Ram, B., 2003, Changes in family structure and child outcomes: Roles of economic and familial resources, Policy Studies Journal, 31, pp. 309-330.

[২৪] Flewelling, R. L, and Bauman, K. E., 1990, Family structure as a predictor of initial substance use and sexual intercourse in early adolescence, Journal of Marriage and the Family, 52, pp. 171-181; Waite, 1995, pp. 493-495.

[২৫] Haurin, R. J., 1992, Patterns of childhood residence and the relationship to young adult outcomes, Journal of Marriage and the Family, 54, pp. 846-860; Hou et al., 2003, pp. 309-330; Jeynes, W. H., 2000, The effects of several of the most common family structures on the academic achievement of eighth graders, Marriage and Family Review, 30(1/2), pp. 73-97.

ফলে কম মনোযোগ পায় এবং সাধারণত দেখা যায় এসব শিশুদের সাথে পিতামাতার সম্পর্কও মজবুত হয়না।[২৬]

১২.৪ ইসলামে মাতৃত্ব

ইসলামে মাতৃত্বকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে, এতেই বোঝা যায় এর গুরুত্ব। একটি সুপরিচিত হাদিস থেকে জানা যায়: একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদাচরণ ও উত্তম সঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। সে বলল, অতপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।' (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামে মায়েরা অত্যন্ত দামী ও মূল্যবান, কেননা পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি ও অনুপ্রাণিত করার কাজে তারাই দায়িত্বশীল। একজন মায়ের অধিকাংশ সময় চলে যায় মাতৃত্বের ভূমিকা পালনে; যেমন: শিশুর পরিচর্যা, শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদানে। এসব কারণে তারা যে সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য, তা অবশ্যই তাদেরকে দেয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা তার প্রজ্ঞা অনুসারে, নারীদের জন্যেই সুনির্দিষ্টভাবে মাতৃত্বের ভূমিকাকে সৃষ্টি করেছেন। এই দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে যেসকল অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, তিনি সেগুলোও নারীদেরকেই দিয়ে রেখেছেন, যেমন- সহমর্মিতা, নম্রতা, ধৈর্যশীলতা এবং দয়ামায়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন আল্লাহ তাআলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি রহমত আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমপরিমাণ। এই একশত রহমত হতে একভাগ রহমত পৃথিবীর জন্য নির্ধারণ করেছেন। এই (এক ভাগের) কারণেই মা সন্তানের প্রতি দয়া করে এবং বন্য পশু ও পাখিরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে।' (মুসলিম)

মাতৃত্ব একটি 'ফুলটাইম ক্যারিয়ার'। এখানে রয়েছে গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান, বুকের দুধ পান করানো এবং অনেক বছর ধরে ক্রমাগত শিশুর যত্ন নেওয়া ও তাকে বড় করে তোলার কাজ। এটিই একজন ব্যক্তির দায়িত্ব হিসেবে যথেষ্ট। এজন্যই একজন মায়ের ঘাড়ে পরিবারের আর্থিক ভরণপোষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি। আল্লাহর রহমত যে তিনি নারীদের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করাকে জরুরি করে দেননি। সন্তানের রিজিক উপার্জন করা মায়ের কাজ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বোঝা বহন করা নারীদের জন্য সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়ায়। যে পরিস্থিতে একজন মা নিজের প্রধান দায়িত্বগুলোয় তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগের সুযোগ পান, সেটাই কাম্য।

---

[২৬] Waite, 1995, pp. 493-495.

১২.৫ নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষকে একই ধরনের 'আধ্যাত্মিক প্রকৃতি' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের উভয়কে বিচার দিবসে দুনিয়ার কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের ধর্মীয় দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা একই, কিছু ছোটখাটো পার্থক্য বাদে। যেমন: ঋতুবতী অবস্থায় নারীরা সালাত ও সিয়াম থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। ঈমান ও নেক-আমলের জন্য উভয়েই আখিরাতে পুরস্কৃত হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে লৈঙ্গিক কারণে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় কেবলমাত্র তাকওয়া ও সৎকর্মের মাধ্যমে । শুধুমাত্র আল্লাহ বলেন:

- '... আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। ...'(সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৯৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না।' (সূরাহ নিসা, ৪:১২৪)

এই সার্বজনীন কাঠামোর অধীনে আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের জন্য সমাজে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সমাজ ও পরিবারের সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক। উভয়কে আল্লাহ তাআলা নিজ নিজ দায়িত্ব পূরণ করার জন্য দরকারী ও উপযুক্ত যোগ্যতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

- 'পুরুষেরা নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন তা হিফাযত করে।...'(সূরাহ নিসা, ৪:৩৪)

আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে পরিবারের রক্ষক, যোগানদাতা এবং পরিবারের কর্তা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। নারীদের দায়িত্ব সন্তান প্রতিপালন করা, তাদেরকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলা এবং গৃহস্থালী সকল বিষয়ের যত্ন নেওয়া। নারীদের কাছে এটাই প্রত্যাশিত যে, তারা স্বামীর অনুগত থাকবে (যতক্ষণ না স্বামী তাকে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণের নির্দেশ করছে)। আল্লাহ তাআলা সিস্টেমগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশৃংখল করে সৃষ্টি করেছেন। একটি পরিবারকে কার্যকরভাবে কার্যক্ষম রাখতে নারী-

পুরুষের ভূমিকা বণ্টন খুবই জরুরি। আর একটি পরিবার তখনই সবচেয়ে কার্যকর থাকে যখন সেখানে আল্লাহর বিধি-বিধানগুলো মেনে চলা হয়।

১২.৬ পরিবার কাঠামো পুনঃসংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা

প্রতিনিয়ত পরিবারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা চলছে। পরিবারের কার ভূমিকা কী হবে, চলছে সেটাকেও বদলানোর চেষ্টা । যেমন, কিছু কিছু সমাজে সাম্য বা সমতা প্রতিষ্ঠার নামে (equality) নারীপুরুষের ঐতিহ্যগত পারিবারিক ভূমিকাকে বদলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নারীকে পুরুষের সমান ধরা হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং পুরুষের সাথে সমপর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই সব মতাদর্শে মাতৃত্বের ভূমিকাকে একটি অপমানজনক কাজ মনে করা হয়। অর্থ, ক্ষমতা ও দুনিয়াবী লক্ষ্য পূরণকারী ক্যারিয়ারের চেয়ে মাতৃত্বকে কম মূল্যবান বিবেচনা করা হয়। 'সমতা'(equality) অর্জনের পথে নারীর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে, গর্ভধারণ ও শিশু পালনকে দেখা হয় একটি উপদ্রব বা ঝামেলা হিসেবে।

এই বাস্তবতার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো 'নারীর ক্ষমতায়ন' ('Empowerment of women')। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান একে সমর্থন দিচ্ছে। জাতিসংঘের United Nations Human Development Report এবং Arab Human Development Report-এ 'নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন' এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এমনকি এই 'মানব উন্নয়ন রিপোর্ট'-এ (gender empowerment measure ; GEM) বা 'লৈঙ্গিক ক্ষমতায়ন পরিমাপক' নামক সূচকের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লিঙ্গবৈষম্যের মাত্রাও মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের 'হাই কমিশনার অফ হিউম্যান রাইটস' অফিস থেকে পরিচালিত 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ'- সনদটি এই লৈঙ্গিক ভূমিকা বদলে দেবার সবচেয়ে সুচিন্তিত প্রচেষ্টা। এই কমিটির একটি প্রধান লক্ষ্য নিম্নরূপঃ

'জেনে রাখুন, নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সমতা (equality) অর্জনের জন্য সমাজে ও পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের প্রথাগত ভূমিকার পরিবর্তন প্রয়োজন... এ ব্যাপারে 'স্টেইট পার্টি'* যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন: তারা নারী পুরুষের ঐসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণ, কুসংস্কার, প্রথা ও রীতিনীতি পরিবর্তন করবেন, যেগুলো লৈঙ্গিক শ্রেষ্ঠত্ব বা নিম্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা নারী-পুরুষের প্রথাগত ভূমিকা নির্ধারণ করে।[২৭] (*স্টেইট পার্টি হলো সেসব দেশ যারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন এ চুক্তিবদ্ধ)।

---

[২৭] United Nations, Division for the Advancement of Women, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), retrieved October 14, 2009 from http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm.

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, এই কমিটি খোলাখুলিভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে টার্গেট করেছে, তারা মত প্রকাশ করেছে যে, 'সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে নারীর অধিকারের বিশ্বজনীনতার অবমাননা ঘটতে দেওয়া যায় না।'[২৮] এই কমিটির মত অনুসারে, 'সব দেশে যেসব প্রভাবকের মাধ্যমে জীবনের মূল স্রোতে নারীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হলো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কাঠামো ও ধর্মীয় বিশ্বাস।'[২৯]

ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় জীবন ও পরিবারের উপর অশুভ আক্রমণের নিদর্শন এসব প্রচেষ্টা। এসব অর্গানাইজেশনের প্রধান লক্ষ্য নারী-পুরুষের ঐতিহ্যগত পৃথক ভূমিকা নির্মূল করা এবং 'সাম্য ও সমতার' ধারণায় সাজানো। এটি একটি নারীবাদী (ফেমিনিস্ট) এজেন্ডা, যা বিগত প্রায় ৫০ বছর বা ততোধিক সময় ধরে চলে আসছে। নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, নারীদেরকে মাতৃত্বের বাঁধন ছিঁড়ে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে এবং ঘরের বাইরে এসে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক)। বৈবাহিক কাঠামো, পরিবার গঠন ও সন্তান প্রতিপালনের চিরায়ত ধারণার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক মানসিকতা নিহিত রয়েছে এসব চিন্তাচেতনা ও কার্যক্রমের ভেতরে।

নারীর ক্ষমতায়নের কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে বটে। যেমন- বৈষম্য হ্রাস, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি। তবে এসকল 'লাভের' সাথে অনেক বিপদজনক বিষয়ও জড়িত। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যদিও কিছু মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে বলে মনে হয়, কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতি হলো পরিবার কাঠামো দুর্বল হয়ে যাওয়া, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে পুরো সমাজ।

'নারীর ক্ষমতায়ন' ('Empowerment of women') এর অর্থ কি?

বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলে নারীর ক্ষমতায়নের আসল অর্থ হল—

১। নারীদের একটির জায়গায় একত্রে দুইটি কাজ করতে হচ্ছে। ঘর ও সন্তান দেখাশোনা করা নারীদের মৌলিক কাজ, এর সাথে অতিরিক্ত যুক্ত হচ্ছে ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনের কাজ।

২। নারী কাজ করছে পুরুষ-প্রধান (male dominated) পরিবেশে। দৈনিক পুরুষদের সাথে উঠাবসা করা; অথচ এ ধরনের পুরুষদের (গায়রে মাহরাম; যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনুমতি নেই।

৩। নারীরা ছোট সন্তানদেরকে অন্যত্র রেখে আসতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন, ডে-কেয়ার সেন্টার; এমনকি ছয় সপ্তাহের শিশু পর্যন্ত সেখানে রেখে আসতে দেখা যায়।

[২৮] Ibid.
[২৯] Ibid.

৪। নিজের সন্তানদের সাথে অর্থবহ আলাপ-আলোচনায় সপ্তাহে গড়ে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাভ করছেন একজন নারী।

৫। বিষণ্ণতা; কর্মজীবী নারীদের মধ্যে ডিপ্রেশনের হার পুরুষের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ পর্যন্ত দেখা যায়। এর সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য মানসিক যাতনা; যেমন- উদ্বেগ, স্ট্রেস ইত্যাদি।

৬। নিজের সহজাত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের সাথে সংঘাত অনুভব করেন নারীরা; যেমন পরিচর্যা (nurturance), নমনীয়তা (deference), নির্ভরতা (affiliation) ইত্যাদি নারীসুলভ গুণাবলী। অন্যদিকে ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজন নিজেকে জাহির করার মানসিকতা, স্বায়ত্তশাসন, স্বনির্ভরতা ইত্যাদি।

মাতৃত্বের ভূমিকা অবমূল্যায়নের কারণে সম্পূর্ন সমাজব্যবস্থা ভুক্তভোগী হয়। শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় ভালোবাসা, যত্ন ও মনোযোগ পায়না। ফলে অনাগত জীবনের উত্থানপতন ও পরীক্ষার সামনে তারা ভঙ্গুর হয়ে বেড়ে ওঠে। যেমন- বয়সন্ধিকালীন/শৈশবকালীন বিষণ্ণতা, উদ্বিগ্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, মাদক, অ্যালকোহল সেবন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি দেখা যায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই মাতৃত্ব। একে সামাজিকভাবে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। পরিবার ও সমাজে স্থিতিশীলতা আনেন মায়েরাই। সমাজে অবদান রাখার উপযুক্ত, উত্তম চরিত্রবান হিসেবে সন্তানকে বড় করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন এই মায়েরাই ।

১২.৭ মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম অনুসারে, উম্মাহ একটি সামাজিক ধারণা। এর দ্বারা ঈমানদার মুসলিমদের সমাজকে বোঝায়। এটি একটি বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা, যা ঈমানের কাঠামোর উপর নির্মিত ও ঐক্যবদ্ধ। যা ছাপিয়ে যায় জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিকতা, বর্ণ, গোত্র ও অন্যান্য সকল পার্থক্যকে। পৃথিবীর সকল স্থান, কাল, প্রজন্ম, জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি নির্বিশেষে উম্মাহ একটি পরিবার, একটি জাতি এবং একটি গোষ্ঠী। এটি এমন এক সমাজ; যারা একই মূল্যবোধ-বিশ্বাস-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ধারণ করে; একতাবোধ লালন করে; যারা গঠনমূলক ভাব বিনিময়ের দ্বারা পরস্পরের প্রতি প্রদর্শন করে সত্যিকারের পরোপকারী মানসিকতা ও সহমর্মিতা।

আল-হাশিমির বর্ণনা করেছেন যে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজে নিম্নরুপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে;

১। একমাত্র আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ
২ নিখুঁত শরিয়া
৩। সকল আইন-কানুন আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা
৪। ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব

৮। পরস্পর পরামর্শ করা
৯। ঐক্য ও সমৃদ্ধি
১০। ন্যায়বিচার ও সমতা
১১। ইলম ও আমল

৫। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ
৬। পরিশুদ্ধ চরিত্র ও মানবতা
৭। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ
১২। সহনশীলতা
১৩। স্বাধীনতা
১৪। শক্তি ও জিহাদ
১৫। উন্নতি, অগ্রগতি।[৩০]

১২.৮ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য কোনো বান্দাকে মুহাব্বত করে এবং (৩) আল্লাহ্ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।'(বুখারি ও মুসলিম)

মুসলিমদের দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, তাই প্রত্যেক মুসলিমের পারস্পরিক ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার সাথে সংযুক্ত। তারা একে অপরকে ভালবাসেন ও আচরণ প্রদর্শন করেন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। তাদের ভালোবাসার এই বিশেষ বন্ধন কখনো ছিন্ন হবার নয়; আর সেই বন্ধনের নাম—সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি ঈমান। তাদের হৃদয়-মনকে এই বন্ধন এমনভাবে এক সুতোয় গেঁথে দেয়, যে তারা অপর মুসলিমের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে যেকোনো কিছু কোরবান করতে প্রস্তুত থাকে। দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কিছু করেন না তারা। যদিও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সামাজিক সহায়তার (social support) বিভিন্ন উপকারিতা উঠে এসেছে, কিন্তু এই ব্যতিক্রমী সম্পর্কের উপকারিতা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। অতপর তিনি প্রশ্ন করেন, 'তার প্রতি কি তুমি কোনো অনুগ্রহ করেছিলে? (যার বদলা নেয়ার জন্যে সাক্ষাত করতে চাও)। লোকটি বলল, না, আমি তাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে ভালোবাসি। তখন ফেরেশতা বলেন, 'আমি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত বার্তাবাহক, তিনি আমাকে এই সংবাদ জানাতে পাঠিয়েছেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সেরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসো।' (মুসলিম)

---

[৩০] al-Hashimi, M. A., 2007, The Ideal Muslim Society: as Defined in the Quran and Sunnah, Riyadh: International Islamic Publishing House, pp. 25-26.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (বুখারি, মুসলিম)।

তিনি আরও বলেছেন, 'তুমি মুমিনদের পারস্পারিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রামন্ত হয়, তখন শরীরের সমসস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে। (বুখারি ও মুসলিম)

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে ইসলামের নিঃস্বার্থ দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃত মুসলিমরা অপরাপর মুসলিমকে আল্লাহর রাহে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে। এই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তারা লড়াই করতেও প্রস্তুত। নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ করে এবং কিছুতেই সম্পর্কচ্ছেদ করে না। সহনশীলতা ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করা তাদের গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা পরস্পরের ভুলত্রুটি ঢেকে রাখে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, হিংসা, আক্রোশ থাকেনা। শত্রুতা ও ঝগড়াঝাঁটির মাধ্যমে অন্য মুসলিমকে কষ্ট দেয় না। মুখলিস দ্বীনি ভাইবোনরা পরনিন্দা-পরচর্চা, গীবত হতে নিজেরা বিরত থাকে, অন্যকেও বিরত রাখে। তাদের প্রতি সদয় ও উদার মানসিকতা প্রদর্শন করে, উপদেশ চাইলে আন্তরিক ও গঠনমূলক উপদেশ প্রদান করে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করতে তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকে না। দ্বীনি ভাইবোনদের অনুপস্থিতিতেও তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে ও সম্মান রক্ষা করে চলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই হাদিসের মাধ্যমে মুখলিস (আন্তরিক) দ্বীনি ভাইবোনদের জন্য সংরক্ষিত বিরাট পুরস্কারের কথা জানিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের পার্থিব বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পারলৌকিক বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। কোনো ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষ গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কষ্ট সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট সহজ করে দেবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তায় রত থাকেন।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, ওহে! যারা আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছিল (তারা কোথায়?) আজ আমি তাদেরকে আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর আজ আমার প্রদানকৃত ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া নেই। (মুসলিম)

যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, দুনিয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবেসেছিল, সেদিন তারা আরশের নিচে আশ্রয় লাভ করবে। এই ভালবাসার বিনিময়ে আল্লাহ যে পুরস্কার প্রদান করবেন সেটা আমাদের

কল্পনাতীত এবং আমরা নিজে নিজে এই পুরস্কার অর্জনে সক্ষমও নই। এই বাস্তবতার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসার গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে ভালোবাসা, ঈমান ও দ্বীনের প্রতি বিশ্বস্ততার উপর। দ্বীনি ভাইবোনরা যখন একই আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন করে তখন তাদের হৃদয়-মন এমন এক বাঁধনে বাঁধা পড়ে, যা অন্য কিছু দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়, সহজে ছিন্ন হবারও নয়। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে সহায়তা, সহমর্মিতা ও সমর্থনের উপর। আল্লাহ বলেন,

- 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১০৩)

১২.৯ মিত্রতা ও বৈরিতা (আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ)

ইসলামি সমাজে মিত্রতা ও বৈরিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। এটি নিবিড়ভাবে তাওহিদের সাথে জড়িত। মিত্রতার মধ্যে রয়েছে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহায্য; অর্থাৎ সাহায্য, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। একজন ঈমানদার ব্যক্তি নবি-রাসূলদেরকে ভালোবাসবে, যারা তাদের অনুসারী তারা হবে পরস্পর বন্ধু, সাহায্যকারী, রক্ষক ও সমর্থক; এটি ঈমানের মৌলিক অনুষঙ্গ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

- 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৫৫-৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ঈমানের সবচেয়ে মজবুত আংটা হলো আল্লাহর জন্য মিত্রতা ও আল্লাহর জন্য বৈরিতা, আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্যেই ঘৃণা।' (তাবারানি, উত্তম সনদে বর্ণিত)

মিত্রতার বিপরীত হলো বৈরিতা। যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাকারী,তাদের সাথে শত্রুতা ও দূরত্বের ভিত্তিতে বৈরিতা পোষণ করা, সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং দূরত্ব বজায় রাখা ঈমানদার হিসেবে আমাদের কর্তব্য। দ্বীনের সক্রিয় বিরোধিতাকারীদের থেকে অবশ্যই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সকল ধরনের কাফিররাই এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন ইহুদি-খ্রিস্টান, নাস্তিক-মুরতাদ-মুশরিক ইত্যাদি। এই বিষয়ে নির্দেশনা সংবলিত বহু আয়াত রয়েছে এবং এটি কুরআনের ষষ্ঠ সূরার একটি অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, সেই অংশের শিরোনাম

'ঘৃণা'। সেখানে আলোচিত হয়েছে, সেসব কাফিরদের প্রতি এই বৈরিতা প্রযোজ্য হবে, যারা সক্রিয়ভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করে। অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে যারা ইসলাম ও মুসলিমের কোনো ক্ষতি করে না কিংবা ক্ষতির কাজে শত্রুদের সহায়তা প্রদান করেনা, তারা এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহ্ বলেছেন,

• 'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' (সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮:২২)

• অন্যত্র বলেছেন,

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।' (সূরাহ তাওবা, ৯:২৩-২৪)

• অন্যত্র বলেছেন,

'হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৫৭)

• অন্যত্র বলেছেন,

'হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন

অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৫১-৫২)

ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে অন্যদের প্রতি একজন ঈমানদারের অবস্থান কী হবে তা এ সকল আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহর খাতিরে নিজের বন্ধু ও শত্রু নির্বাচন করা একজন ঈমানদারের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। যেখানেই মুমিনদের পাওয়া যাবে অবশ্যই তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করবে, এমনকি যদি তারা তার উপর জুলুম করে তবুও। কেননা, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে মিত্রতা স্থাপনের ঈমানী বাধ্যবাধকতা বিলোপ হবে না।'[৩১]

১২.১০ তিন ধরনের মানুষ

বাস্তবে মূলত তিন ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়;

(১) সত্যিকার ঈমানদার, (২) ঈমানদার তবে ভালো-মন্দ উভয় ধরণের আমল মিশ্রিত রয়েছে, এবং (৩) কাফির। এই তিন ধরনের মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাসের লেভেল অনুসারে আচরণ করতে হয়। ঈমানদারদের পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও সমর্থন প্রাপ্য। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখেন, ইলম অনুসারে ঈমান-আমল রক্ষা করেন, নিজেদের দায়দায়িত্ব ও আদিষ্ট বিষয়াদি পালন করেন এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করেন। তাদের ভালোবাসা, আনুগত্য, বৈরিতা ও অসন্তুষ্টি সবকিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কাজেই ঈমানদারদেরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ মিত্রতা, সমর্থন এবং সুরক্ষা প্রদান করতে হয়।

যেসব মুসলিমরা ভালো-মন্দ এবং আল্লাহর আনুগত্য-অবাধ্যতা মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছেন, তারা উত্তম আমলের অবস্থা অনুযায়ী ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রাপ্য এবং মন্দ কাজের মাত্রা অনুযায়ী বৈরিতা প্রাপ্য।[৩২] বুখারির একটি হাদিসে এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা এসেছে তিনি মদ পান করতেন ফলে আরেকজন ব্যক্তি তাকে অভিশাপ প্রদান করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অভিশাপ প্রদান করতে নিষেধ করলেন, কেননা সেই মদ্যপায়ী ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতেন।

আর তৃতীয় ক্যাটাগরি হলো কাফিরদের ক্যাটাগরি। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, নবি-রাসূল, বিচার দিবস ও আখিরাতের প্রতি ইচ্ছাকৃত কুফরীর কারণে তারা ঈমানদার মুসলিমদের কাছ থেকে সহমর্মিতা লাভের যোগ্যতা রাখেন না। গাইরুল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে তারা শিরক করে। নবি-রাসূল, জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, মূর্তি ইত্যাদিকে উপাস্য সাব্যস্ত করে। তাদের ভালোবাসা, দুআ, ভয়, আশা, ইবাদাত, প্রশংসা ও ভরসা ইত্যাদি পরিচালিত হয় গাইরুল্লাহর প্রতি।

---

[৩১] al-Qahtani, 1999, p. 79.

[৩২] Ibid., p. 84.

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন,

> 'যে বা যারাই আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করে, তাঁর আনুগত্য প্রত্যাহার করে, কর্তৃত্ব নিয়ে বিতর্ক করে, তাঁর আনীত দ্বীন পরিত্যাগ করে অন্য পথ অনুসরণ করে, সে এই নিশ্ছিদ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিবর্তে সে নিজের নফস ও অজ্ঞতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কলবের খেয়ালখুশি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তার অন্তরে রয়েছে কুফর। সত্য অস্বীকারের মাধ্যমে যে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে মূলতঃ শয়তানের মিত্র।'[৩৩]

মিত্রতা ও বৈরিতার ন্যূনতম পর্যায় হলো অন্তরে এই অনুভূতি উপস্থিত থাকা।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন, 'অন্তরে থাকা ঘৃণা-ভালোবাসা অথবা পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে কোনো কমতি থাকার সুযোগ নেই। সেখানে অবশ্যই পূর্ণতা থাকতে হবে। সেখানে কোনো রকমের কমতি থাকার অর্থ ঈমানের ঘাটতি। (এছাড়া) অন্যান্য আমল ব্যক্তির সামর্থ্য ও পরিস্থিতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। অন্তরের পছন্দ-অপছন্দ সঠিক হলে ব্যক্তির আমল সে অনুসারে পরিচালিত হবে। সক্ষম হলে সে আমল করবে, কিন্তু পরিপূর্ণ পুরস্কার পাবে কিনা সেটা নির্ভর করবে অন্তরে থাকা ইখলাস তথা আন্তরিকতার ওপর।[৩৪]

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ

'সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ' হলো মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কুরআনে আল্লাহ তাআলা যখনই আন্তরিক ঈমানদারদের জীবন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তখন 'সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ' এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৩৫] আল্লাহ বলেছেন,

- 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১০৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

> 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।' (সূরাহ তাওবা, ৯:৭১)

- অন্যত্র বলেছেন,

---

[৩৩] Ibn al-Qayyim, Hidayat al-Hayara, p. 7; as quoted in al-Qahtani, 1999, p. 59.

[৩৪] Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa, pp. 108-201: as quoted in al-Qahtani, 1999, p. 86.

[৩৫] al-Hashimi, 2007, p. 99.

'তারা তওবাকারী, ইবাদাত কারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।' (সূরাহ তাওবা, ৯:১১২)

• অন্যত্র বলেছেন,

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।...' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১১০)

এসব আয়াতে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের কারণে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে এই গুণ অনুপস্থিত। আল্লাহ বলেছেন,

• '...সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। ...' (সূরাহ মায়িদা, ৫:২)

মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ, শাসক কিংবা শাসিত নির্বিশেষে প্রত্যেকের উপর সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ একটি ফরজ দায়িত্ব। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য ও পরিস্থিতি অনুসারে তা পালন করবে। আবু সাইদ আল খুদরি (রা.) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয়, তবে যেন মুখের (কথার) সাহায্যে তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এই শক্তিটুকুও না রাখে, তবে যেন অন্তরের সাহায্যে (পরিকল্পনা করে) তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' (মুসলিম)

মন্দ কাজের বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু মানুষের বিশেষ যোগ্যতা দেখা যায়। পদবী ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে তাদের বিশেষ সামর্থ্য বা ক্ষমতা থাকে, যেমন- আমির ওমারাহ ও উলামায়ে কেরাম। এছাড়া অন্যান্য কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিরাও রয়েছেন।

যখন এটি ফরজে কিফায়া, তখন কিছু মুসলিম বা মুসলিমদের কিছু অংশ মন্দকাজকে প্রতিহত করলে সমাজের বাকি সবার পক্ষ থেকেই আদায় হবে। আর যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ মন্দকে প্রতিহত না করেন তাহলে সকলকেই গুনাহগার ধরা হবে।

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক (ফরজে আইন) হতে পারে, যদি কোনো গুনাহের কথা শুধু সে-ই জানে বা সে একাই সেটা বন্ধ করতে সক্ষম হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সেটা বন্ধ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। আর এতে অবহেলা করলে সে গুনাহগার হবে।

সামনের হাদিসে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের প্রভাব চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা লটারীর

মাধ্যমে (কে কোনো তলায় থাকবে) এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়)। কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিতাম (তবে ভাল হত)। এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে। (বুখারি)

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের বরকতে অবাধ্য বেখেয়ালী মানুষগুলো যেভাবে বেঁচে যায়, তেমনিভাবে আল্লাহর অনুগত, নেক ব্যক্তিরাও বেঁচে যান। এই আমলটি একটি নিরাপদ, নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ, সমৃদ্ধ সমাজের দিকে আমাদের পরিচালিত করে। এ ধরনের সমাজে ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সামাজিক সামর্থের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন। এই দায়িত্বে অবহেলা সমাজকে নিয়ে যায় ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে। শুধুমাত্র বিভ্রান্ত ব্যক্তিরাই এই ক্ষতিতে আক্রান্ত হয় তা-ই না, বরং সাধু-শঠ নির্বিশেষে সবাই আক্রান্ত হন।[৩৬] জীবন হয়ে উঠে কঠিন ও দুর্বিসহ। দুর্নীতি ও অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ে। মানবিক যোগ্যতা ও সম্মানের হানি হতে থাকে।[৩৭]

আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

> 'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।' (সূরাহ আনফাল, ৮:২৫)

ডক্টর আল হাশিমি এই বিষয়টির উপযুক্ত ব্যাখা দিয়েছেন,

> সমাজে ব্যাপক মন্দের বিস্তার, প্রকাশ্য গুনাহ সত্ত্বেও যদি মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়, চুপ থাকে তখন এক পর্যায়ে তারা এতটাই অনুভূতিহীন হয়ে যায় যে সেই মন্দকাজগুলোকে নিজেদের দ্বীনদারিতা, নৈতিকতা বা উত্তম ঐতিহ্যের জন্যে আর ক্ষতিকর মনে করে না। তখন তারা সংশয়গ্রস্থ হয়ে যায় এবং ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ, হালাল-হারাম পৃথক করতে পারে না। এই পর্যায়ে সামাজিক মানদন্ড পুরোপুরি উল্টে যায়। তখন লোকেরা ইখলাস (আন্তরিকতা) সততা ও ধর্মীয় বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ হওয়াকে মনে করে উদাসীনতা, পশ্চাৎপদতা, কঠোরতা। আর প্রতারণা, ধোঁকা, মিথ্যাচারকে মনে করে আধুনিকতা, মানিয়ে চলা, বৈধ ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। ফলে সবকিছু পুরোপুরি উল্টে যায়। তখন ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে হয়![৩৮]

---

[৩৬] Ibid., p. 102.
[৩৭] Ibid., p. 105.
[৩৮] Ibid., p. 107.

||অধ্যায় তেরো||
শয়তান, জিন ও মানুষ

মানুষ ও ফেরেশতা থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তৃতীয় আরেকটি সৃষ্টি হচ্ছে জিন। তাদেরকে আল্লাহ আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের মত নিজেদের জগতে অবস্থান করে। মানুষের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য তাদেরও রয়েছে, যেমন- তারাও চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী। তারাও ভাল-মন্দ পথ নির্বাচন করতে সক্ষম।[১] ফলে কিছু জিন মুসলিম যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর কিছু রয়েছে কাফির জিন। কুরআনে এসেছে,

- 'আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।' (সূরাহ জিন, ৭২:১৪-১৫)

শয়তান নিজেও একজন জিন। তাকে আরবি ভাষায় 'শয়তান' বলা হয়; যার অর্থ 'উদ্ধত বিদ্রোহী'। আরেকটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ 'ইবলিশ', এর অর্থ যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে পথহারা ও দুর্দশাগ্রস্ত।[২] শয়তানকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে। এরপর সে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার দুআ করেছে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেয়া হল।' (সূরাহ আরাফ, ৭:১৩-১৫)

এরপর শয়তান ওয়াদা করেছে যে, সে আদম (আ.) এর বংশধরদের পথভ্রষ্ট করবে, তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করবে। আল্লাহ বলেন,

- 'সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক

---

[১] al-Ashqar, U. S. (1998), The World of the Jinn and Devils (J. Zarabozo, Trans.), Boulder, CO: Al-Basheer Company for Publications and Translations, pp. 5, 9.
[২] Ibid., pp. 13-14.

থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।' (সূরাহ্ আরাফ, ৭:১৬-১৭)

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শয়তান হতে সাবধান করে দিয়েছেন কেননা শয়তান মানুষের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা। আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'হে বনী-আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি-যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, , যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।' (সূরাহ্ আরাফ, ৭:২৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

'শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।' (সূরাহ্ ফাতির, ৩৫:৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

'... যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়।' (সূরাহ্ নিসা, ৪:১১৯-১২০)

প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন জিন-শয়তান নিযুক্ত আছে। সে কখনো ঐ মানুষকে ছেড়ে যায় না। নবি (সা.) এর স্ত্রী আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নিকট থেকে বের হলেন। তিনি বলেন, এতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জাগল। অতঃপর তিনি এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে আইশা! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি ঈর্ষা পোষণ করছ? উত্তরে আমি বললাম, আমার মতো মহিলা আপনার মতো স্বামীর প্রতি কেন ঈর্ষা করবে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার শয়তান কি তোমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ্ তাআলা তার মোকাবিলায় আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এখন তার থেকে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার প্রতি জিন শয়তানের মধ্য থেকে একজন সাথী নিযুক্ত করা নেই।' সাহাবিরা বললেন, 'আপনার ক্ষেত্রেও, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তার মোকাবেলায় আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে আমি তার ক্ষতি হতে নিরাপদ, সে কেবল আমাকে ভালো কাজের আদেশ করে।' (মুসলিম)

কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, জিনেরা মানুষদের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং তারা মানুষকে নানাভাবে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। এ বিষয়ে একটু পরেই আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। জিনদের উপস্থিতি আমাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা, কেননা বিভিন্ন কলাকৌশল করে তারা মানুষকে শিরকের দিকে টেনে নেয়। আর শিরক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ। যে ব্যক্তি শয়তান ও তার সহযোগীদের নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে কোনো না কোনোভাবে শয়তানের ইবাদাত করবে, বিশেষতঃ নিজের খেয়াল খুশি অনুসরণের মাধ্যমে। সুতরাং, এই বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই নিজেদের ঈমান আকিদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

১৩.১ শয়তানের লক্ষ্য

শয়তানের প্রধান লক্ষ্য হলো বেশি থেকে বেশি সংখ্যক মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে ফেলা এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।' (সূরাহ্ ফাতির, ৩৫:৬)

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রহমত অনুসারে আমাদেরকে শয়তান ও তার সঙ্গীসাথীদের ক্ষতি থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যদি আমরা এ বিষয়গুলো না জানতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হতাম।

এছাড়া শয়তানের কিছু গৌণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, যার মাধ্যমে শয়তান তার প্রধান লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। তার প্রধান লক্ষ্য মানুষকে কুফরের পথে পরিচালিত করা এবং আল্লাহ্ বাদে অন্য কোনো সত্তা বা মূর্তির পূজা করানো। আল্লাহ্ বলেন,

- 'তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলা কে ভয় করি।' (সূরাহ্ হাশর, ৫৯:১৬)

কুফরের বিভিন্ন রকমফের রয়েছে, যেমন- নাস্তিকতা, ইসলাম বাদে অন্যান্য ধর্ম, শিরক সত্ত্বেও নিজেকে মুসলিম দাবি করা, সাধু-দরবেশের ইবাদাত করা, কবর তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার প্রতিপালক আজ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তোমাদের সাবধান করছি! তোমাদেরকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তোমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তা হলো এই যে, আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দেব তা পরিপূর্ণরূপে হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। অধিকন্তু সে তাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য নির্দেশ দিল, যে বিষয়ে আমি কোনো সনদ পাঠাইনি।' (মুসলিম)

শয়তান মানুষকে কুফরি করাতে ব্যর্থ হলেও হতাশ হয়না। সে তাদেরকে তখন অন্যান্য গুনাহের পথে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তাদের ভাল কাজে বাধা দেয় এবং অন্য মুসলিম ভাইবোনের বিরুদ্ধে অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। এ বিষয়টি সামনের আয়াত ও হাদিসে আসছে,

- 'সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৬৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? (সূরাহ মায়িদা, ৫:৯১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শয়তান আদম সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে (বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে) বলে, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার ধর্ম ও তোমার বাপ দাদার ধর্ম এবং তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে?' কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলে, 'তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে? মুহাজির তো একটি লম্বা রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায় (নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনে বাধ্য)।' কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলে, 'তুমি কি জিহাদ করবে? এতো নিজেকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করা। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে।' সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহামহিম আল্লাহ্‌র জন্য অবধারিত ... (আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, উত্তম সনদে বর্ণিত)

যদি শয়তান মানুষের ভাল কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, তখন অন্যান্য আমল নষ্ট করার চেষ্টা করে; যেন আমলের পূর্ণ পুরস্কার না পাওয়া যায় বা পুরস্কারের পরিমাণ কমে আসে। যেমন- মুসলিমরা যখন সালাতে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে তখন শয়তান তাদের কাছে এসে ওয়াসওয়াসা প্রদান করে এবং মনোযোগ নষ্ট করে, নানা রকম চিন্তা মনে জাগিয়ে তোলে।

জনৈক সাহাবি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাজের মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং কিরাআতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। (তখন রাসূলুল্লাহ বললেন), 'এই শয়তানের নাম খানযাব, যদি তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারো, আল্লাহর আশ্রয় চাইবে এবং তিনবার বামদিকে থুতু (বা ফুঁক) দেবে।' সাহাবি নির্দেশমত আমল করলেন, এরপর আল্লাহ্‌ তাকে সেই শয়তান থেকে মুক্ত করে দিলেন। (মুসলিম)

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যখন নামাজের আজান দেয়া হয়, শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে, যেন আযানের শব্দ সে শুনতে না পায়। আজান শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন ইকামত দেয়া হয় তখন পলায়ন করে। ইকামত শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসে এবং নামাজীদের মনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। শয়তান বলে, 'এটা স্মরণ কর, এটা স্মরণ কর!' এ কথাগুলো নামাজের পূর্বে তার(নামাজীর) স্মরণেও ছিল না। শেষ পর্যন্ত নামাজী এমন বিভ্রাটে পড়ে যে, বলতেও পারে না, কত রাকাত পড়ল।' (মুসলিম)

শয়তান মানুষকে দৈহিক ও মানসিকভাবেও ক্ষতি করার চেষ্টা করে। মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে। এ বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এমন কোনো আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারিয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা আ.)-এর ব্যতিক্রম। (তারপর আবূ হুরায়রা বলেন, (এর কারণ হলো মারিয়ামের মায়ের এ দুআ, ''হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।")। (মুসলিম)

সারাটা জীবনব্যাপী শয়তান মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এমনকি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার জন্য স্বপ্নের মধ্যে এসে নানা ভীতিকর স্বপ্ন দেখায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'স্বপ্ন তিন ধরনের। (১) একটি হলো সত্য স্বপ্ন, (২) আরেকটি হলো মানুষ মনে মনে যা ভাবে স্বপ্নে তাই দেখে, (৩) আরেকটি স্বপ্ন হলো শয়তানের পক্ষ থেকে দুর্ভাবনায় ফেলার জন্য। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখে তবে সে যেন উঠে কিছু সালাত আদায় করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেছেন, 'ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। এবং তোমাদের কেউ যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে পছন্দ করে, তাহলে তা শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। আর যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে অপছন্দ করে, তা হলে সে যেন তার বামদিকে তিন (বার) থু থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না বলে। কেননা (এভাবে করলে) সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।' (বুখারি ও মুসলিম)

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক বেদুঈন নবি (সা.) -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং তা গড়াতে শুরু করেছে আর আমি তার পিছনে জোরে দৌড় লাগালাম।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সে বেদুঈন আরবকে বললেন, 'তোমার ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় মানুষের কাছে ব্যক্ত করো না।' রাবি বলেন, 'এ ঘটনার পর আমি নবি (সা.)-কে ভাষণ দিতে শুনলাম। তাতে তিনি বললেন,

'তোমাদের কেউ ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বলবে না।' (মুসলিম)

এমন কি শয়তান আমাদের ঘরে বসবাস করে, ঘুমায় এবং যে খাদ্য গ্রহণের সময় আমরা আল্লাহর নাম নেই না সেগুলোতে শরিক হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় এবং আহার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নেয় তখন শয়তান বলে, 'এই ঘরে রাত্রিযাপনের ঠাঁই হবে না, আহারও জুটবে না।' আর যখন সে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, 'বেশ! রাত্রি যাপনের ঠাঁই হয়ে গেল, আর যদি আহার গ্রহণের সময়েও আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে শয়তান বলে, 'বেশ! রাত্রি যাপনের ঠাঁই ও আহার উভয়ই জুটে গেল।' (মুসলিম)

মৃত্যুর সময় শয়তান এসে মুমিনদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। আবু ইয়াসির বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, 'ইয়া আল্লাহ...আমি আপনার কাছে মৃত্যুকালে শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় চাই ...' (বিশুদ্ধ হাদিস, নাসাঈ)।

১৩.২ শয়তানের ওয়াসওয়াসা

শয়তান মানুষকে যতভাবে প্রভাবিত করে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে অন্তরে ওয়াসওয়াসা প্রদানের মাধ্যমে চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতিকে প্রভাবিত করা। এই ওয়াসওয়াসার মাধ্যমেই আদম (আ.) কে দিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করিয়েছিল শয়তান। আল্লাহ বলেছেন,

- 'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বলল, হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?'(সূরাহ ত্বহা, ২০:১২০)

এখানে লক্ষ্য করা জরুরি, ওয়াসওয়াসা নফসের কুমন্ত্রণা থেকেও হতে পারে যদি নফস মন্দ কাজের দিকে ঝুঁকে থাকে। মন্দ মানুষরাও কুমন্ত্রণা দিতে পারে। তবে শয়তান মানুষকে দ্বিধাগ্রস্থ করার চেষ্টা করে বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয়, ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টির মাধ্যমে। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

- 'আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবি প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্তাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহই বিশ্বাস স্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।' (সূরা হজ, ২২:৫২-৫৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনদেরকে এ ধরনের সন্দেহ থেকে সাবধান করে বলেছেন, 'শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে এক সময় প্রশ্ন করে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন এই পর্যন্ত ঠেকবে, তখন তোমরা (এ ধরনের ভ্রান্ত প্রশ্ন করা হতে) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং থেমে যাবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

একবার নবি (সা.)-এর কিছু সাহাবি তাঁর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু সন্দেহ অনুভব করি যা বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা চাইনা যে, এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হোক এবং আমরা তা বর্ণনা করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কি এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় ? তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, এ হলো স্পষ্ট ঈমানের নিদর্শন। (মুসলিম)

শেষোক্ত কথায় নবিজি বুঝিয়েছেন এ ধরনের চিন্তাচেতনা প্রত্যাখ্যান করা ও দমন করা সত্যিকারের ঈমানের নিদর্শন। আরেকটি হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলল, 'আমার মন আমাকে এমন কিছু বলে যা অন্য কারো কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে আমি নিজে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া অধিক পছন্দ করি।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি কুমন্ত্রণা দানকারীর কুমন্ত্রণাকে ফিরিয়ে দেন।' (বিশুদ্ধ হাদিস আবু দাউদ)

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, একজন ঈমানদার যখন দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার চেষ্টা করেন এবং নিজের সালাত ও আল্লাহর স্মরণে ধারাবাহিক থাকেন তখন শয়তান এসে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে তাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং পানি নির্গত না করে বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করতে বলেছেন।

শয়তানের এসব কুমন্ত্রণার জন্য মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেগুলোর উপর আমল করছে বা সেগুলো প্রচার করছে। শয়তান বা নিজের পক্ষ থেকে আসা এ ধরনের চিন্তা দমন করতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহতে নির্দেশিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে এ ধরনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। যদি এগুলো আমরা দমন না করি এবং সেসব কুমন্ত্রণার দিকে ঝুঁকে যাই তখনই কেবল আমরা শাস্তির উপযুক্ত হব।

১৩.৩ জাদু

'সিহর' (জাদু) শব্দের ক্রিয়ারূপ এসেছে 'সাহারা' শব্দ হতে, যার অর্থ জাদুগ্রস্ত, মন্ত্রমুগ্ধ, কবজ, বিমুগ্ধ, সম্মোহিত করা।[৩] সাধারণত জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করা হয় লিখিত বা মুখে উচ্চারিত শব্দ বা তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে। কিংবা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের দ্বারা জাদুগ্রস্ত

---

[৩] Wehr, 1974, p. 400.

ব্যক্তির দেহ, মন ও অন্তরকে প্রভাবিত করা হয় তার সংস্পর্শে না এসেই।[৪] সাধারণত সূক্ষ্ম গুপ্তশক্তি ব্যবহার করা হয়, যেমন- বাণ মারা, জিন-শয়তানের পূজা, ভবিষ্যৎ গণনা করা ইত্যাদি।[৫] 'সিহর' ও এই শব্দের বিশেষ্য 'সাহার' শব্দটির শব্দমূল একই। এর অর্থ রাতের শেষ ভাগ ও দিবসের প্রথম ভাগের মধ্যবর্তী সময়। এই সময়টিতে রাতের অন্ধকারের কিছু আবছায়া থাকে, আবার দিনের আলোর কিছু রেখা থাকে। ফলে এই সময়টি দ্বৈত প্রকৃতির(double nature), জাদুবিদ্যাও ঠিক এমন।[৬] অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতামত হলো, জাদুবিদ্যা বাস্তব কেননা এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে।

অনেক সময় জাদুবিদ্যা চোখে বিভ্রম সৃষ্টি করে এবং মনে হয় যেন কিছু একটা হচ্ছে, অথচ বাস্তবে সেটি হচ্ছে না। মূসা (আ.) এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ফেরাউনের জাদুকরদের প্রসঙ্গে কুরআনে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে,

- 'তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাজাদু প্রদর্শন করল।' (সূরাহ আরাফ, ৭:১১৬)

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তিকে ধোঁকা দেওয়া হয়, বিভ্রম সৃষ্টি করা হয় কিন্তু বাস্তবে কিছুই ঘটে না। জাদুবিদ্যার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তিকে বিভ্রান্ত করা সম্পর্কে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে,

- 'তারা বলল, হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মূসা বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:৬৫-৬৬)

এই দৃষ্টিবিভ্রম বিভিন্ন আকারে ঘটতে পারে। এটি নির্ভর করে জাদুকরের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপর।

জাদুবিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য দর্শকদের অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা, যেন তারা জাদুকরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে ও তার আদেশ পালন করে।[৭] পরের আয়াতে এই বিষয়টি এসেছে, মূসা (আ.) নিজেও কিছুটা ভীতি অনুভব করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:৬৭)

এটি উল্লিখিত প্রথম আয়াতেও এসেছে,

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা মুসাকে স্বস্তি দিয়েছেন ও ভীতি দূর করে দিয়েছেন।

---

[৪] Philips, A.A.B., 1997, The Exorcist Tradition in Islaam, Sharjah, United Arab Emirates: Dar Al Fatah, p. 98.
[৫] Philips, 2005, p. 97.
[৬] al-Sha'rawi, 1995, p. 15.
[৭] Ibid., p. 21.

- 'তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাজাদু প্রদর্শন করল।' (সূরাহ আরাফ, ৭:১১৬)

মূসা (আ.) কে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের শয়তানী ধোঁকা ও প্রতারণার চেয়ে আল্লাহ-ই অধিক ক্ষমতাবান। আসলে জাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে আমাদের, এটিই তার প্রধান শিক্ষা।

জাদুবিদ্যা সেইসব পদ্ধতির অন্যতম, যার দ্বারা শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও মিথ্যা মাবুদের উপাসনার দিকে টেনে আনে। যে জাদু করে এবং যার অনুরোধে এটি প্রয়োগ করা হয়— উভয়েই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়। লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে জাদুকরের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা ও গুণাগুণ (যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট) আছে বলে ধরে নেয় এবং তাকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপন করে। এ কারণেই জাদুবিদ্যাকে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বিবেচনা করা হয়, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

জাদুবিদ্যা কার্যকর হয় জিনদের প্রভাবে। কেননা, কিছু বিষয়ে জিনদের এমন শক্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা মানুষের নেই। ফলে যে জিনের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করবে, সে অন্যদের তুলনায় কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করবে। এ কারণে জাদুকররা এমন কিছু করতে পারে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না।[৮] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, জাদুবিদ্যা (শয়তানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়) এক প্রকার শিরক এবং অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) জাদুবিদ্যা, (৩) আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরিয়ত সম্মত ব্যতীরেকে তাকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী নেক মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া। (বুখারি ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতীষির কাছে গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল সে মুহম্মদ এর কাছে অবতীর্ণ বিষয়ের (কুরআন) প্রতি কুফরি করল।' (আহমদ, আল হাকিম, বিশুদ্ধ হাদিস)

জাদুবিদ্যার মধ্যে তিনভাবে শিরক অন্তর্ভুক্ত থাকে,

১। এখানে শয়তান জিনদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সাহায্যের জন্য তাদের উপর ভরসা করা হয় এবং সাহায্যের বিনিময়ে তাদেরকে খুশি করার জন্য অনেক কিছু করা হয়।

---

[৮] Ibid., 1995, p. 26.

২। গায়েব বা অদৃশ্য জগতের খবর জানার দাবি করা হয়। যা কেবল আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। এভাবে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপন করা হয়।[১]

৩। এখানে অন্যান্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়, যেমন তাদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা ও জীবনের ঘটনাসমূহ ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা র জন্যই নির্দিষ্ট।

বাস্তবে জাদুবিদ্যাও আল্লাহ তাআলারই একটি সৃষ্টি। মানুষকে পরীক্ষার জন্য এটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

- 'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত।তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১০২)

এই আয়াত হতে জানা যায়, জাদুবিদ্যা একটি ফিতনা (পরীক্ষা), যার চর্চা মানুষকে কুফরিতে ধাবিত করে। এটি উপকারের বদলে মানুষের ক্ষতি করে। এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, আর সেটা হলো আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি। জাদু মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা, বৈবাহিক ও অন্যান্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যত্র এ সম্পর্কে দলিল রয়েছে,

- 'এবং (আমি আশ্রয় চাই) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে'

  (সূরাহ ফালাক, ১১৩:৪)

যখন কুরআন নাজিল হয়েছিল, তখনকার যুগে অন্যতম পদ্ধতি ছিল যে, গিঁট দিয়ে বা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে দিয়ে মানুষের উপর জাদু প্রয়োগ করা হতো। এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জাদুবিদ্যা বাস্তব।

এমনকি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে একজন ইহুদী জাদু দ্বারা আক্রান্ত করেছিল। 'আয়িশা রা. বললেন, নবি (সা.) -কে বনু যুরাইক গোত্রের ইহুদি লাবীদ ইবনু আসামের মাধ্যমে জাদু করা হয়। এমনকি জাদুর খেয়ালে তার মনে হতো যে, তিনি কোনো কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দুআ করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি জানো যে আল্লাহ

[১] al-Fozan, 1997, p. 47-48.

আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দুজন লোক এসেছিল। তাদের একজন মাথার কাছে বসল আর অপর জন আমার পায়ের কাছে বসল। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যক্তির রোগটা কি?' জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, 'তাকে জাদু করা হয়েছে।' প্রথম লোকটি বলল, 'তাকে জাদু কে করল?' সে বলল, 'লবীদ ইবনু আসাম।' প্রথম ব্যক্তি বলল, 'কিসের দ্বারা (জাদু করল)?' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'তাকে জাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়।' প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কোথায় আছে?' দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, 'যী আরওয়ান কূপে।' তখন নবি (সা.) সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। এরপর তিনি আইশা (রা.)-কে বললেন, 'আল্লাহর কসম, সেই কূপের পানি দেখতে মেহেদীর মতো লাল বর্ণের, আর এর কাছে খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মুন্ড।' তখন আমি (আইশা) জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি সেই জাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন?' তিনি বললেন, 'না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন, আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে।' এরপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হলো। (বুখারি ও মুসলিম)

১৩.৪ বদনজর ও হিংসা

জিন মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে যে সব প্রক্রিয়ায়, তার মধ্যে আরেকটি হলো বদ নজর। এই প্রক্রিয়ায় একজনের দৃষ্টি আরেকজনের ক্ষতির কারণ হয়, সাধারণত হিংসা থেকে এর উৎপত্তি। ক্ষতিটা দৃষ্টিশক্তি বা চোখের দ্বারা হয় না, বরং এটা কার্যকর হয় দুষ্ট জিনের মাধ্যমে। এছাড়া হিংসুক ব্যক্তি তার হিংসা চরিতার্থ করেও ক্ষতি করতে পারে। এই ঘটনার বাস্তবতা কুরআনে এসেছে,

- 'এবং (আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।' (সূরাহ ফালাক, ১১৩:৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। ...' (সূরাহ নিসা, ৪:৫৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বদনজর সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদিরকে পরাভূত করতে পারত, তবে বদনজরই তাকে পরাভূত করত।' (মুসলিম)

ইবনুল কাইয়িম হিংসা ও বদনজরের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> 'যার বদনজর অন্যকে আক্রান্ত করে, সে একজন হিংসুক ব্যক্তি; তবে উল্টোটা সবসময় সত্য নয়। সাধারণভাবে বদনজর হিংসারই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে বদনজরও অন্তর্ভুক্ত। বদনজরের মাধ্যমে হিংসার তীর নিক্ষেপ করা হয় হিংসুকের অন্তর থেকে অন্য ব্যক্তির প্রতি। কখনো এটা লক্ষ্যভেদ করে ক্ষতি করে, যদি হিংসার শিকার ব্যক্তি প্রতিরক্ষাহীন ও অপ্রস্তুত থাকে। আর যদি হিংসার

শিকার ব্যক্তি প্রস্তুত ও রক্ষাবৃহ্যে থাকে, তবে হিংসার তীর বদনজরকারীর দিকেই ফেরত আসে।'[১০]

হিংসা দুই প্রকারের হতে পারে,

১। নিজের লাভ হোক না হোক অন্যের যেন ক্ষতি হয়: হিংসুক চায় অপর ব্যক্তি হতে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ামত হারিয়ে যাক, সেটা নিজে পাওয়ারও আশা করে না।

২। ওর কল্যাণ যেন ওর না থাকে, আমি যেন পাই: সে ইচ্ছা করে অপর ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো নিয়ামত উঠিয়ে নেয়া হোক এবং সেই নিয়ামত সে নিজে লাভ করুক।

অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে কিংবা অন্যের নিয়ামত হারিয়ে যাক, ছিনিয়ে নেয়া হোক—এমন ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো নিয়ামত লাভে আগ্রহী হওয়া ইসলামে বৈধ এবং এটি হিংসার অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষত দুইটি ক্ষেত্রে এর অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুইজন লোক ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। (১) যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা নেকীর পথে খরচ করতে থাকে। (২) যাকে আল্লাহ এমন জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান) দান করেছেন যা সে নিজে আমল করে ও অন্যকে শিক্ষা দান করে।' (বুখারি, মুসলিম)

বদনজর মানুষ বা জিন যে কারো কাছ থেকে আসতে পারে। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেছেন, নবি (সা.) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যার চেহারা কালো হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, 'তাকে রুকইয়া করাও, কেননা তার উপর (বদ) নজর লেগেছে।' (বুখারি)। এই নজরটি জিনের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন আলিম মতামত দিয়েছেন।[১১]

হিংসা থেকে আলাদা আরেকটি অনুভূতির নাম ঈর্ষা। যে ঈর্ষা অনুভব করে, সে নিজের অধিকারে থাকা বিষয় অন্যের সাথে শেয়ার করতে চায় না, ওদিকে হিংসুক ব্যক্তি যা নিজের কাছে নেই সেটা পেতে চায়। যেমন একজন নারী তার নিজের স্বামীকে নিয়ে এমন ঈর্ষা অনুভব করতে পারে, যেন সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ না করে। ঈর্ষার কারণে নিজের স্বামীকে সে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে চায় না। আর অন্যের স্বামীকে দেখে যদি তার মনে হয়: নিজ স্বামীর থেকে অন্যের স্বামীটি উত্তম, এমন একটা স্বামী পাওয়া দরকার ছিল—তবে এটা হিংসা।

হিংসা ক্ষতিকর। এ বিষয় থেকে সুরক্ষার জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দুআ রয়েছে, আরো রয়েছে কুরআনের শেষের দুইটি সূরাহ (ফালাক, নাস) এবং আয়াতুল কুরসি। হিংসা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য রুকইয়া করতে পারেন। রুকইয়ার মাধ্যমে নিরাময়ের জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও দুআ পাঠ করা হয় এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করা হয়। আইশা (রা.) বর্ণনা করেছেন,

---

[১০] al-Jawziyyah, I.Q., 2003, Healing with the Medicine of the Prophet, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam, p. 149.

[১১] Philips, 1997, p. 109.

'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বদনজর এর জন্য রুকইয়াহ (শরীয়তসম্মত ঝাড়-ফুঁক) করার হুকুম করতেন।" (মুসলিম)। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি বদনজর দিল তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওযু করতে আর যার প্রতি বদনজর দেয়া হলো সে যেন (ঐ) পানি দ্বারা নিজেকে ধৌত করে নেয়।' (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা হিংসুকের হিংসা ও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন,

- 'বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে,যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।' (সূরাহ ফালাক, ১১৩:১-৫)

১৩.৫ জিনের আছর

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) লিখেছেন, মানুষের দেহে জিন প্রবেশ করার বিষয়টি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ইমামদের ঐকমত্যের মাধ্যমে সুনিশ্চিত। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

- 'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। ...' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৭৫)

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শয়তান আদম-সন্তানের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মতো ধাবিত হয়।' (আবু দাউদ, সনদ উত্তম)[১২]

অন্যান্য হাদিসের মাধ্যমেও জানানো হয়েছে যে, জিন মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। ইয়ালা ইবনু মুররা বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমন তিনটি জিনিস করতে দেখেছি যা আমার পূর্বে বা পরে কেউ দেখেনি। আমি এক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা রাস্তার পাশে এক মহিলাকে অতিক্রম করলাম যে তার শিশু বালককে সাথে নিয়ে বসেছিল। মহিলাটি ডাকল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বালকটি ফিতনায় পড়েছে। তার থেকে আমরাও ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছি। দিনে অনেকবার সে অজ্ঞান হয়ে যায়।' তিনি বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' কাজেই তাকে নবিজির দিকে উঠিয়ে ধরল। তখন তিনি বালকটিকে তার নিজের ও বাহনের বসার স্থানের মধ্যে রাখলেন। বালকটির মুখ উন্মুক্ত করলেন এবং সেখানে তিনবার ফুঁক দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর নামে; আমি আল্লাহর বান্দা! হে আল্লাহর দুশমন, বের হয়ে যা!' এরপর তিনি মহিলার কাছে বালকটিকে ফেরত দিলেন এবং বললেন, 'ফিরতি পথে আবার আমাদের সাথে দেখা করবে এবং জানাবে তার অবস্থা কি হলো।' এরপর আমরা চলে গেলাম। ফিরতি পথে আমরা পূর্বের স্থানে সেই নারীকে পেলাম। তার সাথে তিনটি

---

[১২] Ibn Taymiyah, Majmoo' al-Fatawa, Vol. 24, p. 276; as quoted in al-Ashqar, 1998, p. 87.

ভেড়া ছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'তোমার পুত্রের অবস্থা কি?' মহিলাটি বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, সেই ঘটনার পর থেকে আমরা তার আচরণে অস্বাভাবিক কিছুই দেখিনি।' (আহমাদ, আল হাকিম; বর্ণনা বিশুদ্ধ)।

জিন আছরের ঘটনায় প্রায়ই দেখা যায় খিঁচুনি বা মূর্ছা যাবার লক্ষণ থাকে। (যেমন পূর্বের হাদিসের ঘটনা) কিন্তু অনেক মানসিক অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে জিনের আছর একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। পাগল শব্দটির আরবি 'মাজনুন' যার অর্থ অমুক ব্যক্তি জিনে আছরগ্রস্ত। ইবনু তাইমিয়া (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

> 'জিনের অস্তিত্ব একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। একইভাবে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী আলিমদের ঐক্যমত অনুসারে মানব দেহে জিন প্রবেশের ঘটনাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় আহলে সন্নাহর আলিমদের ঐক্যমত রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্য থেকে জিনে আছরের সত্যতা পাওয়া যায়। আক্রান্ত ব্যক্তির মূর্ছা যাবার মাধ্যমে জিন মানবদেহে প্রবেশ করে এবং দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে থাকে। কী বলছে তা ব্যক্তি নিজেও জানে না; যদি মূর্ছাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এত জোরে আঘাত করা হয়, যে আঘাত একটি উটকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট, তবুও সে কিছু টের পায় না।'[১৩]

জিন আছরের লক্ষণসমূহ

মুসলিম রাকীদের গবেষণা অনুসারে জিনে আছরগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি দেখা যায়,

১। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন

ক. দ্রুত মেজাজ পরিবর্তন

খ. অনিয়ন্ত্রিত হাসি-কান্না

গ. বিষণ্ণতা

ঘ. নির্জনতা পছন্দ করা

২। দৈহিক পরিবর্তন

ক. অস্বাভাবিক শক্তি

খ. মৃগীরোগের খিঁচুনি

গ. catatonic লক্ষণসমূহ (হাত-পা অনিয়ন্ত্রিত কম্পন)

ঘ. ব্যথা অনুভব না হওয়া

৩। কগনিটিভ পরিবর্তন

ক. Glossolalia (অজানা ভাষায় কথা বলা, অনেক বেশি কথা বলা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো অর্থহীন কথা)

খ. আচ্ছন্নতা

গ. অতিপ্রাকৃত খবর প্রদান

ঘ. ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন

ঙ. অনিদ্রা

৪। আধ্যাত্মিক পরিবর্তন

ক. কুরআন তিলাওয়াত বা আজানের প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া

---

[১৩] Ibn Taymiyah, Majmoo' al-Fatdwa, Vol. 24, p. 277; as quoted in Philips, The Exorcist Tradition in Islam, p. 78.

ঙ. গলার স্বর পরিবর্তন

চ. Psychosomatic pains (বিশেষত মাইগ্রেন জনিত মাথাব্যথা)

খ. যে তেল বা পানিতে কুরআন পাঠ করে ফুঁ দেয়া হয়েছে সেগুলোর প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া; যেমন- পান করলে, গোসল করলে বা স্পর্শ করলে।

গ. ধর্মীয় কার্যক্রম পরিত্যাগ করা

আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলিমদের কাছে নিয়ে আসা হলে অনেক সময় দেখা যায় সমস্যাগুলো জিনে আছরের কারণে হয়নি; কেননা এ ধরনের উপসর্গ মানসিক, দৈহিক, জৈবিক বা সামাজিক প্রভাবকের কারণেও হতে পারে।[১৪]

ইবনু তাইমিয়া (রহ.) উল্লেখ করেছেন, মানুষকে জিনে আছরের ঘটনা তিন কারণে হতে পারে; ১। জিনের পক্ষ থেকে যৌনকামনা, এমনকি ভালোবাসা;

২। খেল-তামাশা, জিনের পক্ষ থেকে ঠাট্টা, মজা করার ছলে;

৩। জিন কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাগান্বিত হলে আছর করতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত যে ব্যক্তি ক্ষতি করে তাকে শাস্তি প্রদানের চেষ্টা করে। যেমন যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো ব্যক্তি মূত্রত্যাগের মাধ্যমে কোনো জিনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে অথবা কারো উপর গরম পানি ঢেলে দেয়, সেক্ষেত্রে জিন এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবতে পারে। এরপর সে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে, নিজে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার থেকে বেশি ক্ষতি করার মাধ্যমে বা যতোটুকু ব্যক্তির পাওনা তার থেকে বেশি প্রদানের মাধ্যমে।[১৫]

শয়তান যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে মিথ্যা মাবুদের উপাসনার দিকে পরিচালিত করে, আছর করা তার মধ্যে অন্যতম। আছরগ্রস্ত ব্যক্তি বিভ্রান্ত লোকেদের সাহায্য তালাশ করে, যারা জিন তাড়ানোর জন্য নানারকম শিরক বা মূর্তিপূজার পদ্ধতি পর্যন্ত অনুসরণ করে থাকে। যেমন- বিভিন্ন বাতিল মাবুদের নাম ধরে ডাকা (ভন্ড ওঝারা ঝাড়ফুঁকের সময় যীশু, বুদ্ধ ইত্যাদির কাছে সাহায্য চায়)। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে এসকল ভুয়া পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাঝে মাঝে নিরাময় হবার কারণ কী? এর উত্তর হচ্ছে, মানুষকে শিরক করিয়ে জিন যখন নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করে ফেলে, তখন স্বেচ্ছায় চলে যেতে পারে। শিরক করানোর পর উক্ত ব্যক্তির মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে বসে। এরপর জিন যখন খুশি তখন সহজেই সেই ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য হয় না। একমাত্র পরিপূর্ণ নিরাময় হয়ে থাকে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে রুকইয়া করে এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে জিনকে বাধ্য করা হয় আক্রান্ত রোগীর দেহ ত্যাগ করতে।

---

[১৪] Philips, 1997, pp. 144-145.

[১৫] Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn (from Philips, The Exorcist Tradition in Islam, p. 93-4).

সাধারণত যে সকল ব্যক্তির ঈমান ও দ্বীনদারিতা দুর্বলতা, তাদেরকে জিন আক্রান্ত করে। কেননা, তাদেরকে আক্রমণ করাও সহজ এবং সহজে পরাভূতও করা যায়। আর মুমিনরা দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাত নির্দেশিত আমল, আজকার ও দুআ পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে তারা অবস্থান করে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সুরক্ষাবূহ্যের ভিতর। আল্লাহ বলেন,

- 'তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালন কর্তার উপর ভরসা রাখে। তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৯৯-১০০)

বাস্তবে দেখা যায়, মজবুত ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে জিন ভয় পায়। যেমন- উমর ইবনুল খাত্তাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই জিন ও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান তারা উমরকে দেখে পলায়ন করে।' (তিরমিযি, উত্তম সনদে বর্ণিত)

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। অস্বাভাবিক আচরণকারী বা মূর্ছা যাওয়া রোগীদের মধ্যে সবাই জিনে আছরগ্রস্ত নাও হতে পারে। এমনকি পূর্ববর্তী যুগের আলিমরাও শনাক্ত করেছেন যে, এধরনের লক্ষণ দৈহিক সমস্যায়ও পাওয়া যায়। এসব দৈহিক অসুখ যে দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে সেটাও তারা বুঝতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগে এ সকল রোগের বায়োলজিক্যাল থিওরি বেশ উন্নত হয়েছে। এমনকি এতটাই উন্নত হয়েছে যে এসকল সমস্যার 'অতিপ্রাকৃত' বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হচ্ছে। তবে এসব তত্ত্বের মধ্যে কোনোটি সঠিক, সেটা মৌলিক প্রশ্ন নয়। বরং দেখতে হবে নির্দিষ্ট রোগীর উপর কোন পদ্ধতিটি কাজ করছে। এর জন্য প্রয়োজন রোগীর সমস্যাগুলোর পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত মূল্যায়ন করে সমন্বিত সমাধানের, যেখানে মেডিকেল ডাক্তারদের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরাও একত্রে কাজ করবেন।

১৩.৬ শয়তানের কর্মপদ্ধতি

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। গুনাহের কাজকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে ও টার্গেটকৃত ব্যক্তির দুর্বলতা অনুযায়ী নিজের কৌশল পরিবর্তন করে। শয়তানের কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করছি:

মন্দকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা

শয়তান পথভ্রষ্টতার কাজকে আকর্ষণীয় ও প্রলুব্ধকর হিসেবে উপস্থাপন করে। মিথ্যাকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে এবং সত্যকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখে যেন সেটা মিথ্যা। এভাবে মানুষ মন্দ কাজে অনুপ্রাণিত হয়, মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্য থেকে।[১৬] এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

---

[১৬] al-Ashqar, 1998, pp. 96-97.

• 'সে বলল, হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ঠ করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।' (সূরা হিজর, ১৫:৩৯-৪০)

যদিও বাস্তবে মন্দ কাজের ফলাফল ক্ষতি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু শয়তান মানুষকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করে যেন মিথ্যার পথ অনুসরণ করলে মানুষ উপকৃত হবে। নিষিদ্ধ বিষয়কে নানা প্রলুব্ধকর নাম দিয়ে উপস্থাপন করে। এর প্রথম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীর ঘটনায়। সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করাকে শয়তান উপকারী ও কল্যাণকর বলে অভিহিত করেছিল। সে এর নাম দিয়েছিল 'অনন্ত-জীবন বৃক্ষ'; আরো বলেছিল, যদি তারা এই গাছের ফল ভক্ষণ করেন তাহলে চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবেন এবং ফেরেশতাদের মত হয়ে যাবেন।[১৭] আল্লাহ বলেছেন,

• 'অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী।' (সূরা আরাফ, ৭:২০-২১)

'আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী' বলার মাধ্যমে শয়তান প্রলোভনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেছিল।

চরমপন্থা

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন,

'আল্লাহ তাআলার এমন কোনো আদেশ নেই, যার বিরুদ্ধে শয়তান দুইটি সাংঘর্ষিক অবস্থানের একটি গ্রহণ করে না। সেগুলো হলো বাড়াবাড়ি অথবা ছাড়াছাড়ি তথা অতিউৎসাহ ও অতি উদাসীনতা। কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানুষের উপর বিজয়ী হবে এটা শয়তানের বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং সে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে বান্দার অন্তরের অবস্থা। যদি সেখানে উদাসীনতার ছিদ্রপথ খুঁজে পায় তাহলে সেটারই সুবিধা নেয়। তাকে বাধা দেয়, বসিয়ে রাখে। অলসতা, উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত করে। সহজ বিষয়কে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করে, অলীক আশাগ্রস্ত করে রাখে। এভাবে একসময় আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়ের কিছুই আর তার পালন করা হয়ে ওঠে না।

আর যদি শয়তান মানুষের অন্তরে সর্তকতা, গাম্ভীর্য, ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টা ও যোগ্যতা দেখতে পায়, তখন তাকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত করে হতাশাগ্রস্ত করে দেয়। শয়তান তাকে অধিকতর পরিশ্রমের আদেশ দেয়। সে বোঝায় তুমি যা করছ তা যথেষ্ট নয়, বরং তোমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আরো বড় হওয়া উচিত, আরো কঠিন পরিশ্রম করা উচিত। এভাবে তাকে চরমপন্থায় পরিচালিত করে সীমালংঘন করিয়ে দেয়।

[১৭] Ibid., pp. 98, 100.

> এভাবে প্রথম ব্যক্তির মতো দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও সরলপথ থেকে বিচ্যুত করে। শয়তানের উদ্দেশ্য হলো তাদের উভয়কে সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। প্রথম ব্যক্তিকে উদাসীনতার মাধ্যমে সরল পথের নিকটবর্তী হতে দেয়নি, আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করানোর মাধ্যমে বিচ্যুত করেছে। অধিকাংশ মানুষ এই দুই পদ্ধতির যেকোনো একটির মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়। ঈমান, গভীর ইলম, সরল পথ আঁকড়ে ধরা ও শয়তানের বিরুদ্ধে লাগাতার মুজাহাদা (লড়াই করে টিকে থাকা) ছাড়া এগুলো থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।[১৮]

প্রথম ব্যক্তিকে শয়তান উপকারী কাজ থেকে বিরত রেখেছিল অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং ঢিলেমি করানোর মাধ্যমে। শয়তান মানুষকে বোঝায় যে, এই কাজগুলো করার জন্য তোমার সামনে তো দীর্ঘ সময় রয়েছে! ফলে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত দেরি করতে থাকে, যখন আর বিলম্ব করার সুযোগ থাকে না। তখন তাড়াহুড়ো করে সবকিছু শেষ করতে চায়। ফলে কাজগুলো অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এবং আধাআধিভাবে সমাপ্ত হয়। এই বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে বিলম্ব করে এবং আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন, তাওবা করতে বিলম্ব করে। এমনকি এক পর্যায়ে মৃত্যুর ফেরেশতার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তখন আর কোনো সুযোগ থাকে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় শয়তান তার মাথায় তিনটা গিঁট লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিঁট লাগানোর সময় সে বলে, "এখনো অনেক রাত্র বাকী আছে" অথাৎ তুমি শুয়ে থাক। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর জিকর করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে তাহলে আরো একটি গিঁট খুলে যায়, যদি সালাত আদায় করে তাহলে সমুদয় গিঁট খুলে যায় এবং তার সকাল হয় আনন্দ ও উদ্দীপনায়। অন্যথায় তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদময়।' (বুখারি)

মানবিক দুর্বলতার উপর হামলা

শয়তান মানুষকে নফসের দুর্বলতার মাধ্যমে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। এসব দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে গর্ব, অহংকার, ক্রোধ, লোভ, কৃপণতা, সম্পদের প্রতি মোহ, সন্দেহ-সংশয় হতাশা, ভয় ইত্যাদি। এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি, মানুষের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, এসব দুর্বলতা থেকে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা। যারা এই লক্ষ্য অর্জন করতে চেষ্টা করে, শয়তান তাদের কাজে বাধা দেয়। নফসের কামনা-বাসনা অনুসরণ করা সহজ বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। মানুষ যে বিষয়গুলোর প্রতি দুর্বল সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে শয়তান লক্ষ্য অর্জন করে ফেলে সহজেই।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন,

> 'শয়তান মানুষের দেহে এমনভাবে চলাচল করে যেভাবে রক্ত চলাচল করে। এক পর্যায়ে সে মানুষের আত্মার কাছে পৌঁছে মিশে যায়। তখন শয়তান প্রশ্ন করে জেনে

[১৮] Ibn al-Qayyim, 2000, p. 19; as quoted in al-Ashqar, 1998, pp. 100-101.

নেয় নফস কি ভালোবাসে ও কিসে প্রভাবিত হয়। এরপর সেগুলো ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই শয়তান তাকে বশে আনে। এরপর এই সংবাদ মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের বন্ধু ও অনুসারী, তাদেরকে জানিয়ে দেয় শয়তান। তখন তারা পরস্পরের মন্দ বিষয়গুলো পছন্দ করে তাকেও কাছে টেনে নেয়। অন্তরে অনুপ্রবেশের জন্য যে নফসের দরজা বেছে নেয়, সে কখনো নিষ্ফল হয়না। যদি অন্য কোনো মাধ্যমে কেউ তার অন্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তাহলে দরজা বন্ধ পায়, কেননা এই দরজাটাই সবচেয়ে সহজ।'[১১]

ক্রমান্বয়ে পথভ্রষ্টতার নীতি

সাধারণত শয়তান মানুষকে সরাসরি গুনাহের কাজে পরিচালিত করে না। কেননা, এ পদ্ধতি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক, বরং সে অনুসরণ করে 'স্টেপ বাই স্টেপ' পদ্ধতি অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে পথভ্রষ্টতার পদ্ধতি। এভাবে ধীরে ধীরে বড় থেকে বড় অবাধ্যতাও করিয়ে নেয়। যদি কেউ প্রথম পদক্ষেপে সন্তুষ্ট থাকে, শয়তান তাকে দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ায়। এর একটি উদাহরণ হলো অ্যালকোহল তথা মাদকদ্রব্যের ব্যবহার।

যেমন- একজন শিক্ষার্থী জানে অ্যালকোহল হারাম, ফলে সে নিয়ত করল কখনো মদ পান করবে না। একদিন কিছু বন্ধুর সাথে তার সাক্ষাত হলো (যারা শয়তানের সহচর)। ঐ বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই ড্রিঙ্ক করে। একদিন সেই বন্ধুরা তাকে একটি পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাল যেখানে অ্যালকোহল থাকবে। শুরুতে সে অস্বীকার করল। কিন্তু বন্ধুরা তাকে এই বলে রাজি করাল যে তাকে মদ পান করতে হবে না, সে শুধু আসবে এবং তাদের সাথে সেই সামাজিক অনুষ্ঠান উপভোগ করবে। এরপর সেই ছাত্রটি এ ধরনের কয়েকটি পার্টিতে উপস্থিত হলো যেখানে অন্য সবাই মদ পান করে কিন্তু সে করে না। একদিন একজন একটি মদের গ্লাস এনে তার সামনে এনে রাখল এবং বলল, 'শুধু এক চুমুক পান করো!' সে ভাবলোএকটু পরখ করে দেখি, এটা তো কেবল এক চুমুকের ব্যাপার! পরের গেট টুগেদারে সে পূর্ণ এক গ্লাস পান করল। আর এভাবে চলতে থাকল। একপর্যায়ে সে নিয়মিত মদপান শুরু করল এবং আসক্ত হয়ে পড়ল। এভাবে ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে পথভ্রষ্টতার পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করল।

ভুলিয়ে দেয়া

শয়তান মানুষকে বিভিন্ন বিষয় ভুলিয়ে দেয় যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে না পারি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

- 'আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:১১৫)

---

[১১] Ibn al-Qayyim, Ighaatha al-Luhfaan, p. 132; as quoted in al-Ashqar, 1998, pp. 113-114.

আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কটাক্ষ করে তাদের সাথে একত্রে বসতে মুমিনদেরকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কিন্তু শয়তান এই কথা ভুলিয়ে দেয়,

- 'যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি শয়তান আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।' (সূরাহ আনয়াম, ৬:৬৮)

যখন শয়তান মানুষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তখন আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে,

- অন্যত্র বলেছেন,

'শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভূলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮:১৯)

এটি মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

১৩.৭ শয়তান ও বদ জিন থেকে সুরক্ষা

শয়তান ও দুষ্ট জিনের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যদি শয়তান কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে তখন অবিলম্বে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৩৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

'আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।' (সূরাহ আরাফ, ৭:২০০)

এছাড়াও আমরা কুরআনের বিভিন্ন সূরাহ ও আয়াত পাঠ করতে পারি, যেমন- শেষের দুটি সূরা (ফালাক ও নাস), আয়াতুল কুরসি, সূরাহ বাকারার শেষ দুই আয়াত ইত্যাদি। নিয়মিত জিকির-আজকার, দুআ পাঠ ও কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। একটি উদাহরণ সামনের হাদিসে উল্লেখ করছি,

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা- শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর- (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, শরীকবিহীন, তাঁর জন্যেই সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রশংসা, তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর শক্তিশালী) বলবে সে দশটি গোলাম আজাদ করার সমান সাওয়াব লাভ করবে। আর তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে ১০০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের প্ররোচনা থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার

অপেক্ষা ভালো আমল আনতে পারবে না, একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তার অপেক্ষা বেশি আমল করেছে।' (বুখারি)।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে অনেক বার উল্লেখ করেছেন যে তিনি মুমিনদেরকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন,

- 'অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালন কর্তার উপর ভরসা রাখে। তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।' (সূরাহ্ নাহল, ১৬: ৯৮-১০০)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।' (সূরাহ্ ইসরা, ১৭:৬৫)

||অধ্যায় চৌদ্দ ||
অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান ও মানসিক অসুস্থতা

- 'কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।' (সূরাহ আসর, ১০৩:১-৩)

মানসিক অসুস্থতার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এটি পৃথক গ্রন্থে আলোচনার দাবি রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা কিছু প্রধান পয়েন্ট আলোচনা করছি। অভিজ্ঞতা থেকে প্রায় একশর বেশি বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতার কথা জানা গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে দুইটি মানসিক অসুস্থতা দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে— বিষণ্ণতা (ডিপ্রেশন) ও উদ্বিগ্নতা (অ্যাংজাইটি)। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই দুটি অসুস্থতা Debilitating disease এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ অসুস্থতা ক্রম ক্রমে অবনতির এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যখন ব্যক্তি বিভিন্ন যন্ত্রণা ও ভোগান্তির কারণে নিজেই নিজের জীবনকে শেষ করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষণ্ণতা সৃষ্টি হয় অতীত বা সাম্প্রতিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া থেকে, আর উদ্বিগ্নতা সাধারণত ভবিষ্যতের কোনো আশংকার একটি প্রতিক্রিয়া।

১৪.১ মানসিক অসুস্থতার সংজ্ঞায়ন

বিষাদ মানুষের একটি সহজাত অভিজ্ঞতা। এটি সুখ ও আনন্দের বিপরীত অনুভূতি। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিষাদগ্রস্ততার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে কাফিরদের কথা ভেবে বিষাদগ্রস্ত হতে নিষেধ করেছেন,

- 'আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ তাআলা র কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৭৬)

- অন্যত্র বলেছেন,

'তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন।' (সূরা শুয়ারা, ২৬:৩)

নবি ইয়াকুব (আ.) পুত্র ইউসুফ (আ.) এর বিরহে বিমর্ষ হয়েছিলেন; যদিও তিনি সবর করেছেন, আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন নিজের দুঃখ লুকানোর।

- 'এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট।' (সূরাহ ইউসুফ, ১২:৮৪)

তিনি নিজের দুঃখ বা অসন্তুষ্টি কারো কাছে প্রকাশ করেননি, অভিযোগ করেননি। যদিও তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে তার অন্যান্য পুত্ররা ইউসুফের অন্তর্ধান রহস্যের সাথে জড়িত।

যারা আল্লাহর হিদায়াত অনুসরণ করে তারা কোনো ভীতি বা উদ্বিগ্নতা অনুভব করবে না। এটি আল্লাহর ওয়াদা। শেষ বিচারের দিনে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে,

- 'আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:৩৮)

জীবনে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির কারণে আমরা সকলেই কমবেশি দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করি। তবে এগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়না। অপরদিকে 'ডিপ্রেশন' সাধারণ দুঃখ-দুর্দশাবোধ থেকে ভিন্ন। এটি তীব্রতর এবং দীর্ঘস্থায়ী, এমনকি একপর্যায়ে এটি ক্রনিক (দীর্ঘস্থায়ী) হতে পারে। ডিপ্রেশনের আরবি শব্দ ইকতি'আব, এর শব্দমূল 'কা'ইবা' (كَئِبَ); অর্থাৎ হতাশা, দুর্বলচিত্ত, নিরাশা বা দুঃখ।[১] এটি গভীর দুঃখ এবং শোক-কে বোঝায়। ডিপ্রেশনের লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে: হতাশাগ্রস্থ মেজাজ, আনন্দদায়ক কাজে অনাগ্রহ, নিজেকে অযোগ্য মনে করা, অপরাধবোধ, মনোযোগ হ্রাস, ক্ষুধামন্দা ও ওজনের পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস), ঘুমের পরিবর্তন (অনিদ্রা অথবা অতিনিদ্রা) এবং আত্মহত্যার ভাবনা।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) অনুসারে সারাবিশ্বে অক্ষমতার(disability) প্রধান কারণ ডিপ্রেশন এবং পৃথিবীব্যাপী রোগব্যাধির প্রভাবক হিসেবে এর স্থান চতুর্থ। অনুমান করা হচ্ছে, ২০২০ সালের মধ্যে এটি বিশ্বব্যাপী রোগব্যাধির দ্বিতীয় প্রভাবকে পরিণত হবে। বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ১২১ মিলিয়ন মানুষ ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন, শতকরা হিসেবে পৃথিবীর জনসংখ্যার ১০% নারী ও ৬ % পুরুষ এতে আক্রান্ত।[২]

উদ্বেগজনিত অসুস্থতার (anxiety disorder) বৈশিষ্ট্যগুলো হলো দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া, লাগাতার অস্থিরতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা অথবা দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্বেগের হ্রাস ঘটানোর চেষ্টা ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি যেসব 'অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার' দেখা যায় সেগুলো হলো,

---

[১] Wehr, 1974, p. 807.
[২] Wehr, 1974, p. 807.

১। জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার: সবসময় দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের মধ্যে থাকা, খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা করা, হাত পা কাঁপতে থাকা, পেশীতে টান টান ভাব, উৎকণ্ঠা ও অনিদ্রা।

২। প্যানিক ডিসঅর্ডার: প্যানিক অ্যাটাক (হঠাৎ ভীত হয়ে পড়া), হঠাৎ করে ঘাবড়ে যাওয়া, অল্প সময়ব্যাপী তীব্র আতঙ্কিত থাকা; এর লক্ষণ সমূহ মধ্যে রয়েছে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করা, শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম, হাত-পা কম্পন ও ঝিমুনি ভাব। এসব উপসর্গকে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক বা অন্যান্য দৈহিক রোগ বলে মনে হতে পারে।

৩। আতংক (ফোবিয়া): নির্দিষ্ট বস্তু, কাজ বা পরিস্থিতি কেন্দ্র করে অহেতুক আতঙ্ক অনুভব করা। যেমন- উচ্চতা, রক্ত, পশুপাখি, সুরঙ্গ বা উড়োজাহাজে আরোহন করার প্রতি ভীতি।

৪। শুচিবায়ুগ্রস্ততা (ওসিডি- অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার): কোনো বিষয়ে উদ্বেগ হ্রাস করার জন্য বারবার অর্থহীনভাবে কোনো আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটানো। সবচেয়ে বেশি যে 'ওসিডি' দেখা যায় সেটা হলো শুচিবায়ুগ্রস্ততা, অর্থাৎ রোগ-জীবানু ও ময়লা আবর্জনা থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে বারবার হাত ধুতে থাকা, বার বার গোসল করা বা দাঁত ব্রাশ করা ইত্যাদি।[৩]

মানসিক চাপ বোঝাতে কুরআনে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হলো 'দাকাত' (ضاقت)। এর অর্থ কোনো কিছু দ্বারা সংকীর্ণ, সরু, অপ্রশস্ত ও আবদ্ধ হওয়া। অন্যান্য অর্থের মধ্যে রয়েছে দুঃখিত, অস্থির, হতাশাগ্রস্ত, বা মনমরা হওয়া। উল্লেখিত শব্দের বিশেষ্য রূপ 'দীক'(ضيق) এর মাধ্যমে বোঝায় সংকীর্ণতা, কাঠিন্য বা আবদ্ধতা; অন্যান্য অর্থ হলো যন্ত্রণা, হতাশা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।[৪]

যে ব্যক্তি বিষণ্ন বা অবসাদগ্রস্ত তিনি সবকিছুতে সংকীর্ণতা ও আবদ্ধতা অনুভব করেন। তার মনে হয় যেন চতুর্দিক থেকে পৃথিবী গুটিয়ে আসছে। এই পরিভাষাটি কুরআনে সেই তিন সাহাবির ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) সাথে তাবুকের যুদ্ধে শরিক হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই তিনজন হলেন কাব ইবনু মালিক, হিলাল ইবনু উমাইয়া এবং মুরারা ইবনু আর-রাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। সেই ঘটনা বিবৃত করে আল্লাহ বলেছেন,

- 'এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই-অতঃপর তিনি

---

[৩] Myers, 2007, pp. 649-652.
[৪] Wehr, 1974, pp. 548-549.

সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।' (সূরাহ তাওবা, ৯:১১৮)

যারা তাবুকের যুদ্ধে যোগদান না করে পিছনে পড়েছিলেন, শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের অজুহাত কবুল করেননি। সকল মুসলিমরা তাদেরকে পঞ্চাশ দিন ও পঞ্চাশ রাতের জন্য বয়কট করেন। কাব ইবনু মালিক (রা.) পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেছেন, 'আমি আমার ঘরের ছাদের উপর পঞ্চাশতম রাতের ফজরের সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি ঐ অবস্থায় বসেছিলাম, যার ব্যাপারে আল্লাহ (কুরআনে) উল্লেখ করেছেন, আমার মন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে এবং ধরিত্রী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্যে তা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। (বুখারি ও মুসলিম)

এরপর আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তারা অন্তরের সংকীর্ণ দশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল হুনাইনের যুদ্ধে। সেদিন মুসলিমরা গর্ব অনুভব করছিলেন তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। তাদের সংখ্যাধিক্য কোনো কাজে আসেনি। তারা যুদ্ধের ময়দানে সংকীর্ণতা অনুভব করলেন ও পিছু হটলেন সেখান থেকে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।' (সূরাহ তাওবা, ৯:২৫)

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর রাসূলের কাছে সাহায্য প্রেরণ করলেন, এরপর তারা বিজয়ী হতে পেরেছিলেন।[৫]

সংকীর্ণতা অনুভবের বিষয়টি অন্তর ও বক্ষদেশের অবস্থা বর্ণনা করতেও কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

- 'অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।' (সূরা আনয়াম, ৬:১২৫)

যারা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তাদের সম্পর্কে তাঁর রাসূলের কাছে তিনি বলেছেন,

- 'আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবর্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন।' (সূরাহ হিজর, ১৫:৯৭)

যখন ফেরেশতারা জনপদ ধ্বংস করতে এসেছিলেন, তখন নবি লুত (আ.) অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করেছিলেন, আল্লাহ বলেছেন,

---

[৫] Ibn Kathir, 2000, Vol. 4, pp. 397-400.

• 'যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।' (সূরাহ্ আনকাবুত, ২৯:৩৩)

১৪.২ আত্মহত্যা

বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। এই সংখ্যার সাথে অতিরিক্ত তাদেরকেও বিবেচনা করতে হবে যাদের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সফল হয়নি, প্রত্যেকটি মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে থাকে অতিরিক্ত ১২ থেকে ২৫ টি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। আত্মহত্যার ঝুঁকি ও প্রভাবের মধ্যে রয়েছে—বিষণ্ণতা ও অন্যান্য মানসিক অসুস্থতা, মাদকদ্রব্য সেবন, এ ধরণের অসুস্থতার পারিবারিক ইতিহাস, আত্মহত্যার পারিবারিক ইতিহাস, নিপীড়িত হওয়া বা মানসিক আঘাতের ইতিহাস ইত্যাদি। ৯০ শতাংশের বেশি আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে প্রথম দুইটি রিস্ক ফ্যাক্টর এর যেকোনো একটি দেখতে পাওয়া যায়।[৬]

আত্মহত্যা থেকে সুরক্ষাদায়ী প্রভাবকের মধ্যে রয়েছে মানসিক রোগ ও মাদকসেবনজনিত (substance abuse disorder) অসুস্থতার যথাযথ যত্ন নেয়া, মজবুত পারিবারিক সম্পর্ক; সামাজিক সহায়তা বা সমর্থন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস যা আত্মহত্যাকে নিরুৎসাহিত করে এবং আত্ম-পরিচর্যাকে গুরুত্ব দেয়।[৭] আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষাদায়ী প্রভাবক হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ। গবেষকরা দেখেছেন, মুসলিম ভূমিগুলোতে আত্মহত্যার হার অনেক কম।[৮] মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্যই ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়ে সম্পৃক্ততা একটি সুরক্ষাদায়ী প্রভাবক। এর কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে: ধর্মে রয়েছে বেঁচে থাকার মৌলিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, যা আত্মহত্যার হার কমিয়ে দেয়।[৯] যেমন মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে (কুরআন ও হাদিস) আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কঠিন হুকুম এসেছে। এক্ষেত্রে আত্মহত্যাকারীদের প্রতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।[১০]

---

[৬] Suicide Resource Prevention Center, Risk and Protective Factors for Suicide, retrieved February 2, 2010 from http://www.sprc.org/library/srisk.pdf.

[৭] Ibid.

[৮] Mohyuddin, F., 2008, Suicide in the Muslim world, International Journal of Child Health and Human Development, 1(3), pp. 273-279.

[৯] Dervic, K., Oquendo, M. A., Grunebaum, M. F., Ellis, S., Burke, A. K., & Mann, J. J., 2004, Religious affiliation and suicide attempt, American Journal of Psychiatry, 161(12), pp. 2303-2308.

[১০] Mohyuddin, 2008, pp. 273-279.

নবি (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ দুঃখ দৈন্যে নিপতিত হওয়ার কারনে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি এমন একটা কিছু করতেই হয়, তা হলে সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন পর্যন্ত আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যানকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যানকর হয়।' (বুখারি)

'আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভালো লোক হলে (বেশি বয়স পাওয়ার দরুন) তার নেক আমল বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে মন্দ লোক হলে সে লজ্জিত হয়ে তাওবা করার সুযোগ লাভ করতে পারবে।' (বুখারি)

নবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তার দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।' (বুখারি)

এই হাদিসের ব্যাখায় আল-খাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন, এই হাদিসে উল্লেখিত শাস্তি শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে, যারা সুস্থ মন মানসিকতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মহত্যা করেছে। আর যারা মারাত্মকভাবে বিষাদগ্রস্থ বা অন্যান্য মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিল, তাদেরকে এর জন্য দায়ী নাও করা হতে পারে, বিষয়টি নির্ভর করবে তাদের অসুস্থতার মাত্রার ওপর।[১১] তাদের বিষয়ে বিচারের দিনে আল্লাহ তাআলাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে উপযুক্ত গন্তব্যে প্রেরণ করবেন। এ কারণে এমনটা বলা যায়না যে, সব আত্মহত্যাকারীই জাহান্নামী হবে।

১৪.৩ মানসিক অসুস্থতার কারণসমূহ

আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহে মানসিক অসুস্থতার বিভিন্ন কারণ প্রস্তাব করা হয়েছে, যেমন- দৈহিক সমস্যা (জেনেটিক বা মস্তিষ্কে নিউরো কেমিক্যাল ভারসাম্যহীনতা), শিক্ষণ অভিজ্ঞতার সমস্যা, জীবনের মানসিক চাপের নানা ঘটনা, বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা ইত্যাদি।

যেমন ধরুন, বিষণ্ণতার 'সোশাল-কগনিটিভ মডেল' এর অন্যতম উপাদানসমূহ হলো—

১। নেতিবাচক, মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনাসমূহ যা স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায়

২। একটি স্মৃতিরোমন্থনমূলক, হতাশাবাদী ব্যাখা দাঁড় করানো যার ফলে,

---

[১১] al-Khater, A., 2001, Grief and Depression from an Islamic Perspective, London: Al-Firdous Ltd, pp. 26-27.

৩। একটি নৈরাশ্যবাদী, বিষাদগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং

৪। ব্যক্তির চিন্তা ও কাজকে বাধাগ্রস্ত করে, এরপর এগুলো অন্যান্য নেতিবাচক অভিজ্ঞতা উস্কে দেয় যেমন- 'নিজেকে গুটিয়ে নেয়া'। কিছু সমালোচক মন্তব্য করেছেন, বিষণ্ণতার সাথে এগুলো ঘটনাচক্রে মিলে যেতে পারে, তবে এগুলো থেকেই বিষণ্ণতা সৃষ্টি হচ্ছে, তা নাও হতে পারে।[১২]

আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রভাব ইসলামে স্বীকৃত। কিছু মানসিক অসুস্থতা পুরোপুরি দৈহিক সমস্যার কারণে হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাও মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক মৃত্যুর উপর গুরুত্বারোপ করা হয় । বস্তুত বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানসিক অসুস্থতার শেকড় এখানেই প্রোথিত। মানবাত্মা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণের জন্য মরিয়া হয়ে আকুতি জানাচ্ছে, কিন্তু সেই ডাকে কোনো সাড়া প্রদান করা হচ্ছে না—এর অর্থ এই নয় যে মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের সবাই নৈতিকভাবে দেউলিয়া; বরং এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ্ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হলে মানসিক অসুস্থতার সম্ভাব্যতা অনেক বেড়ে যায়। যেমন, যে ব্যক্তির ঈমান দুর্বল, জীবনের কঠিন পরিস্থিতিগুলোর তাৎপর্য-ব্যাখ্যা বুঝতে তাকে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়। সহজেই জিন শয়তানের কবলে পড়ার সম্ভাবনা তার বেশি।

আল্লাহ্ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রভাব কুরআনে এভাবে এসেছে,

- 'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:১২৪)

যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কাটাবে। এই আয়াতের সাথে মানব জীবনের অনেক কঠিন পরিস্থিতিকে সংযুক্ত করা যায়, যেমন- বিষণ্ণতা , উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-দুর্দশা ও জীবনের মানসিক ধকল। নফসের দুর্বলতা ও খেয়ালখুশির কাছে পরাস্ত হয়ে আরো বৃদ্ধি পায় তাদের দুর্দশা। অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে দেন। এমনকি একপর্যায়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করার চিন্তা শুরু করে। শেষমেশ তাদের চূড়ান্ত ঠিকানা হয় জাহান্নাম।

ইবনে কাসির (রহ.) উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

'দুনিয়াতে তার জীবন কঠিন হয়ে যাবে। নিজের পথভ্রষ্টতার কারণে সে অন্তরে কোনো প্রশান্তি, প্রশস্ততা অনুভব করবে না। বরং অনুভব করবে সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য । যদিওবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে দেখে প্রশান্ত মনে হয়; সে উত্তম পোষাক পরিধান করে, উন্নত খাদ্য গ্রহণ করে, নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করে, তবুও কিছুতেই সুখ পায় না। কেননা, তার অন্তরে বিশুদ্ধ ইয়াকিন ও হিদায়াত নেই। সে সবসময় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,

---

[১২] Myers, 2007, pp. 668-669.

পথভ্রষ্টতা ও সন্দেহ-সংশয়ে পতিত থাকে। সব সময় দ্বিধাগ্রস্থ ও অনিশ্চিত থাকে। এগুলোই (আয়াতে উল্লেখিত সংকীর্ণ জীবন ও) দুর্দশার অংশ।'[১৩]

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকে ও ভ্রান্ত জীবনাচরণ অনুসরণ করে, তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। তাদের অন্তরে সীলমোহর করে দেয়া হয়। ফলে সেখানে একটি স্থায়ী শূন্যতা এবং আধ্যাত্মিক অপূর্ণতা বিরাজ করে। যারা আল্লাহর উপর ঈমান ব্যতীত জীবনযাপন করে, তারা নিজেদের প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলা কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য।' (সূরাহ হাশর, ৫৯:১৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

  তিনি আরও বলেছেন, 'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:১২৪)

ঈমানী দুর্বলতার এই বিষয়টিই প্রকাশ পেতে পারে মানসিক কোনো অসুস্থতা বা দুর্দশার মাধ্যমে। সামনের আয়াতে তাদের এই দুর্দশার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে,

- 'সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।' (সূরাহ ত্বহা, ২০:১২৫-১২৬)

ঈমানী দুর্বলতার আরেকটি দিক হলো, কোনো কিছুকে আল্লাহ তাআলার থেকেও বেশি ভালোবাসা। যারা কোনো কিছুকে আল্লাহর থেকেও বেশি ভালোবাসে তাদের পরিণতি সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন:

'এ ধরনের ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহর সুন্নাহ (রীতি) হলো, তিনি তাদের ভালোবাসার বস্তু ও সংশ্লিষ্ট বিষয়কে আক্ষেপ ও দুঃখের উৎসে পরিণত করে দেন। যারা নিজেদের খেয়ালখুশিকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে এবং মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলার চেয়েও বেশি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কামনা করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাকদিরে নির্ধারণ করেছেন যদি কেউ কোনো কিছুকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে তবে সে ঐ বিষয়ের দ্বারাই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। যদি কেউ কোনো কিছুকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভয় করে, তবে সে ঐ বিষয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। যে আল্লাহকে বর্জন করে অন্যকিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ব্‌ সেটা তার আফসোস ও দুঃখের কারণ হবে। যে অন্যকে আল্লাহর থেকে প্রাধান্য দেবে, সেখানে কোনো বরকত থাকবে

---

[১৩] Ibn Kathir, 2000, Vol. 6, p. 406.

না। আর যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোনো সৃষ্টিকে খুশি করার চেষ্টা করবে সে নিসন্দেহে নিজের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযব ডেকে আনবে।[১৪]

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে অদেখা ভুবন (গায়েব) এর বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত, যেমন জিনদের জগত। মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতার করলে জিন ও শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হয়। জাদুটোনা, হিংসা ও আছর করার মাধ্যমে জিন নানা ধরনের মানসিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন- দুঃখ-দুর্দশা, বিষণ্ণতা , উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

- 'মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।' (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৪৯)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।' (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩:৩৬-৩৭)

এই সহচর শয়তান যে আমাদের মানসিক সুস্থতার ক্ষতি করতে পারে, তা নিয়ে আমরা শয়তান ও জিনের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও। সৌদি আরবের ধর্মীয় চিকিৎসকরা (রাকী) জানিয়েছেন যে বদ নজর, জাদুটোনা বা জিন আছরের কারণে যেসব উপসর্গগুলো বেশি দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা রকম মানসিক সমস্যা; যেমন- উদ্বিগ্নতা, ঘোরাচ্ছন্ন অবস্থা (অবসেশন) এবং রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আতংক। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে অনিদ্রা, হতাশাবাদী চিন্তা, বিদ্বেষ ও ঝগড়াঝাটি (প্রধানত স্বামী-স্ত্রী বা সতীনদের মধ্যে), বিবাহবিচ্ছেদ, অস্থিরতা, খিঁচুনি, মানসিক অশান্তি, বিভ্রম (altered consciousness), অস্বাভাবিক নড়াচড়া ও নানাবিধ দৈহিক সমস্যা।[১৫]

১৪.৪ ধর্মপরায়ণতা ও মানসিক সুস্থতা

ধার্মিকতা/আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহের এক মহাবিস্ফোরণ দেখা গেছে। অধিকাংশ গবেষণায় এসেছে যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। অনেক গবেষণায় এসেছে, যারা অধিক ধর্মপ্রাণ ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন তারা অন্যদের তুলনায় ভালো মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হন। পাঁচশোর বেশি স্টাডিতে ধর্ম/আধ্যাত্মিকতা এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য ও 'ভালো থাকা'র মধ্যে লক্ষণীয় ইতিবাচক সম্পৃক্ততা পাওয়া

---

[১৪] Al-Jawziyyah, 2000, p. 6.

[১৫] al-Habeeb, T. A., 2004, Pilot study of faith healers' views on the evil eye, jinn possession, and magic in Saudi Arabia, retrieved March 3, 2010 from http://www.daarussalaam.com/A-STRARAGIES/A15mass/09PilotStudy.pdf.

গেছে। বিশেষ করে, তুলনামূলক বিষণ্ণতায় কম আক্রান্ত হওয়া, দ্রুত বিষণ্ণতা থেকে সেরে উঠা, কম উদ্বিগ্নতা, কম আত্মহত্যার হার ও মাদকদ্রব্য ও ড্রাগস অপব্যবহারের কম হার, এগুলো রয়েছে। 'ভালো থাকা' বলতে অন্যদের তুলনায় অধিক আশাবাদী মানসিকতা, ইতিবাচক চিন্তা, জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া, সুখী ও স্থিতিশীল বৈবাহিক জীবন, উন্নত সামাজিক সমর্থন লাভ ইত্যাদি বিষয়কে বোঝায়।[১৬]

যদিও এসব গবেষণার অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ছিলেন পশ্চিমা খ্রিষ্টান; তবে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে পরিচালিত বিভিন্ন স্টাডির সাম্প্রতিক লিটারেচার রিভিউ হতে জানা যায় যে, ধার্মিকতা/আধ্যাত্মিকতা মুসলিমদেরও মানসিক স্বাস্থ্যের উপকার পৌঁছায়।[১৭] বেশ কিছু সূচকের (ভ্যারিয়েবল) মাধ্যমে এখানে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে; যেমন: অধিকতর সুখী জীবন, 'ভালো থাকা', জীবনে পরিতৃপ্তি, ইতিবাচক ও আশাবাদী মানসিকতা। নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যে সূচক হিসেবে দেখা হয়েছে কম বিষণ্ণতা, উদ্বিগ্নতা, মৃত্যুভয়, অসামাজিক ব্যবহার ও আত্মহত্যার হার। সারকথা হলো, যে সকল মুসলিমরা ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন এবং দীন পালন করেন তারা অন্যদের তুলনায় অধিকতর সুখী ও সুস্থ।

যেমন বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে, যারা আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন এবং একজন প্রেমময়, যত্নবান, সাহায্যকারী ও নির্ভরযোগ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহকে অনুভব করেন; তারা অন্যদের তুলনায় কম নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা , উদ্বেগ অনুভব করেন। তারা অন্যদের তুলনায় জীবনের বিভিন্ন ধকলপূর্ণ (স্ট্রেস) পরিস্থিতিতে সহজে মানিয়ে নিতে পারেন, যেমন- সাধারণ অসুস্থতা থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যন্ত যেকোনো স্ট্রেস। তাদের মধ্যে ড্রাগসের অপব্যবহার কম।

যত বেশি ধর্ম ও মানসিক সুস্থতার মধ্যে সম্পৃক্ততা আবিষ্কৃত হচ্ছে ততো বেশি মানুষ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন; শুধুমাত্র রোগ নিরাময়ের জন্যেই নয় বরং মানসিক অসুস্থতা প্রতিরোধক হিসেবেও ধর্মকে দেখছেন তারা। ইসলামি দৃষ্টিকোণ মতে, এই বুঝটাই মানব স্বভাব এবং জীবনে সফলতার মৌলিক বিষয়। কেউ যত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে, সে তত বেশি সৎকর্মশীল হবে, এবং নিজের অস্তিত্বকে মর্যাদার স্থানে নিয়ে যাবে।

যেসব সমাজে নানা ধরনের সামাজিক ব্যাধি ও আধ্যাত্মিকতার ঘাটতি দেখা যায় সেখানে এই দুটোর সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা কুরআনে এসব সমাজের 'শিফা' (নিরাময়) দিয়ে রেখেছেন, যা সকলের জন্যই সহজলভ্য। এমনকি যারা বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন, তারাও আল্লাহর রহমতের উপর সুধারণা

---

[১৬] Koenig, H. G., McCullough, M. E., & Larson, D. B., 2001, Handbook of Religion and Health, Oxford: Oxford University Press, pp. 97-203. Koenig, H. G., 2008, Medicine, Religion, and Health: Where Science and Spirituality Meet, West Conshohocken, PA: Templeton Foundation Press, pp. 68-81.
[১৭] Utz and Oman, forthcoming [2011].

পোষণ করে তওবার মাধ্যমে তাঁর দিকে ফিরে আসতে পারেন এবং নিরাময়ের জন্য তাঁর উপর ভরসা করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে হিদায়াতের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন কারণ হিদায়াতের মাধ্যমেই সত্যসন্ধানী ব্যক্তি সত্য ও রূহের প্রয়োজনীয় খোরাক লাভ করেন, তিনি বলেছেন,

- 'যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।' (সূরাহ ইসরা, ১৭:১৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৪১)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সেপথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:১০৮)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দূর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।'

  (সূরাহ যুমার, ৩৯:২২)

||অধ্যায় পনেরো||
কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি

সাইকোথেরাপির সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়:

দুইপক্ষের মধ্যে সংঘটিত একটি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ, যেখানে প্রত্যেক পক্ষে সাধারণত একজন ব্যক্তি থাকেন, তবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিও থাকতে পারেন। দুই পক্ষের যেকোনো এক পক্ষের দুর্দশা লাঘবের জন্য তারা একত্রিত হন। এক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত যে কোনো একটিতে অথবা সবকয়টিতে সমস্যা থাকতে পারে—বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতায় (চিন্তাগত সমস্যা), অনুভূতির সক্ষমতায় (আবেগিক অসুস্থতা বা যন্ত্রণা), কিংবা আচরণগত সক্ষমতায় (আচরণগত সমস্যা)। এক্ষেত্রে থেরাপিস্টকে ব্যক্তিত্বের (পারসোনালিটি) উৎস, বিকাশ, পরিচর্যা ও পরিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্ব জানতে হবে; এসব তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত যৌক্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ জানতে হবে এবং থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করার জন্য পেশাদার ও আইনী অনুমোদন লাগবে।[১]

সাইকোথেরাপির বিভিন্ন পদ্ধতির সংখ্যা কমপক্ষে ২৫০ টি। সবমিলিয়ে এগুলোর সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে যাবে।[২] অধিকাংশ সাইকোথেরাপিস্ট কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাধারার প্রতি কঠোরভাবে সংযুক্ত থাকেন না; বরং তারা পরিস্থিতি, কার্যকারিতা এবং ক্লায়েন্টের অবস্থাভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাই করে প্রয়োগ করেন।

যে সকল সাইকোলজিস্টরা থেরাপি প্রদান করেন তারা সাধারণত ক্লিনিক্যাল বা কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ে চার-পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর গ্রাজুয়েট হন। সেটা হতে পারে পিএইচডি (ডক্টর অফ ফিলোসফি) অথবা Psy.D (ডক্টর অফ সাইকোলজি)। পিএইচডি ডিগ্রীতে গবেষণার উপর প্রশিক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও থেরাপি বিষয়ে জোর দেয়া হয়। Psy.D একটি ফলিত ডিগ্রী, এখানে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সাধারণত বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগীদের নিয়ে কাজ করেন। মানসিক রোগের পরিসীমা বেশ ব্যাপক। মানিয়ে চলার সমস্যা (এডজাস্টমেন্ট প্রবলেম) থেকে শুরু করে ডিপ্রেশন, একটুতেই উদ্বিগ্নতা থেকে নিয়ে সিজোফ্রেনিয়া পর্যন্ত অসুখবিসুখ এর অন্তর্ভুক্ত। কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্টরা সাধারণত

---

[১] Corsini, R.J., 2000, Introduction, In Corsini, R.J., & Wedding, D. (Eds.), Current Psychotherapies. Itasca, IL: F. E. Peacock Publishers, Inc., p. 1.
[২] Ibid., p. 10.

এডজাস্টমেন্ট প্রবলেম, লাইফ স্ট্রেস জাতীয় সমস্যাগুলো বেশি দেখে থাকেন। তাদের মনোযোগের কিছু বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সেলিং কিংবা বৈবাহিক ও পারিবারিক কাউন্সেলিং ইত্যাদি।

আর সাইকিয়াট্রিস্টরা হলেন পুরোদস্তুর ডাক্তার। ঔষধপত্রের প্রেসক্রিপশন প্রদানের জন্য তাদের লাইসেন্স রয়েছে এবং তারা মূলত চিকিৎসা করেন মানসিক রোগের দৈহিক কারণগুলোর। সাইকোলজিস্টদের মতো তারাও সাইকোথেরাপি দিতে পারেন। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এমডি (MD) ডিগ্রিধারী এবং মেডিকেল স্কুল শেষ করার পর 'রেসিডেন্ট' হিসেবে পূর্ণ তিন বছর কোনো একটি 'মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে' কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যদিও বর্তমানে কিছু দেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সাইকোলজিস্টদেরও ঔষধপত্রের প্রেসক্রিপশান দেবার অনুমতি রয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্টদের অধিকাংশ ট্রেনিংপদ্ধতি সেক্যুলার চিন্তাধারার। পশ্চিমা দেশে প্রশিক্ষণ শেষে যখন তারা মুসলিমপ্রধান দেশে প্র্যাকটিস শুরু করেন, তখন দেখা দেয় নানারকম সমস্যা। কেননা, চিকিৎসকের দেয়া কাউন্সেলিং এর সাথে ক্লায়েন্টের চাহিদার একটা অসামঞ্জস্য রয়েই যায়।

১৫.১ সাইকোথেরাপি যেভাবে কাজ করে

মূল কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে আলোচনার আগে একটি বিষয় লক্ষ্য করা জরুরি। সকল সাইকোথেরাপি পদ্ধতিতেই অপরিহার্য শর্তটি হলো— ক্লায়েন্টের নিজেকে পরিবর্তনের ইচ্ছা ও তাড়না। অধিকাংশ মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতে, এটি না থাকলে কোনো অগ্রগতি অর্জন করা খুবই কঠিন বা অসম্ভব। সুতরাং নিজের আচরণ ও সিদ্ধান্তের দায় ক্লায়েন্টকেই নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই বিষয়টি সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

- 'তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না, সে সব নিয়ামত, যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।' (সূরাহ আনফাল, ৮:৫৩)

এই আয়াত থেকে জানা যায়, যে মানুষ নিজের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবর্তন করে সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষমতা রাখে। নিজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোকে চাইলে সে অতিক্রম করতে পারে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতিবন্ধক জয়ের সামর্থ্যও সে রাখে। কার্যকর সাইকোথেরাপির জন্য এটি একটি বুনিয়াদী দর্শন।

সাইকোথেরাপির বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে কগনিটিভ থেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপি, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা হিউম্যানিস্টিক থেরাপি, সাইকো-এনালাইসিস ও এক্সিসটেন্সিয়াল সাইকোথেরাপি। সাইকোথেরাপি নানানভাবে করা যায়, যেমন- এককভাবে বা গ্রুপ হিসেবে অথবা পারিবারিকভাবে। সাইকোথেরাপি অধিকাংশ তত্ত্বই

সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে উঠেছে, (কোনো নির্দিষ্ট শিরোনাম বা প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে), যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে সাইকোথেরাপিকে কার্যকর ভাবা হয়। প্রত্যেক চিন্তাধারার নিজস্ব সাইকোথেরাপি পদ্ধতি রয়েছে। তবে কর্সিনি (Corsini) কিছু রূপরেখা নির্ধারণ করেছেন যা মানুষের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জরুরি। সেগুলো হলো:

কগনিটিভ বা বুদ্ধিমত্তা প্রভাবক:

১। সার্বজনীনতা: যখন ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে যে সে একা এই সমস্যার ভুক্তভোগী নয়, বরং আরও অনেক মানুষের একই সমস্যা রয়েছে, তখন তার অবস্থার উন্নতি হয়। তাকে বুঝতে দিতে হবে যে, এমন সমস্যায় সে একা ভুগছে না, তার মতো আরো অনেকেই আছে।

২। অন্তর্দৃষ্টি: ক্লায়েন্ট যখন নিজেকে ও আশেপাশের মানুষকে বুঝতে শিখবে, তখন তার অবস্থার উন্নতি হতে থাকবে। নিজের অভিপ্রায়, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও আচার-আচরণকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা তাকে জীবনের ভিন্ন অর্থ দেখাবে।

৩। মডেলিং (নমুনা প্রদর্শন): মানুষ অন্যান্যদের দেখে ও অনুকরণের মাধ্যমে শিখে থাকে।

আবেগিক প্রভাবক:

১। গ্রহণযোগ্যতা: যখন ক্লায়েন্ট অনুভব করে যে সে কারো কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ইতিবাচক মনোযোগ লাভ করছে, বিশেষত থেরাপিস্টের কাছ থেকে; তখন অপেক্ষাকৃত ভালো বোধ করে।

২। পরোপকারিতা: যখন ক্লায়েন্ট থেরাপিস্ট বা গ্রুপের অন্য সদস্যের কাছ থেকে ভালোবাসা ও যত্ন পায়; কিংবা নিজেই অন্যদের ভালোবাসে ও যত্ন করে এবং অনুভব করে যে সে অন্যের উপকার করছে, তখন এর ফলাফল হিসেবে তার নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটে।

৩। স্থানান্তরকরণ (Transference): যখন একাধিক ক্লায়েন্ট নিজেদের পারস্পরিক আবেগ বুঝতে পারে অথবা থেরাপিস্টের সাথে ক্লায়েন্ট আবেগিক সম্পর্ক অনুভব করে তখন অবস্থার উন্নতি হয়।

আচরণগত প্রভাবক :

১। বাস্তবতা যাচাই: যখন থেরাপিস্ট ক্লায়েন্টকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে আচরণ পরীক্ষণ করে এবং ক্লায়েন্ট একটা অবলম্বন ও ফিডব্যাক লাভ করে, তখন পরিবর্তন সম্ভব হয়।

২। আবেগের বহিঃপ্রকাশ (Ventilation): নিজের ভেতরে জমে থাকা আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ক্লায়েন্ট কখনো চিৎকার, কান্নাকাটি অথবা

রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যদি সে দেখে তার এসব আচরণ মেনে নেয়া হচ্ছে, তখন পরিবর্তন ঘটে।

৩। মিথস্ক্রিয়া: অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে, যদি ক্লায়েন্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারে যে তার আচরণে কিছু একটা ভুল বা সমস্যা রয়েছে।[৩]

মজার ব্যাপার হলো গবেষকগণ এই তিনটি প্রভাবককে এভাবে সহজ করে ফুটিয়ে তুলেছেন: 'নিজেকে জানো, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো এবং ভালো কাজ চালিয়ে যাও' ('Know thyself, love thy neighbour, and do good works.')[৪]

সেক্যুলার পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, বিশেষত স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে। রিচার্ড ও বার্জিন এর মতে, এটি মনোঃচিকিৎসক ও গবেষকদের জন্য সমাধান-অযোগ্য সমস্যা তৈরি করে। তারা বলেন যে:

> 'বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ'[৫] মানবসত্তার একটি অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। ফলে এর উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের থিওরি এবং থেরাপির পদ্ধতি গড়ে তোলা কঠিন। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ মতবাদের সংকীর্ণতা ও একপেশে মনোভাবের কারণে থেরাপিস্ট ও গবেষকদের কাছে অনেক তাত্ত্বিক (কনসেপচুয়াল) ও ব্যবহারিক (ক্লিনিকাল) সম্ভাবনার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। পরিশেষে, 'বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ' বিশ্বের প্রধান ঈশ্বরবাদী ধর্মসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে ধার্মিক ক্লায়েন্টদের জন্য সাইকোথেরাপি পদ্ধতি প্রদানে এই মতবাদ ব্যর্থ, যা তাদের সংস্কৃতির সাথে যায়।[৬]

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে, সেক্যুলার সাইকোথেরাপি পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে যদিও মানবিক দুঃখ-দুর্দশার কিছু উপশম করা যায়, কিন্তু মানুষের আত্মিক চাহিদা ও আত্মার জটিলতাকে ব্যাখ্যা করতে এটি ব্যর্থ। এসব চিন্তাধারার সমালোচনা করে বাদরি বলেন:

> 'এসব মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা (বিহেভিয়ারিজম, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও নিউরোসাইকিয়াট্রি) এবং আবেগ-বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতাকে জোরপূর্বক অতিসরলীকরণের যে চেষ্টা তারা করছে, তা ব্যর্থ হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে যে সন্তোষজনক ফলাফল আসেনি, তা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। যদিও মানব আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে বহু বছর ধরে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে সেক্যুলার বিজ্ঞান; কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগের উৎসাহ (optimism) আজকে উধাও। পশ্চিমা সমাজের সামাজিক ও মানসিক সমস্যার (ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ) সম্ভবত একমাত্র সূচক যা তাদের দ্রুত বর্ধমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গ্রাফকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাদের এই ব্যর্থতা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, মানুষের আধ্যাত্মিক দিকগুলো ও

---

[৩] Ibid., pp. 9-10.

[৪] Ibid.

[৫] সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ হচ্ছে এরকম একটা দর্শন যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাই প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই সরাসরি বা ইনডিরেক্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, এমনকি মনোজগতও। এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। -সম্পাদক

[৬] Richards & Bergin, 2005, p. 41.

মনস্তত্ত্ব এতই জটিল যে এগুলোকে নিছক গবেষণাগারের কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট ও ভৌত পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুযোগ নেই।'[৭]

মানসিক যন্ত্রণা ও অসুস্থতার পিছনের কারণটা মূলত আধ্যাত্মিক, আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশ থেকে দূরত্ব থেকে এর সৃষ্টি—এই কথাটি বুঝলে আমরা সহজেই বের করতে পারব যে, নিরাময় কোথা থেকে হবে। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মতে, থেরাপির চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবলমাত্র ক্লায়েন্টের চিন্তাচেতনা, আবেগ বা আচরণের পরিবর্তন ঘটানো নয়; বরং তার আত্মার উপর প্রভাব ফেলা। এই প্রভাবের ফলশ্রুতিতে ক্লায়েন্টের সত্তার অন্যান্য উপাদানগুলো পরিবর্তিত হবে। সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য আবর্তিত হবে ক্লায়েন্টের আধ্যাত্মিক উন্নতিকে কেন্দ্র করে। আধ্যাত্মিক দিকগুলোতে মনোযোগ দিলে স্থায়ী ও কার্যকর ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, এটি সেক্যুলার পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি। সেক্যুলার পদ্ধতিতে সমস্যার মূল কারণ আলোচনার পরিবর্তে উপসর্গের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়। ফলে সাধারণত সেগুলোর ফলাফল হয় ক্ষণস্থায়ী।

১৫.২ ধর্মীয় সাইকোথেরাপি (religious or theologicalpsychotherapy)

মানসিক রোগের চিকিৎসায় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব মূলধারার পশ্চিমা মনোবিজ্ঞান স্বীকার করছে, এবং এই প্রবণতা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮] একইভাবে সাইকোথেরাপির পদ্ধতিতেও (psychotherapeutic process) ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা দেখা যাচ্ছে। তারা মেনে নিচ্ছেন মানসিক সমস্যার সমাধানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।[৯]

কিছু গবেষক ধর্মীয় বিষয়কে সাইকোথেরাপি প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করে একটি নতুন পরিভাষা চালু করেছেন। তারা এর নাম দিয়েছেন 'ঈশ্বরবাদী সাইকোথেরাপি' (Theistic psychotherapy)। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তারা এই পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে ইসলামকে তালিকাভুক্ত করেছেন। রিচার্ড ও বার্জিন (Richard and Bergin) এর মতে, এই পদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে:

ক. বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরবাদ (Scientific theism) : 'গড' বিশ্বজগতের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। মানুষ তাকে ও বিশ্বজগতকে সীমিতভাবে বুঝতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে

---

[৭] Badri, 2000, p. 5.

[৮] Richards & Bergin, 2005, pp. 6-7; Dein, S., & Loewenthal, K. M., 1998, Holy healing: The growth of religious and spiritual therapies, Mental Health, Religion & Culture, 1(2), pp. 85-89.

[৯] Pargament, K. I., Murray-Swank, N. A., & Tarakeshwar, N., 2005, An empirically based rationale for a spiritually integrated psychotherapy, Mental Health, Religion and Culture, 8(3), pp. 155-165.

বাস্তবতার কিছু অনুষঙ্গ আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপায়ে জানার প্রচেষ্টাও জরুরি।

খ. ধর্মীয় সমন্বয়বাদ (Theistic holism) : মানুষ একটি সমন্বিত আধ্যাত্মিক সত্তা। যার আছে একটি চিরস্থায়ী আত্মা বা রূহ, যেটি বিভিন্ন বাস্তব বিষয়ের সাথে ক্রিয়া করে; যেমন- দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিষয়কে এই মানবাত্মা প্রভাবিত করে। কেবলমাত্র দেহ, মন ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই মানুষকে সীমাবদ্ধ করার অবকাশ নেই।

গ. কর্তৃত্ব (agency) : নিজের আচরণের উপর নৈতিক কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার (বায়োলজিক্যাল ও পরিবেশগত) মাধ্যমে মানুষের আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হয় না। নিজ সিদ্ধান্তের পরিণতির প্রতি মানুষ দায়বদ্ধ।

ঘ. সার্বজনীন নৈতিকতা (Moral universalism) : কিছু সার্বজনীন মূল্যবোধ রয়েছে যা মানুষের স্বাস্থ্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। তবে স্থান-কাল-পাত্র ও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে এগুলোর প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

ঙ. ঈশ্বরবাদী সম্পর্ক (Theistic relationism) : মানুষ সহজাতভাবে সামাজিক ও সম্পর্ক প্রিয়। অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কেমন, তা অধ্যয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বোত্তম ধারণা লাভ করা যায়।

চ. পরোপকারিতা (Altruism) : মানুষ অনেক সময় অপরের কল্যাণের জন্য নিজের প্রাপ্তি উপেক্ষা করে। দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও পরোপকারের মতো বিষয়গুলো ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তির চেয়ে মূল্যবান।[১০]

সাইকোথেরাপির এই সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক পদ্ধতির কিছু উপকারিতার মধ্যে রয়েছে:

১। দুনিয়া ও মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

২। মানুষের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য স্বীকার করে।

৩। যন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক উপাদানের সাথে মানুষের সাদৃশ্য স্থাপন করে না।

৪। মানুষের সীমাবদ্ধ স্বাধীন কর্তৃত্ব, ইচ্ছাশক্তি ও দায়িত্বশীলতার বাস্তবতা স্বীকার করে।

৫। একটি ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামো প্রদান করে, যার ভিত্তিতে ব্যক্তির মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রার শুদ্ধতা মূল্যায়ন করা যায়।

৬। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব স্বীকার করে, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্পর্ককে (আল্লাহর সাথে) উৎসাহিত করে।

---

[১০] Richards & Bergin, 2005, pp. 98-99.

৭। আত্মত্যাগ, পরোপকারিতা এবং পরিবার-সমাজের কল্যাণে কাজ করাকে মূল্যায়ন করে।[১১]

ধর্মীয় সাইকোথেরাপির একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো, এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে একটি 'কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি' কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণত এর মাধ্যমে নিজের, অন্যের ও বিশ্ব সম্পর্কে নেতিবাচক বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যকে বদলে দেয়া হয় অধিকতর ইতিবাচক ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। এখানে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিও কাজে লাগানো হয়। গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর এসব পদ্ধতি হতে কয়েকটির কার্যকারীতা পাওয়া হয়েছে।[১২]

১৫.৩ মুসলিমদের সাথে ধর্মীয় সাইকোথেরাপি

পশ্চিমা ও ইসলামি সাইকোথেরাপির পদ্ধতির মধ্যে জাফরি চারটি মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করেছেন,[১৩]

১। **আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা বনাম ধর্মীয় পরার্থতা :** পশ্চিমা কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অর্জন, পরিতৃপ্তি, প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান, আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে ইসলামি পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতাকে বিবেচনায় আনার পাশাপাশি সমান বা অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয় পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার প্রতি, যেমনটি রয়েছে উম্মাহ ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায়। ইসলামি কাউন্সেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে নি:স্বার্থতা, পরোপকারিতা ও অন্যকে সুখী করতে উৎসাহিত করা হয়।

২। **বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বনাম সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি :** পশ্চিমা মূল্যবোধে সফলতার ভিত্তি হলো জীবনের বস্তুগত অর্জন, যেমন- শ্রেষ্ঠত্ব, সামাজিক সম্মান ও পুরস্কার অর্জন। ওদিকে

---

[১১] Ibid.

[১২] Hawkins, R. S., Tan, S. Y., & Turk, A. A., 1999, Secular versus Christian inpatient cognitive-behavioral therapy programs: Impact on depression and spiritual well-being, Journal of Psychology and Theology, 27, pp. 309-311; Johnson, W. B., 2001, To dispute or not to dispute: Ethical REBT with Religious Clients, Cognitive & Behavioral Practice, 8(1), pp. 39-47; Johnson W. B., & Ridley, C. R., 1992, Brief Christian and non-Christian rational-emotive therapy with depressed Christian clients: An exploratory study, Counseling and Values, 36(3), pp. 220-229; Johnson, W. B., DeVries, R., Ridley, C. R., Pettorini, D., & Peterson, D. R., 1994, The comparative efficacy of Christian and secular rational-emotive therapy with Christian clients, Journal of Psychology and Theology, 22(2), pp. 130-140; Peucher, D. & Edwards, K.J., 1984, A comparison of secular and religious versions of cognitive therapy with depressed Christian college students, Journal of Psychology and Theology, 12, pp. 45-54; Propst, L. R., Ostrom, R., Watkins, P., Dean, T., & Mashburn,D., 1992, Comparative efficacy of religious and nonreligious cognitive-behavioral therapy for the treatment of clinical depression in religious individuals, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(1), pp. 94-103.

[১৩] Jafari, 1993, pp. 330-333.

ইসলাম উৎসাহিত করে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই সমন্বিত উন্নয়নকে। ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি তখনই ঘটবে, যখন নিজের চিন্তা-আবেগ-আচরণকে আল্লাহর ইচ্ছামাফিক ও সন্তুষ্টি অর্জনে পরিচালিত করা হবে।

৩। লাগামহীন স্বাধীনতা বনাম নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা : পশ্চিমা কাউন্সেলিং পদ্ধতিতে (ধরে নেয়া হয়) একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে স্বাধীন; এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ধর্মীয় বা নৈতিক সীমাবদ্ধতা নেই। লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশ্বস্ততার অভাব, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদি প্রয়োজন হলে, তাও করা যায় অবলীলায়। অপরদিকে ইসলামি মানদন্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করে শরিয়াহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে। ব্যক্তিজীবন ও জনজীবন উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামে বৈধ-অবৈধ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত; যা বাস্তবায়িত হয় জবাবদিহিতার মাধ্যমে।

৪। অপরাধবোধ যুক্তিযুক্তকরণ বনাম তাওবা (Guilt Rationalization versus Repentance) : পশ্চিমা কাউন্সিলিং পদ্ধতিতে ব্যক্তির সকল অন্যায়-অপরাধকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন প্রদান করা হয়, যেন ব্যক্তি অপরাধবোধের গ্লানি থেকে মুক্তি পায়। সবকিছু নিঃশর্তে ইতিবাচক হিসেবে মেনে নেয়া হয়, ক্লায়েন্টকে সাহায্য-সমর্থন ও সমবেদনা প্রদান করা হয়। ইসলামি পদ্ধতিতে গুনাহের কাজকে উপেক্ষা করা বা সমর্থনের কোনো সুযোগ নেই; বরং তাওবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে নিজের ভুল সংশোধন ও আচরণ উন্নয়নের আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রদান করা হয়।[১৪]

উল্লেখিত কারণে সাইকোথেরাপিকে এমনভাবে সাজানো প্রয়োজন, যেন এটা মুসলিম ক্লায়েন্টদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানানসই হয়। বিভিন্ন গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে দেখা গেছে, মুসলিম ক্লায়েন্টদের এংজাইটি, ডিপ্রেশন ও অন্যান্য কষ্ট লাঘবের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাইকোথেরাপি ফলদায়ক হয়।[১৫] এ ধরনের প্রত্যেকটি স্টাডিতে দেখা গেছে, ধর্মীয় সাইকোথেরাপি গ্রুপের ক্লায়েন্টরা সাধারণ ক্লায়েন্টদের থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অধিক দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করেছেন। ইসলামি সাইকোথেরাপিতে কগনিটিভ থেরাপিরই একটি ধরন ব্যবহার করা হয়, এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলোকে পরিবর্তন ও সংশোধন করে ইসলামি চিন্তাধারার (কুরআন ও সুন্নাহ) মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা হয়।[১৬] ক্লায়েন্টের অসুস্থতার সাথে সম্পৃক্ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করা

---

[১৪] Ibid.

[১৫] Azhar, M. Z., Varma, S. L., & Dharap, A. S., 1994, Religious psychotherapy in anxiety disorder patients, Acta Psychiatrica Scandinavica, 90(1), pp. 1-3; Azhar, M. Z., & Varma, S. L., 1995a, Religious psychotherapy in depressive patients, Psychotherapy and Psychosomatics, 63, pp. 165-168; Azhar, M. Z., & Varma, S. L., 1995b, Religious psychotherapy as management of bereavement, Acta Psychiatrica Scandinavica, 91(A), pp. 233-235; Razali, S.M., Hasanah, C. I., Aminah, K., & Subramaniam, M., 1998, Religious-sociocultural psychotherapy in patients with anxiety and depressions Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 32(6), pp. 867-872.

[১৬] Azhar et al., 1994, pp. 1-3; Azhar et al., 1995b, pp. 233-235.

যেতে পারে, যেমন- কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহর মাধ্যমে নিজের লাইফস্টাইল সংশোধন করা যায় ইত্যাদি। ক্লায়েন্ট পাপের কারণে অনুতপ্ত হলে তাকে তাওবার জন্য উৎসাহিত করা যায়।[১৭]

অত্র গ্রন্থের লেখক (ড আইশা হামদান) ইসলামি পদ্ধতিসমূহ থেকে বেশকিছু উপকারী রূপরেখা নির্ণয় করেছেন যা ধর্মীয় ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপি পদ্ধতির সাথে সমন্বয় করা যায়।[১৮] এগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতা উপলব্ধি করা,

২। আখিরাতের উপর মনোযোগ প্রদান করা,

৩। দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও প্রভাব নিয়ে চিন্তা করা,

৪। আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করা, এবং

৫। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের উপর মনোযোগ দেয়া।

মূলত এই পয়েন্টগুলো ইসলামি আকিদার বিভিন্ন উপাদান, যা মানুষের আত্মার খোরাক। মানব আত্মা এসবের জন্যই আকুতি জানিয়ে যাচ্ছে দিনরাত।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাইকোথেরাপির আরেকটি লক্ষ্য হলো, আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ করা, যেন এর মাধ্যমে মানসিক অসুস্থতা ও জীবনের কঠিন পরিস্থিতিগুলো মানিয়ে (কোপিং) নেওয়া যায়। সাইকোথেরাপি চলাকালে মুসলিম ক্লায়েন্টকে বিভিন্ন ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যেমন- নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আজকার, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও অধিক দুআ করা ইত্যাদি। সার্বিকভাবে এ সকল পদ্ধতি ব্যক্তিকে অধিকতর স্বস্তি ও 'ভালো থাকা'র অনুভূতি প্রদান করবে।[১৯] ধর্মীয় সাইকোথেরাপির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, কার্যধারা এবং ফলাফল উঠে আসবে, যাতে করে মুসলিম ক্লায়েন্টরা আরও উপকৃত হবে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

১৫.৪ রুকইয়া

আমরা আগেই জেনেছি, রুকইয়া একটি ইসলামি চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে যথাযথ ক্রমানুসারে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও দুআ পাঠের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময়ের প্রচেষ্টা করা হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। রুকইয়া কার্যকর হবার জন্য শুরুতে সঠিক সমস্যা চিহ্নিত করা জরুরি। কেননা, সমস্যার ভিত্তিতে তিলাওয়াতকৃত আয়াত ও দুআর তারতম্য ঘটে। যেমন বলা যায়, জাদুটোনার চিকিৎসা

---

[১৭] Hamdan, A., 2008b, Cognitive restructuring: An Islamic perspective, Journal of Muslim Mental Health, 3(1), p. 103.

[18] Ibid., pp. 104-108.

[১৯] Azhar et al., 1994, pp. 1-3; Azhar et al., 1995a, pp. 165-168; Azhar et al., 1995b, pp. 233-235.

বদনজর ও জিনে আছরের চিকিৎসা থেকে ভিন্ন। আধ্যাত্মিক বা গায়েবী সমস্যাসমূহ নিরাময়ের জন্য শুধুমাত্র রুকইয়াই যথেষ্ট। আর অন্যান্য শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এর পাশাপাশি রুকইয়া ব্যবহার করা যায়। এই প্রক্রিয়া কার্যকর হওয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব (রাকী) প্রয়োজন, এবং তার তাকওয়া যত উন্নত পর্যায়ের হবে রুকইয়া কার্যকর হবার সম্ভাব্যতা তত বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবে যদি কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের রুকইয়া করতে পারেন সেটাই সর্বোত্তম; কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তির অসুস্থতা ও পরিস্থিতির তীব্রতা অনুসারে সেটা সম্ভব নাও হতে পারে।

আল-ক্রেনাবী এবং গ্রাহাম (Al-Krenawi and Graham) মন্তব্য করেছেন যে, আরব ক্লায়েন্টরা প্রায়ই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পাশাপাশি প্রথাগত (ধর্মীয়) নিরাময় পদ্ধতি যুগপৎভাবে গ্রহণ করেন। সাধারণত প্রথাগত (ধর্মীয়) নিরাময় পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয় আগে, এরপর আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নেয়া হয়। এসব প্রক্রিয়াতে পরিবারের সদস্যরাও অন্তর্ভূক্ত থাকেন এবং তারা ক্লায়েন্টকে উপযুক্ত সেবা বেছে নিতে সাহায্য করেন। লেখকদ্বয় মন্তব্য করেছেন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড অনুসারে ক্লায়েন্টকে সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথাগত (ধর্মীয়) নিরাময় পদ্ধতিকে যুক্ত করতে হবে।[২০]

সৌদি আরবে ধর্মীয় চিকিৎসকদের (রাকী) মধ্যে পরিচালিত একটি স্টাডিতে দেখা গেছে বদনজর, জাদুটোনা এবং জিনে আছরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে চিকিৎসা বাতলে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো রুকইয়া। অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত সালাত আদায়ের নির্দেশনা প্রদান; জিন তাড়ানো, রূপক দৈহিক শাস্তি প্রদান ও শ্বাস আটকানোর ভান করা, দম দেয়া (জিনে আছরের ক্ষেত্রে), ভেষজ উপাদান মিশ্রিত পানি পান করানো, কুরআনের আয়াত লিখিত পানি পান করানো (বিশেষত জাদুটোনার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি।[২১]

মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য হাদিসে বিভিন্ন দুআ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমারই এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ সর্বদা কার্যকর। আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে চাইছি যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা যে নাম তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে নাম শিখিয়েছ অথবা নিজের জন্য হিফাজত করে রেখেছ, আমি তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা করি যে তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার অন্তরের জন্যে

---

[২০] al-Krenawi, A., & Graham, J. R., 2000, Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings, Health & Social Work, 25(1), p. 18.

[২১] al-Habeeb, 2004.

প্রশান্তি, বক্ষের আলো, আমার চিন্তা ভাবনা অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরকারী। (আহমাদ, তাবারানি, উত্তম সনদে বর্ণিত)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কষ্টের সময় বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ নেই, যিনি সুমহান ও সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, যিনি আকাশমণ্ডুলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি।'(বুখারি ও মুসলিম)

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুআ করতে শুনেছেন,'ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকদের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।'(বুখারি)

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান যুগে ঈমানি দুর্বলতার কারণে লোকেরা শরিয়ত সম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি বর্জন করেছে এবং নানা ধরনের মেডিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতির উপরই কেবল নির্ভর করছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশাও সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু উপকার লাভ হলেও তাওহিদের দাবি হলো, সর্বদা এই বিশ্বাস অন্তরে রাখা যে নিরাময় একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করেই নিরাময় করা হোক না কেন। যদি বলা হয় অমুক ঔষধের মধ্যে নিরাময় আছে বা অমুক চিকিৎসক নিরাময় করেছেন, তাহলে এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য ঈমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, অথচ বিষয়টি আমরা ভুলে গেছি! যখন ঈমান বিশুদ্ধ ও মজবুত হবে, তখন রুকইয়া করলে আল্লাহর রহমত ও ইচ্ছা অনুসারে নিরাময় লাভ হবে দ্রুত ও মজবুতভাবে।

||অধ্যায় ষোল||
শান্তিময় নির্মল জীবন

একটি শান্তিময় নির্মল জীবন অর্জনের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া লিখেছেন:

> অন্তরের বিশুদ্ধতা, সফলতা, আনন্দ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, সকল পরিস্থিতিকে উপভোগ করা, প্রশান্তি ও নির্মলতা ইত্যাদি অর্জিত হবে কেবলমাত্র মহান রবের ইবাদাত, ভালোবাসা ও তাওবার মাধ্যমে। এছাড়া সৃষ্টবস্তু থেকে যদি সমস্ত রকমের আনন্দ উপভোগ করাও হয়, তবুও অন্তরে প্রশান্তি ও নির্মলতা মেলে না। কেননা, রবের সান্নিধ্যের চাহিদা আমাদের অন্তরে খোদিত। তিনিই অন্তরের উপাস্য, ভালোবাসা ও সাধনা। অন্তর আনন্দ, তৃপ্তি, সুখ, নিরাপত্তা, নির্মলতা ও প্রশান্তি অর্জন করে কেবল আল্লাহর সান্নিধ্যে।[১]

১৬.১ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

'তাওয়াসসুল' শব্দের অর্থ 'অনুসন্ধানকৃত ও কাঙ্খিত বিষয়ের নৈকট্য অর্জন।'[২] এই শব্দটি 'আল-ওয়াসিল' (যে কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে) এবং 'আল-ওয়াসিলা' (যার মাধ্যমে কোনো কিছুর নৈকট্য অর্জন করা যায়) শব্দের কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে।[৩] আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে কুরআনে এই ধারণার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:

- 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৩৫)

ওলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমই হলো তাঁর আনুগত্য ও তাঁর পছন্দনীয় আমল করা। কোনো কাজকে তখনই নেক কাজ ও আল্লাহর নিকট সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করা হবে, যদি সেখানে দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করা হয়:

১. নিয়ত হতে হবে বিশুদ্ধ ও আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য।

---

[১] Ibn Taymiyyah, 1999, p. 121.
[2] al-Albaanee, M. N., 1995, Tawassul — Seeking a Means of Nearness to Allah: Its Types and Its Rulings, Birmingham, U.K: Al-Hidaayah Publishing and Distribution, p. 2.
[৩] Ibid., p. 2.

২. সেটি অবশ্যই কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে।[৪] যদি কোনো আমলে এই দুটি শর্ত পূরণ করা না হয় তাহলে সেগুলো আল্লাহর নিকট সন্তোষজনক নয় এবং কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাওয়াসসুল সম্পর্কে শায়খ আলবানি (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

তিনটি বিশেষ মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে যা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে।

১। আল্লাহর উত্তম গুণবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্য সমূহের মাধ্যমে।

২। ব্যক্তিগত নেক আমলের মাধ্যমে, এবং

৩। (জীবিত) নেক ব্যক্তির দুআর মাধ্যমে,

তিনি উল্লেখ করেছেন, এর বাইরে অন্যান্য পদ্ধতির তাওয়াসসুল জায়েজ নয়।[৫]

আল্লাহ তাআলা , তাঁর অসীম রহমত অনুসারে এমন সব ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে, লাভ করতে পারে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি । একমাত্র আল্লাহর নির্ধারিত পথের মাধ্যমেই উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। এটিই একমাত্র রাস্তা। অন্য সকল পদ্ধতি মিথ্যা ও নিরর্থক। যদি কেউ দাবি করে সে নতুন কোনো অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যার মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব; তবে সে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন,

- '...আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।...' (সূরাহ মায়িদা, ৫:৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমি এমন কোনো নির্দেশনা প্রদান করতে বাকি রাখিনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর এমন কোনো সর্তকতা প্রদান করতে বাকি রাখিনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে।' (আল-হাদ্দাদ ও আল-হাকিম, সনদ নির্ভরযোগ্য)।

ইসলামের মাধ্যমে পূর্বে নাজিলকৃত বিষয়ের সত্যায়ন করা হয়েছে ও পূর্ববর্তী বিধানসমূহ রহিত হয়ে গেছে। কেননা, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদানকৃত চূড়ান্ত মনোনীত দ্বীন। অন্য কোনো সিস্টেম বা জীবনবিধান ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামকে পরিবর্তন বা অপসারণ করা যাবে না। এই দাবির দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল নব আবিষ্কৃত বিষয় (বিদআত) প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। মানুষ দ্বীনের মধ্যে যত নতুন বিষয়ে প্রচলনের চেষ্টা করবে, সব বাতিল।

---

[৪] Ibid., p. 7.

[৫] Ibid., p. 38.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে অসীয়াত করছি, আর আনুগত্য দেখাতে অসীয়াত করছি; যদি কোনো গোলামও তোমাদের শাসক হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি মেনে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখ; আর নব উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বিদআত, প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযি)

স্ট্রেস, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি নিরসনের জন্য দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ কোনো নির্দিষ্ট প্র্যাকটিস বা পদ্ধতি অনুসরণ করলেই সেটা সবচেয়ে উপকারী প্রমাণ হয়ে যায় না। হোক সেটা কোনো ইবাদাত মূলক কর্মকান্ড কিংবা 'স্বস্তি' পাবার অন্য কোনো পদ্ধতি কিংবা কোনো 'স্পিরিচুয়ালিটি' (আধ্যাত্মিকতা) উন্নয়ন প্রক্রিয়া। অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে এগুলো মানবতার জন্য সবচেয়ে উপকারী পদ্ধতি। তবে হ্যাঁ, সেগুলোর মধ্যে কিছু দৈহিক, মানসিক বা জ্ঞানগত (কগনিটিভ) উপকারিতা থাকতেই পারে। কিন্তু সেগুলো সীমাবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট সীমার বাইরে উপকার পৌঁছাতে পারেনা। যেমন ধরুন, মানসিক ভারাক্রান্ত কোনো ব্যক্তি একটি আরামদায়ক চেয়ারে বসে হাত পা ছড়িয়ে দেহের বিভিন্ন পেশি 'রিলাক্স' করতে পারে, (প্রগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশন) এরপর সে অবশ্যই কিছুটা আরাম অনুভব করবে। একইভাবে, কোনো ব্যক্তি বনে জঙ্গলে হাঁটতে যেতে পারে অথবা মনে মনে কল্পনা করতে পারে সে একটি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতেও সে কিছুটা প্রশান্তিদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই উপকারগুলো অস্বীকার করছি না, এগুলো আল্লাহ তাআলার সেই অসীম রহমতের অংশবিশেষ যা তিনি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল বান্দাদের জন্যই দিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এসব পদ্ধতি কৃত্রিম এবং আমাদের রূহের গভীরতম পর্যায়ে পৌঁছাতে অক্ষম। আর এসব পদ্ধতির মাধ্যমে কিছুতেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় না। বরং কিছু ক্ষেত্রে এগুলো ক্ষতিকর রূহের জন্য। কেউ 'প্রগ্রেসিভ মাসল রিলাক্সেশন' বা নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্র পাঠ করে ধ্যান (মেডিটেশন) করার দ্বারা যদি মনে করে এসবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করছে, তবে এ ধরনের আমল কিছুতেই আল্লাহ কবুল করবেন না। বরং এগুলো উক্ত ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আবার, কোনো ব্যক্তি যদি কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে এবং মৃত ব্যক্তির কাছে দুআ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়, এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত, শিরকের পর্যায়ভুক্ত। যদি ঐ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে সে অনন্তকাল জাহান্নামী হবার ঝুঁকি নিল।

কোনো ব্যক্তির যে ধর্মেরই হোক না কেন, প্রার্থনার মাধ্যমে সে কিছু উপকারিতা লাভ করবে। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতির ব্যবহার মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকেই হয়ে আসছে।

আধ্যাত্মিক স্টাডির সাথে সম্পর্কিত হলেও, সুনির্দিষ্ট গবেষণার মাধ্যমে গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে প্রার্থনা একজন ব্যক্তিকে নানাভাবে উপকৃত করে। যারা নিয়মিত ইবাদাত-বন্দেগী করেন, তাদের জীবন অধিকতর নির্মল ও প্রশান্তিদায়ক। জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তারা সহজে মেনে নিতে পারেন এবং তুলনামূলকভাবে কম বিষণ্ণতা ও মানসিক চাপে ভোগেন। যারা বিভিন্ন রোগে কষ্টভোগ করছেন, তারা শুধুমাত্র রোগের সাথে মানিয়ে নেয়ার ব্যাপারেই না; বরং আরোগ্যেও ধর্মীয় প্রার্থনার উপকারিতা পেয়েছেন। কিন্তু এই প্রার্থনা আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা না হলে উপকারিতা খুবই অল্প, আর যদি শিরকযুক্ত হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ।

যদি আধ্যাত্মিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণ করাকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নিই, তবে সেটা অর্জন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত হিদায়াত অনুসরণ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সার্বিক ভাবে হিদায়াত অনুসরণের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। বাস্তবে দেখা যায়, প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিরা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ইবাদাত বন্দেগীতে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। এগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করেন, সিয়াম পালন করেন; কিন্তু একই সময়ে অন্যান্য গুনাহের কাজ করেন, যেমন- চুরি, প্রতারণা ইত্যাদি; তবে তার প্রশান্তি অর্জনের চেষ্টায় ঘাটতি ও ত্রুটি সৃষ্টি হবে। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কিছুতেই 'প্রশান্ত' হতে পারে না।

মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ইসলামি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- সালাত, দুআ, কুরআন তিলাওয়াত, সিয়াম, দান-সাদাকা, হজ্ব ও তাওবা ইস্তিগফার করা ইত্যাদি। এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে এসকল ইবাদাতের প্রধান উদ্দেশ্য বান্দার জীবনে সুখ অর্জন করা নয় বরং এটি গৌণ উদ্দেশ্য। প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, তাঁর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করা।

সালাত (Ritual prayer)

মানসিক সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তি অর্জন ও লালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো সালাত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন নফল ও সুন্নাত নামাজ যেগুলো দিনের বিভিন্ন সময়ে পালনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ আত্মায় পুষ্টি সরবরাহ করে। ফলে ক্রমেই এটি মানুষের চিন্তা-আবেগ-আচরণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'ধৈর্য্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। ... (সূরাহ বাকারাহ ২,৪৫)

সালাতের মাধ্যমে বিভিন্ন গুনাহ্ ও শয়তানের কুপ্রভাব থেকেও সুরক্ষা লাভ করা যায়। আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।' (সূরাহ্ বাকারাহ, ২;৩-৫)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।' (সূরাহ্ আনকাবুত ২৯,৪৫)

সালাতের গুরুত্ব প্রদান করে কুরআনে বহু রেফারেন্স রয়েছে। কালিমার পরে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি সালাত। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তিকে কাফির গণ্য করা হয়, এটি অধিকাংশ আলিমদের মতামত। মানুষ তার জীবনে অসংখ্য বাধার মুখোমুখি হতে থাকবে, সেগুলোর মোকাবেলা করার একটি পদ্ধতি হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছেন সালাত।

সালাত সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ লিখেছেন,

'সালাতের মাধ্যমে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু এটা কেবল তাদের জন্য যারা সালাতকে উপযুক্ত হক সহকারে আদায় করে; পরিপূর্ণ বিনয়, খুশু-খুযু সহকারে মহামহিম আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়, নিজের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অভিমুখী করে-এ ধরনের ব্যক্তিরা সালাত শেষে অন্তরে নূর লাভ করে। সে অনুভব করে যেন তার থেকে কোনো বোঝা নেমে গেছে। সালাতে এত সজীবতা, আরাম ও প্রশান্তি অনুভূত হয় যে, তার মনে হয় যদি এই সালাত কখনো শেষ না হতো! সালাত তার আনন্দের উৎস, বিনোদন, অন্তরের জান্নাত এবং দুনিয়াতে বিশ্রামের স্থান। তার কাছে মনে হয় সালাত শুরুর আগে যেন সে কোনো সংকীর্ণ কারাগারে বন্দি ছিল—এরপর সে সালাতের 'মধ্যে' প্রশান্তি লাভ করল, সালাত 'থেকে' নয়।'[৬]

দুআ

দুআ হলো সেসব ব্যক্তিগত প্রার্থনা যা যেকোনো সময় করা যায়। দুআতে ব্যক্তি নিজের অভাব, অনুযোগ, চাহিদা ইত্যাদি আল্লাহর কাছে পেশ করেন। আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের দুআয় উত্তর নেবেন। তিনি বলেছেন,

[৬] al-Jawziyyah, 2000, p. 27.

- 'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৮৬)

সুরক্ষা ও নিরাময় লাভের জন্য দুআ খুবই উপকারী। বিভিন্ন ক্ষতিকারক বিষয় থেকে সুরক্ষার জন্য মুমিনদেরকে আল্লাহর অভিমুখী হতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। যেমন- দুঃখ, দুর্দশা, চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, পেরেশানি ও অন্যান্য নেতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এই দুআ শিক্ষা প্রদান করেছেন,'ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকদের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।'(বুখারি)

তিনি আরো পড়তেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীন ইসলাহ (পরিশুদ্ধ) করে দাও, যে দ্বীন আমার রক্ষাকবচ। তুমি সংশোধন করে দাও আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবিকা রয়েছে। তুমি ইসলাহ (কল্যান কর) করে দাও আমার আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তুমি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দাও প্রত্যেকটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং তুমি আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক বানিয়ে দাও সব কিছুর অনিষ্ট থেকে।'(মুসলিম)

তিনি প্রায়শই দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ফিতনা থেকে পানাহ চাই, জাহান্নামের আজাব থেকে পানাহ চাই, কবরের ফিতনা, কবর আজাব ও ধন-সম্পদের ফিতনা এবং দারিদ্রের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আপনার পানাহ চাই। আমি আপনার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অশুভ পরিণতি থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দারা ধুয়ে সাফ করে দিন। আমার ক্বলব পরিষ্কার করে দিন যেভাবে আপনি সাদা কাপড় ময়লা থেকে সাফ করে দেন। আমি ও আমার পাপরাশির মধ্যে ব্যবধান করে দিন যেমন আপনি পূর্ন ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, পাপ ও ধার-কর্জ থেকে পানাহ চাই।'(মুসলিম)

দুঃখ, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্ণতা, পেরেশানি ও অন্যান্য সকল দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের কার্যকর পদ্ধতি হলো আল্লাহর কাছে দুআ করা। যদি সে দুআ অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হয়, বিশুদ্ধ নিয়ত থাকে তবে দুআর বরকতে বিষণ্ণতা ও উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমারই এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ সর্বদা কার্যকর। আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে চাইছি যে নাম তুমি

নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা যে নাম তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে শিখিয়েছ অথবা নিজের জন্য হিফাজত করে রেখেছ, তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা করছি যে তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার অন্তরের বসন্ত, আমার বক্ষের আলো, আমার চিন্তাভাবনা অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরকারী।' (আহমাদ, তাবারানি, উত্তম সনদে বর্ণিত)

কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য জিকির

আল্লাহ্ বলেন,

- 'হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:৫৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।' (সূরাহ আনফাল, ৮:২)

দেহ, মন ও আত্মায় আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের একটি প্রশান্তিদায়ক প্রভাব রয়েছে। এই শান্তিদায়ক প্রভাবের মাধ্যমে মানসিক চাপ, উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা হ্রাস পায়। বিভিন্ন মানসিক ও আবেগিক যাতনা থেকে নিরাময় দিতে কুরআন তিলাওয়াতের নিজস্ব একটা শক্তি ও প্রভাব রয়েছে। অন্তরের অসুস্থতা সৃষ্টি হয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা (শাহওয়াত) ও সন্দেহ-সংশয় (শুবুহাত) থেকে। আর উভয়টির চিকিৎসা রয়েছে আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের ভিতরে ।

আল্লাহর স্মরণ (জিকির) সবচেয়ে সহজ ইবাদাত। এতে কোনো জটিলতা নেই কিন্তু এর উপকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই সর্বোত্তম প্রকার হলো **কুরআন তিলাওয়াত।** এ ছাড়াও স্মরণের নানান প্রকার রয়েছে। যেমন—আল্লাহর নাম ও **গুণবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ** স্মরণ করা, তাঁর প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। কেউ আল্লাহর অনুগ্রহগুলো স্মরণ করা ও বলার মাধ্যমেও তাঁকে স্মরণ করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।' (সূরাহ রাদ, ১৩:২৮)

সিয়াম

আল্লাহ্ বলেছেন,

- 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৮৩)

তাকওয়া অর্জনের অর্থ আল্লাহর ভয়, স্মরণ ও 'উপস্থিতি' সম্পর্কে সচেতন থাকা। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে—এ কথা স্মরণ রাখাও তাকওয়ার অন্তর্গত। তাকওয়াবান ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করতে অনিচ্ছুক, তিনি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উদ্রেক করতে চান না। সিয়ামরত ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বৈধ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, স্বামী/স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকেন। এভাবে অন্যান্য অবৈধ কাজ থেকেও বেঁচে থাকেন। সিয়াম গুনাহের ক্ষতি ও আল্লাহর সর্বব্যাপী উপস্থিতি সম্পর্কে ভাবায়। এই অনুভূতি গুনাহের সম্ভাব্যতা কমিয়ে দেয় এবং বাড়িয়ে দেয় তাকওয়া।

সিয়াম প্রবৃত্তির নিচু কামনা-বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ হতে সাহায্য করে, যেমন- লোভ, লালসা, অপব্যয়, অপচয় ইত্যাদি। পরিশুদ্ধি অর্জিত হয় মূলত দুটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে: (এক) পাকস্থলী ও (দুই) লজ্জাস্থান। এই দুটি অঙ্গই অধঃপতনের কারণ; কেননা, শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে এই দুই পথেই। অধিকাংশ মানুষ এই দুটি অংগের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই অন্যের হক নষ্ট করে, আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে এবং নিজেদের ক্ষতি করে। যদি মানুষ এই দুটোর নিয়ন্ত্রণ শিখে যায়, তবে সহজ হয়ে যায় অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

এভাবে সিয়াম আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্ম-শৃঙ্খলাবোধ বাড়ায়; ধূমপান, অতিভোজনের মতো বদভ্যাস ও মন্দ আচরণ নির্মূল করে। রাগ ও অন্যান্য নিন্দনীয় অনুভূতি নিয়ন্ত্রণেও সিয়াম সাহায্যকারী। ভরপেট আহারকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় রাগান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, আর রাগ হলো শয়তানের একটি প্রবেশপথ। ক্ষুধার্ত থাকার কারণে সিয়ামরত ব্যক্তির দৈহিক শক্তি কমে আসে। ফলে তুচ্ছ বিষয়ে রাগান্বিত হওয়া কিংবা রাগের তীব্রতা হ্রাস পায়।

অন্তরে প্রশান্তিদায়ক অনুভূতি, পরিতৃপ্তি, ইতিবাচক আশাবাদী মানসিকতা বৃদ্ধি করে সিয়াম। সিয়ামরত অবস্থায় ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের বিষয়টি অনুভব করতে পারে। ফলে নিজের ভেতর সে অনুভব করে শান্তি ও পরিতৃপ্তি। এ বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ, যা তিনি তার অনুগত বান্দাদেরকেই দান করেন। এর দ্বারা একজন ব্যক্তি তার স্ট্রেস, ডিপ্রেশন, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পায়।

যাকাত

যাকাত হলো এক বিশেষ ধরনের দান, যা সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রতিবছর দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে নিজের নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ হতে শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত প্রদান করতে হয়। কুরআনে যাকাতের নির্দিষ্ট খাত উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতের লক্ষ্য সম্পদের পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, যেন সবাই শান্তি ও পরিতৃপ্তির সাথে বসবাস করতে পারে।

যাকাতের মাধ্যমে শুধু সম্পদের পরিশুদ্ধি নয় বরং ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধিও অর্জিত হয়। 'যাকাত' শব্দটি এসেছে আরবি 'তাজকিয়া' শব্দ থেকে যার অর্থ 'পরিশুদ্ধি'। এ কারণে যাকাতকে কুরআনের বহু আয়াতে সালাতের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। সালাত ও যাকাতের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়, যেমন- আমরা দেখতে পাই মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের অন্যতম প্রধান কারণ হলো আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার অনুপস্থিতি, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্ক না থাকা। এ সকল ব্যাধির প্রধান চিকিৎসা হলো সালাত।

এসব অসুস্থতার আরেকটি কারণ হলো যখন মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছেড়ে দুনিয়াবী বস্তুগত ধন-সম্পদের পেছনে পড়ে থাকে। এই ব্যাধির চিকিৎসা যাকাত।[৭] এটি আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধি প্রদান করে বস্তুগত সম্পদের প্রতি আসক্তি থেকে। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ আঁকড়ে থাকার মানসিকতা, কৃপণতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে মুক্তি ঘটে। আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু দান করার মাধ্যমে মুমিন নিজের অন্তরে অর্জন করে অনাবিল প্রশান্তি। যা তাকে আল্লাহর আরও নিকটবর্তী করে দেয়। ব্যক্তির জীবনে শান্তি ও পরিতৃপ্তি এনে দেয় এই অপার্থিব নৈকট্য।

হজ্ব

হজ্ব একটি বাধ্যতামূলক ইবাদাত, যা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর অন্তত জীবনে একবার পালন করা আবশ্যক। হজ্বের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ তথা কাবা ও মক্কা জিয়ারত করা, সেখানে নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালন করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

> 'এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের 'কল্যাণের স্থান' পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। ...' (সূরাহ হাজ্জ, ২২:২৭-২৮)

এই আয়াতে যে কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অনির্দিষ্ট ও ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ হজ্ব পালনকারী ব্যক্তি নানাবিধ ও অগণিত উপকারিতা লাভ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আত্মিক পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, গুনাহ থেকে মুক্তি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ইত্যাদি।[৮]

১৬.২ তাওবা

---

[৭] Zarabozo, 2002, p. 224.

[৮] Ibid., p. 252.

ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মানবিয় ভুলক্রটিকে অপ্রত্যাশিত ধরা হয় না। ভুলক্রটি হতেই পারে, এটাই স্বাভাবিক, এটি আমাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তাওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। যারা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং গুনাহের পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেছেন,

- 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; (সূরাহ যুমার, ৩৯:৫৩-৫৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং (গুনাহর জন্যে) তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আমি নিজে প্রত্যহ একশো বার তাওবা করি।' (মুসলিম)

তাওবার মূল বিষয়বস্তু হলো গুনাহ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা ও ভুলক্রটি সংশোধন করে নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হওয়া। আরবি শব্দ 'তাওবা' এসেছে শব্দমূল 'তাবা' থেকে, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। অর্থাৎ, আল্লাহর নিষেধকৃত কাজ থেকে আদেশকৃত কাজের দিকে ফিরে আসা।[৯] মানুষের ফিতরাত (সহজাত ধর্ম) জন্মের সময় বিশুদ্ধ ও কলঙ্কমুক্ত থাকে। সেই অবস্থায় সবার অন্তর আল্লাহর প্রতিই সমর্পিত থাকে। কিন্তু গুনাহের কারণে মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তাওবা করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে ফিরে এসে আবার সঠিক রাস্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা তাকদীরে নির্ধারণ করেছেন যে, মানুষ তার সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে ভুলক্রটি বা গুনাহ করে ফেলবে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকার এটি একটি সহজাত পরিণতি। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কারণে ব্যক্তি তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে গুনাহের প্রতি আসক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। এভাবে তিনি তাঁর রহমত ও ক্ষমার মহান গুণটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন।[১০] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা

---

[৯] Philips, A.A.B., 1990, Salvation through Repentance (An Islamic View), Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, p. 1.
[১০] Ibid., p. 3.

যদি গুনাহ্ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের তুলে নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন, যারা গুনাহ্ করত, এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চাইত, অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন।' (মুসলিম)

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা অনুসারে সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যখন মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং আপন সত্তা সম্পর্কে লিখলেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর সংরক্ষিত আছে, 'আমার গজবের উপর আমার রহমতের প্রাধান্য রয়েছে।' (বুখারি ও মুসলিম)

ভুলত্রুটি হয়ে গেলে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাআলা তার স্বীয় করুণার হস্ত রাতে সম্প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধী তার প্রতি ধাবিত হয়ে তাওবা করে। অনুরুপভাবে দিবসে তিনি তার স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তার প্রতি ধাবিত হয় ও তার- নিকট তাওবা করে। এমনিভাবে প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।' (মুসলিম)

গুনাহের পুনরাবৃত্তি, মাত্রা, সংখ্যা নির্বিশেষে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকবার বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন, যদি সে আন্তরিকভাবে তাওবা করে। এখানে মূল ধর্তব্য বিষয় হলো আন্তরিকতা। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, 'এক বান্দা গুনাহ্ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তারপর আল্লাহ্ তাআলা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ্ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এ কথা বলার পর সে পূনরায় গুনাহ্ করল এবং বলল, হে আমার মনিব! আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। এরপর আল্লাহ্ তাআলা বললেন, আমার এক বান্দা গুনাহ্ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর সে আবারও গুনাহ্ করে বলল, হে আমার রব! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। একথা শুনে আল্লাহ্ তাআলা আবারও বলেন, আমার বান্দা গুনাহ্ করেছে এবং সে জানে যে তার একজন মালিক আছে, যিনি বান্দার গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুনাহ মাফে করে দিয়েছি।' (মুসলিম)

আনাস রা. বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমার কাছে দুআ করবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করতে থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ-খাতাহ্ মাফ করতে থাকব। সেক্ষেত্রে তোমার গুনাহ্র পরিমাণ যত বেশি কিংবা যত বড়োই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করবনা। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্র

পরিমাণ যদি আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমায় ক্ষমা করে দেব; এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হও আর আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করো, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে যাব।' (তিরমিযি)

তাওবার বেশ কয়েকটি উপাদান রয়েছে। তাওবা গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হওয়ার জন্য এই শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে:

১। অবিলম্বে গুনাহ পরিত্যাগ করা,

২। একমাত্র আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা,

৩। সংঘটিত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া,

৪। ভবিষ্যতে গুনাহ পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ,

৫। মানুষের হক নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা (উপযুক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে)।

তাওবা করার জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। যেকোনো ব্যক্তি সরাসরি একমাত্র আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। চাইলে সে তাওবার উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে পারে। এরপর সে আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবে।

তাওবা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অনেক দুআ বর্ণিত আছে। তবে সবচেয়ে উত্তম দুআটি সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার' বা সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনা হলো, বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পরোয়ারদিগার। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তুমি আমায় সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি সাধ্যমতো তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। আমি যা কিছু করেছি তার মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্যে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যেসব নিয়ামত আমাদের দান করেছ তার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার সকল অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমায় মার্জনা করো। কেননা, তুমি ছাড়া অপরাধ মার্জনা করার ক্ষমতা আর কারো নেই।'

(এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন), 'কোনো ব্যক্তি পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে দিনের বেলা এই দুআ পাঠ করে যদি সন্ধ্যার পূর্বেই মারা যায় তবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এই দু'আ পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তবে সেও জান্নাতে যাবে।' (বুখারি)

- আল্লাহ বলেন, 'তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?

তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৩৫)

জেনে বুঝে গুনাহ চালিয়ে যেতে থাকলে আন্তরিক তাওবা কার্যকর হয় না। একদিকে গুনাহে লিপ্ত থাকা, আরেক দিকে জিহ্বার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করা নিঃসন্দেহে আন্তরিকতা নয়। গুনাহ পরিত্যাগ করার সাথে অন্তরে অনুতপ্ত ও অনুশোচনাবোধ থাকতে হবে। যারা সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হয়, তাদের ভবিষ্যতে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তাওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, 'কক্ষনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে।' (সূরাহ আল-মুতাফফিফীন: ১৪)। (তিরমিযি, আহমাদ)

তাওবা এমন একটি ইবাদাত, যার দ্বারা মানুষ শান্তি ও মুক্তি লাভ করে। ভুল বুঝতে পারা এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে অর্জিত হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিশুদ্ধি। গুনাহ, নিজের কামনা-বাসনা ও শয়তানের উপর বিজয় অর্জন করার মাধ্যম হলো তাওবা। উল্লেখিত হাদিসে এসেছে, যারা তাওবা করে তাদের অন্তর পবিত্র হয়, দূষণমুক্ত হয়, মরিচা দূর হয়ে যায়। আত্মিক পরিশুদ্ধি তথা অন্তর এবং নফসের বিশুদ্ধতা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায় তাওবা করা। তাওবার ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে একদিকে যেভাবে গুনাহের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তেমনিভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষণ্ণতা সৃষ্টিকারী উপাদান থেকেও কার্যকরভাবে মুক্তি ঘটে।

তাওবাকারী এমনভাবে পবিত্রতা অর্জন করে যেন সে কখনো গুনাহ করেইনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে গুনাহ থেকে তাওবা করল সে যেন কখনো গুনাহ করেনি।' (ইবনু মাজাহ, বিশুদ্ধ হাদিস)। এর দৃষ্টান্ত একটি বোর্ডে কিছু লেখার পর মুছে দেয়ার মতো। তখন আগের লেখার কোনো চিহ্ন বা ছাপ থাকে না। আর যারা তাওবা করেনা, তাদের অন্তর এমনভাবে মরিচাপূর্ণ হয় যেন বোর্ডটি নানা রকমের আঁকিবুকিতে হিজিবিজি হয়ে আছে।

প্রকৃত তাওবার মাধ্যমে পূর্বের গুনাহ মাফের সাথে সাথে আরেকটি বিরাট পুরস্কার দেয়া হয়। গুনাহের কাজগুলোকে নেকির কাজে বদলে দেওয়া হয়! আল্লাহ বলেছেন,

- 'কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুন্য দ্বারা পরিবর্তত করে এবং দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

(সূরাহ ফুরক্বান, ২৫:৭০)

আলেমদের মতে, গুনাহকে নেকিতে বদলে দেওয়ার অর্থ উক্ত ব্যক্তির নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে বদলে দেওয়া অথবা বিচার দিবসে গুনাহকে নেকি দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেয়া।

তাওবার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, কেননা সে আল্লাহর রহমত, ক্ষমা এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা অনুভব করতে পারে। যখন মানুষ আল্লাহর দিকে বিনয় ও ভক্তি সহকারে ফিরে আসে, তখন পূর্বের তুলনায় অধিক তাকওয়াবান হয়।[১১] তাওবার মাধ্যমে বান্দার তাওহিদে বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। একমাত্র আল্লাহই গুনাহ মাফ করতে পারেন এটি জানা ও মানার মাধ্যমে বান্দা ফুটিয়ে তুলে আল্লাহর প্রতি একত্ববাদী ইবাদাতের সারনির্যাস। এটি একটি জরুরি বিষয়; কেননা সত্যিকারের তাওবা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। অন্তরে এই খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ বাদে কেউ তার গুনাহ মাফ করতে পারবে না। এই মৌলিক বিষয়ের উপস্থিতি ছাড়া তাওবা কবুল হবে না।

যারা তাঁর দিকে ফিরে আসে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। যে ব্যক্তি তাওবার ধাপগুলো অনুসরণ করল, সে মূলত নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করল। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। এই ধরনের তাওবা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়। তিনি বলেছেন।

- '... নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:২২২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যার উট গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার ফিরে পায়।' (বুখারি ও মুসলিম)। তাওবার পর গুনাহের গ্লানি, বিবেকের দংশন ও লজ্জা থেকে মুক্তি মিললে বুঝতে হবে আল্লাহ তাওবা কবুল করেছেন।

১৬.২ আল্লাহর উপর ভরসা করা

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা বিশুদ্ধ তাওহিদের নিদর্শন ও মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে উৎসাহিত করেছেন তার উপর ভরসা করতে। তিনি বলেছেন,

- '... যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।' (সূরাহ তালাক, ৬৫:৩)

- অন্যত্র বলেছেন, '... অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলা র উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৫৯)

---

[১১] Ibid., p. 4.

• অন্যত্র বলেছেন,

'... এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।' (সূরাহ মায়িদা, ৫:১১)

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের অর্থ নিজের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সাথে যুগপৎভাবে আল্লাহর রহমত ও দয়ার উপর ভরসা করা। শরিয়াহর মূলনীতি অনুসারে, তাওহিদের উপর ঈমান পরিপূর্ণ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই সেইসব 'আসবাব' (উপায়-উপকরণ) ব্যবহার করতে হবে, যার মাধ্যমে সে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, এটাই তাকদীরের বিধান। আসবাব ব্যবহারে অবহেলা করলে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করা হয় না। আসবাব বর্জন করা আল্লাহর জ্ঞান, বিজ্ঞতা ও নির্দেশের পরিপন্থী; যদিওবা আসবাব পরিত্যাগকারী ব্যক্তি ভিন্নমত পোষণ করুক না কেন। উপায় উপকরণ ব্যবহার করা আল্লাহর উপর ভরসার শক্তিশালী নিদর্শন, সেগুলো উপেক্ষা করা অসহায়ত্বের নিদর্শন। একজন মুমিন বা উম্মতের বৈশিষ্ট্যের সাথে এটি মানানসই নয়।

১৬.৩ গভীর চিন্তা ও পর্যালোচনা

কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করা, বোঝা ও পর্যালোচনা করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সমূহের অন্যতম। এই গুণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সহজেই খুঁজে পায় আল্লাহর একত্ব ও তুলনাহীনতার সত্যতা, যা তার মনে আল্লাহর ইবাদাতের ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগায়। মানুষকে শয়তানের ফাঁদ ও নিরর্থক কাজের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করতে পারে এই বোধশক্তি। এর মাধ্যমে তারা আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হতে অনুপ্রাণিত হন। ফলে সম্ভব হয় আত্মিক শান্তি ও পরিতৃপ্তি অর্জন এবং 'ভালো থাকতে' পারা।

মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবন, বিচার দিবস ও আখিরাত সম্পর্কে নিয়মিত ভিত্তিতে গভীর চিন্তাভাবনা করতে মুমিনদের বারবার উৎসাহিত করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমরা (দুনিয়ার) স্বাদ-আহলাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো। (বুখারি)।

এসব চিন্তার মাধ্যমে ব্যক্তির মনে পড়ে, এই দুনিয়াতে সে চিরকাল থাকবে না বরং তাকে অন্য জীবনে প্রবেশ করতে হবে। ফলে পরবর্তী জীবন ও বিচার দিবসের জন্য উত্তম আমল এবং গুনাহ পরিত্যাগে উৎসাহী হয়।

মৃত্যুচিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি উপলব্ধি হলো দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন করা। এই দুনিয়া কেবল অল্প সময়ের জন্য। এর আনন্দ ক্ষণস্থায়ী ও এটি নানা ধরণের মনোযোগ হরণকারী উপাদানে পরিপূর্ণ। আল্লাহ বলেন,

• 'পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্টতর। তোমরা কি বুঝ না?' (সূরাহ আনয়াম, ৬:৩২)

- 'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাজিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।' (সূরাহ কাহাফ, ১৮:৪৫-৪৬)

গভীর চিন্তার মাধ্যমে মুমিন উপলব্ধি করতে পারে এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তাই সে দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছেদ করে। কেবল যতটুকু প্রয়োজন, দুনিয়ার সাথে ততটুকুই সংযোগ রাখে।[১২] আরেকটি সুনির্দিষ্ট ধ্যান হলো আল্লাহর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করা। এটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে,

- 'নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুম জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।' (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯০-১৯১)

সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে মুমিনরা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। তাঁর শক্তি ও কুদরতের প্রতি মুগ্ধ হয়ে নত হয়ে যায় ভক্তিতে। অসংখ্য নিয়ামতের পরিচয় আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়। সবকিছুর জন্য আমরা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল—এটি বোঝা সহজ হয় এবং দমে যায় বড়াই-অহংকারের প্রবণতা।

আত্মার পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি অর্জনের অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কৃতজ্ঞতাবোধ, নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, উপকারী ও বিশুদ্ধ ইলম অর্জন, মসজিদে সালাত আদায়, নেককার সঙ্গীসাথী ও জীবনসঙ্গী লাভ, ঈমান বিশুদ্ধ করা, নফল ইবাদাত বন্দেগী ও উত্তম আমল করা।[১৩] বাস্তবে ইসলামে কেবল আল্লাহর খাতিরে শরীয়াহ নির্দেশিত পদ্ধতিতে করা সকল কাজের দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ গবেষণার কথা উল্লেখ করছি। গবেষণায় দেখা গেছে যারা ধর্মের প্রতি অধিক নিবেদিতপ্রাণ, তারা অন্যদের তুলনায় দীর্ঘায়ু লাভ করেন। বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিচালিত এক স্টাডিতে দেখা গেছে, ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের কারণে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। এই স্টাডি পরিচালনা করার সময় অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা নিয়মিত বিরতিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।[১৪] ২১০০০ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানকে নিয়ে

---

[১২] Zarabozo, 2002, p. 338.

[১৩] Farid, 1993, pp. 99-104; Zarabozo, 2002, pp. 127-389.

[১৪] Larson, D. B., & Larson, S. S., 2003, Spirituality's potential relevance to physical and emotional health: A brief review of quantitative research, Journal of Psychology and Theology, 31(1), p. 38.

এই স্টাডি পরিচালিত হয়েছে দীর্ঘ ৯ বছর যাবত। গবেষকরা দেখেছেন, যারা সপ্তাহে একবারের বেশি ধর্মীয় উপাসনা করেন, তারা গড়ে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের তুলনায় ৭ বছর অধিক আয়ু পেয়েছেন, আর আফ্রিকান-আমেরিকানরা ১৪ বছর অধিক আয়ু পেয়েছেন। যারা কখনো ধর্মীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ করেননি, তারা অন্যান্যদের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ অধিক মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছেন। এখানে ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রভাব সুস্পষ্ট; এগুলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য বা জীবনযাপনের সাথে যুক্ত করার অবকাশ নেই।[১৫]

মোট ১,২৬,০০০ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পরিচালিত ৪২ টি স্টাডির বিশ্লেষণে (মেটা-এনালাইসিস) উঠে এসেছে, ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে আয়ুষ্কাল ২৯% বৃদ্ধি পায়।[১৬] যদিও এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে, তবুও আমরা বলতে পারি (তাদের আপেক্ষিক দ্বীনদারীতার কারণে) আল্লাহ তাআলা কিছু দুনিয়াবী উপকারিতা প্রদান করেছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কুরআনে একটি আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। নুহ (আ.) তাঁর জাতির লোকেদেরকে আল্লাহর হিদায়াত অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে বলেছিলেন,

- 'সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলা র ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং *নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ* দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা র নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (সূরাহ নুহ, ৭১:২-৪)

'নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ' প্রদান করবেন এই অংশটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। ইবনে কাসির (রহ.) এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'এর অর্থ তিনি তোমাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসতে পারত সেগুলো থেকে সুরক্ষা প্রদান করবেন। আর যদি তোমরা তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত না হতে তবে সেগুলো থেকে অবকাশ পেতে না।' আল্লাহর আনুগত্য ও দ্বীনদারীতার মাধ্যমে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়, এই মর্মে উক্ত আয়াতটি একটি উত্তম দলিল।[১৭]

---

[১৫] Hummer, R. A., Rogers, R., Nam, C, & Ellison, C. G., 1999, Religious involvement and U.S. adult mortality, Demography, 36(2), pp. 277-283;
Larson & Larson, 2003, p. 38.
[১৬] McCullough, M. E., Hoyt, W. T., Larson, D. B., Koenig, H. G., & Thoresen, C. E., 2000, Religious involvement and mortality: A meta-Analytic review, Health Psychology, 19(3), pp. 211-222; Larson & Larson, 2003, p. 38.
[১৭] Ibn Kathir, 2000 (Vol. 10), p. 179.

||অধ্যায় সতের||
ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের উপকারিতা

একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম সকল রোগব্যাধির সমাধান দিয়েছে, হোক সেটা দৈহিক, মানসিক, আবেগিক বা আধ্যাত্মিক অসুস্থতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নতের মাধ্যমে হিদায়াত প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

- 'আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৪১)

আমরা যত আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করব ও তাঁর ইবাদাত করব, তত বেশি উপকারিতা লাভ করতে থাকব।

১৭.১ আল্লাহর সাহায্য

অদৃশ্য জগৎ (গায়েব) এমন এক জগৎ যেখানে বিজ্ঞানের মূল্যায়ন বা মন্তব্য চলে না। সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা, যত্ন ও সাহায্য-সহযোগিতা কোনো মানদন্ডে পরিমাপ করা সম্ভব? ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মুসলিমদের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হলো সেই মহান সত্তার হিদায়াত ও সমর্থন লাভ করা, যিনি আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনের যত্ন নেন। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন,

- 'সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' (সূরাহ বাকারাহ, ২:১৫২)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।' (সূরাহ মুমিন, ৪০:৫১)

আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সাহাবি আবু বকর (রা.) বলেছেন, 'আমরা যখন (সাওর) গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম, তখন আমি নবি করিম (সা.) কে বললাম, যদি কাফিররা তাদের পায়ের নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বকর, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা স্বয়ং আল্লাহ যাদের তৃতীয় জন? (বুখারি ও মুসলিম)।

একটি সুপরিচিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বালক আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে বলেছেন, 'হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাব—আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। ...' (তিরমিযি, সনদ উত্তম)

ধর্ম/আধ্যাত্মিকতার সাথে মানসিক সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় একটি প্রশ্ন প্রায়ই আসতে দেখা যায়। অনেকেই জানতে চান, 'গড' কি সত্যিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করেন? ইসলামি আকিদা অনুসারে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রার্থনায় জবাব দেন। তিনি বান্দাদের প্রতি প্রশান্তি (সাকিনা) নাজিল করেন, ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করেন। ওহীর মাধ্যমে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষদের 'ভালো থাকা' ও মানসিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করেন। এটি পূর্বের একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

১৭.২ আধ্যাত্মিক নূর

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। যারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা এমন এক আলো লাভ করে, যা তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনে। এটি সেই আধ্যাত্মিক আলো, যা চলার পথকে আলোকিত করে এবং আলোকবাহীর অন্তরে দান করে তৃপ্তি ও প্রশান্তি। আল্লাহ বলেছেন,

- 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। ... (সূরাহ বাকারাহ, ২:২৫৭)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে রয়েছে।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:২২)

এই আলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইলম। এর মাধ্যমে একজন ঈমানদার সত্য-মিথ্যা ও ক্ষতিকর-উপকারী বিষয়ের মধ্যে ফারাক করতে পারেন। যারা আন্তরিকভাবে ইলম অনুসন্ধান করেন তাদেরকে আল্লাহ এই আলো দান করেন নিয়ামত হিসেবে। যে যত ইলম অন্বেষণ করবে, সে তত আলো লাভ করবে।

এই আলো বিচার দিবসে তাদের উপকারে আসবে। বিচার দিবসের এক পর্যায়ে সকলকেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। এটি স্থাপিত হবে জাহান্নামের উপরে এবং সেটা অতিক্রম করতে পারলেই কেবল জান্নাতে পৌঁছানো যাবে। মুমিনদের উপরেও অন্ধকার ছেয়ে আসবে, কিন্তু তাদের দুনিয়ার ভালো আমলের সমানুপাতে আলো প্রদান করা হবে। এই আলোর সাহায্যে দ্রুতগতিতে তারা সেই ব্রিজ অতিক্রম করবে।

কাফিরদের জন্য সেই পুলসিরাত হবে অত্যন্ত সরু ও ধারালো, আর মুনাফিকরা পেছনে পড়ে রইবে। আল্লাহ বলেছেন,

- 'যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে বলা হবেঃ আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।' (সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১২)

শাইখ আল-আশকার বলেছেন,

'আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে ঈমানদার নারী-পুরুষদেরকে বিচার দিবসে আলো প্রদান করা হবে। যারা দুনিয়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল ও দ্বীনের আলোয় আলোকিত হয়ে পথ চলেছে, সেই আলোর সাহায্যে তারা চিরসুখের স্থান জান্নাতের পথ দেখতে পাবে এবং পথের পিচ্ছিলতা ও কন্টকময় বাধা-বিপত্তি এড়াতে পারবে।'[১]

১৭.৩ একটি সুন্দর জীবন (হায়াতে তাইয়েবা)

আল্লাহতালা ঈমানদারদেরকে একটি সুখী, সুন্দর ও পরিতৃপ্ত জীবনের ওয়াদা করেছেন,

- 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।' (সূরাহ নাহল, ১৬: ৯৭)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের সকল বিধানের উপর পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন তাদের রিজিক। মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

- '(তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন।' (সূরাহ নূর, ২৪:৩৮)

এই বর্ধিত রিজিকের ফলে তাদের মানসিক 'ভালো থাকা'য় একটি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে।

একটি চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, মানসিক অসুস্থতা বিষয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক চাপ জমতে থাকলে এটি পরবর্তী মানসিক বৈকল্যের পূর্বাভাস প্রদান করে, বিশেষত বিষণ্ণতা ও উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে।[২] যেমন কিনা, বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে জীবনে চাপ বাড়তে থাকলে পরবর্তীতে বড় আকারের বিষণ্ণতার সূত্রপাত হয়, চাপ ও বিষণ্ণতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়টি একটু আগে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতের সাথে মিলে

---

[১] al-Ashqar, U.S., 2003b, The Day of Resurrection in the Light of the Qur'an and Sunnah, Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, p.370.

[২] Kendler, K. S., Karkowski, L. M., & Prescott, C. A., 1999, Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression, American Journal of Psychiatry, 156(6), pp. 837-841; Kessler, R. C, 1997, The effects of stressful life events on depression, Annual Review of Psychology, 48.

যায়। সেসব স্টাডিতে একটি আলোচনা অনুপস্থিত, সেটা হলো—আল্লাহ তাআলাই মানুষের জীবন থেকে বিভিন্ন নিয়ামত উঠিয়ে নেন এবং তাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি করেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে, তিনি আল্লাহর থেকে দূরত্বে ছিলেন এবং এ ধরনের পরীক্ষা তার জন্য প্রয়োজন ছিল। কেননা, এসব পরীক্ষার মাধ্যমেই তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সরল পথে। জীবনের ভালো-মন্দ পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারলে সবকিছুই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এ-ও ওয়াদা করেছেন, তিনিই তাদেরকে প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের করে আনবেন।

- '...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন।' (সূরাহ তালাক, ৬৫:২)

সুতরাং, মুমিনের জীবনে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি, কঠিন পরিস্থিতি আসলেও তাদের অন্তর সন্তুষ্ট থাকে। কেননা, সে জানে আল্লাহ তাআলা কোনো না কোনো মুক্তির ব্যবস্থা করেই দেবেন।

- 'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি।' (সূরাহ আনফাল, ৮:২-৪)

- অন্যত্র বলেছেন,

  'আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।' (সূরাহ নিসা, ৪:৬৯)

||অধ্যায় আঠারো||
সারাংশ ও উপসংহার

মানবপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খুবই সীমিত জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যতটুকু জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট। বস্তুত আমাদেরকে যথাযথ ও বাহুল্যবর্জিত জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এমন এক সৃষ্টি যাদের দেহ, মন ও আবেগ রয়েছে। আরও রয়েছে একটি আত্মা যা এগুলোকে প্রভাবিত করে ও পরিচালিত করে। নিজেকে ও নিজের আত্মাকে জানার একমাত্র সঠিক উপায় হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জানা। একমাত্র আল্লাহকে জানার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের আত্মা সম্পর্কে জানতে পারে। এটিই কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত মানব মনস্তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি।

সমকালীন মনোবিজ্ঞানের অসংখ্য তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষকে কেবল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে পথভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করা হয়। মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা, জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গ এই প্রধান লক্ষ্যের বিপরীতে একেবারেই গৌণ।

জার্নালে প্রকাশিত গাদা গাদা আর্টিকেল, বই পুস্তকের অসংখ্য অধ্যায়, নানাবিধ বিশদ তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত কনফারেন্সের কার্যবিবরণী কিংবা বিশেষজ্ঞ মতামতসমূহ হাশরের দিনে তাদের কোনো কাজেই আসবে না, যদি সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নাজিলকৃত মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করা হয়। বাস্তবে তাদের গবেষণাগুলোও ইসলামের সত্যতার দিকেই ইঙ্গিত করে, কিন্তু তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। আল্লাহ বলেছেন,

- 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলা কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য।' (সূরাহ হাশর, ৫৯:১৯)

ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, সুখ-শান্তি ও 'ভালো থাকা'র পরিপূর্ণতা দানের জন্য দ্বীন ইসলাম বিস্তারিত এবং পদ্ধতিগত সহযোগিতা প্রস্তাব করে। এই পরিপূর্ণতা অর্জন করা যাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত উপায়ে তাঁর ইবাদাতের মাধ্যমে। কার্যতঃ ইসলাম নিজেই সকল অসুস্থতার সমাধান, হোক সেটা আত্মিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, আবেগিক, শারীরিক কিংবা সামাজিক। মানুষের এখন প্রয়োজন কেবল আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে চলা।

তিনি বলেছেন,

- 'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাকে অধঃপতিত করেছি নীচ থেকে আরও নীচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার।' (সূরাহ তীন, ৯৫:৪-৬)

এই আয়াতে ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের মনস্তত্ত্বের সারাংশ ফুটে উঠেছে। চাইলে আমরা বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে উন্নত করতে পারি, অথবা নির্দেশনা অস্বীকারের মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদাহানি ঘটাতে পারি।

প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাব আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রাপ্তির খাতায় যোগ হবে শাস্তি ও আল্লাহর ক্রোধ। এটাই মানব জীবনের সারকথা। শেষ কথাটি মনে থাকবে তো? যে পথ আমরা বেছে নেব, তা কেবল দুনিয়াতে আমাদের ভালো থাকা মন্দ থাকাকেই নির্ধারণ করবে না শুধু; বরং ঠিক করে দেবে আমাদের অনন্তকালের চূড়ান্ত ঠিকানাও!

ড. আইশা উটজ হামদান

জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪; মৃত্যু মার্চ, ২০১৯। তিনি একজন রিভার্টেড আমেরিকান মুসলিমাহ। ১৯৮৪ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলিম ভূমিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে আমেরিকা ছেড়ে পাড়ি জমান মধ্যপ্রাচ্যে। তিনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন *West Virginia University Of Morgantown* থেকে। *American Open University Of Falls Church* থেকে অর্জন করেন ইসলামিক স্টাডিজ-এর উপর ব্যাচেলর ডিগ্রি।

আন্তর্জাতিক ইসলামি ম্যাগাজিন 'আল-জুমুয়াহ'-সহ অনেক অনলাইন মুসলিম ব্লগ ও প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। *Journal Of Muslim Mental Health* এর এসোসিয়েট এডিটর হিসেবেও কাজ করেছেন অনেক দিন। তাঁর তিনটি মৌলিক বই হচ্ছে : *Nurturing Eeman In Children, Psychology From The Islamic Perspective, The Prick Of a Thorn: Coping With The Trials and Tribulations Of Life.* তিনি আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে আসার আগে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মেডিকেল সেন্টারে পেশাগত অবদান রেখেছেন। সৌদি আরবের *Saud Bin Abdul Aziz University For Health Sciences* ছিল তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে কর্মরত ছিলেন।

সাইকোলজি, মানব মনের ব্যবচ্ছেদ, মানসিক চিকিৎসা—আধুনিক সমাজে বেশ ভালোভাবে গেড়ে বসেছে। পশ্চিমা দেশে তো সবচেয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা। সাইকাইট্রিস্টদেরও কদর বাড়ছে। মুসলিম সমাজে আত্মশুদ্ধি, অন্তরের পরিচর্যা বিষয়ক প্রচুর বইপত্র, ওয়াজ নসীহতের চল থাকলেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজ বস্তুবাদের কাছে এভাবে বন্দী হয়ে আছে—তাদের লেভেলে আলোচনা না হলে তারা শুনতে বা পড়তে প্রস্তুত নয়। সেজন্য তারা পয়সা খরচ করে মোটিভেশনাল স্পিচ শুনবে, দামী দামী সব বিদেশি বই পড়বে, সেক্যুলার নানান তত্ত্ব কপচাবে, কারণ তাদের ধারণা আধুনিক এসব বিষয় "ইসলামে" নেই। আসলেই কি তাই?

অথচ আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "...মনে রেখো, শরীরের ভেতরে এক টুকরো মাংসপিণ্ড আছে, যখন এটা ভালো থাকে, সমস্ত শরীর ভালো থাকে; যখন এটা আক্রান্ত হয়, সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়। আর সেটা হলো কলব।" (মুসলিম, হাদিস নং ১৩৩)

মানুষের যে মনটা স্বয়ং আল্লাহ বানালেন, সেই মনের জন্য, সেই অন্তরের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ—তার খোঁজ আমরা করে বেড়াচ্ছি অন্য কোথাও, অন্য কারো কাছে! কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালছি মানসিকভাবে ভালো থাকতে, সুখে থাকতে! অদ্ভুত না?

ড. আইশা হামদান আগের জীবনে অমুসলিম ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম হন এবং ইসলামের উপরও পড়াশোনা করেন। তাঁর মূল পড়াশোনা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির উপর। আমেরিকা, আরব আমিরাত, সৌদি আরবে এই বিষয়ের উপর দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। সাইকোলজির উপর নিজের সেক্যুলার পড়াশোনা এবং পরবর্তীতে ইসলামের ছায়ায় এসে ইসলামের পড়াশোনা শেষে তিনি নিজের এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন যা সেক্যুলার সাইকোলজির পড়াশোনা তাকে দিতে পারেনি। তিনি জানতে পেরেছেন ইসলাম যেভাবে মানবমনকে ব্যাখ্যা করেছে, বাস্তবিকভাবে আর কোনো শাস্ত্র সেটা পারেনি। পরবর্তীতে এই বিষয়ের উপর তিনি লিখেছেন একটা অসামান্য বই *"Psychology From The Islamic Perspective"*. আমাদের আলোচ্য বইটি সেই অসাধারণ বইটিরই বাংলা অনুবাদ—"সাইকোলজি: ইসলামি দৃষ্টিকোণ।"